সৈনিক

পুরানো খাতায় 'সৈনিক'-এর সময়-ক্রম পাওয়া গেছে। বর্তমান সংস্করণে সেটা সংযোজিত হল। ঘটনাগুলো নিম্নোক্ত সময়ে ঘটেছিল, ধরে নেওয়া যেতে পারে। কৌতূহলী পাঠক ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন।

১ম	পরিচ্ছেদ	মে.	১৯৪১
২য়	"	জুন,	"
৩য়	"	জুলাই,	"
৪র্থ	"	"	"
৫ম	"	আগস্ট,	"
৬ষ্ঠ	"	সেপ্টেম্বর,	"
		ডিসেম্বর,	"
৭ম	"	এপ্রিল,	১৯৪৩
৮ম	"	জুলাই,	"
৯ম	"	আগস্ট,	"
১০ম	"	সেপ্টেম্বর	"
১১শ	"		

মনোজ বসু

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স * কলিকাতা বারো ॥

চার টাকা

সপ্তম সংস্করণ, জুলাই, ১৯৫৬

প্রথম সংস্করণ—জুলাই, ১৯৪৫; দ্বিতীয় সংস্করণ—জানুয়ারি, ১৯৪৬;
তৃতীয় সংস্করণ—আগস্ট, ১৯৪৬; চতুর্থ সংস্করণ—জুলাই, ১৯৪৭।
পঞ্চম সংস্করণ, জুলাই, ১৯৪৮; ষষ্ঠ সংস্করণ—সেপ্টেম্বর, ১৯৫১।

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট; প্রচ্ছদপট-শিল্পী—শৈল চক্রবর্তী; মুদ্রাকর—মন্মথ নাথ পান, কে. এম. প্রেস, ১।১, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা।

Amrita Bazar Patrika—(22-7-45)

Monoj Babu has become one of the three outstanding authors in Bengal who have been producing what is called "regional novels." Sailajananda Mukherjee has portrayed the coal districts, Tara Sankar Banerjee the partriarchal village-society of Beerbhum district and Monoj Bose the coastal belt of the Sunderbans. The respective style of the three novelists are influenced by their regions. Monoj Bose's style is informed by the expansive luciousness and verdure of lower Bengal, where Nature has laid herself out on a gorgeous scale. Here everything is on the big side—the crops, the vegetation, the floods, the storms—that is, everything except man. The same problems of ignorance and complete dependence on nature characterise man here as up in the arid north. Monoj Babu chronicles the pathetic peace of the country-side as well as its deep elemental discontent. The novel under review (Sainik) is a powerful story of the cataclysmic times since the start of the Second World War—of the frustration, famine, devastation and holocaust of yesterday. His canvas is broad, his lines are boldly drawn, his men and women true to life. *Intimate knowledge of the peasant life and stern realism of treatment have raised the book to the height of a living human document of the stark tragedy of our times. It is a story that will live through years.*

উৎসর্গ

লাঞ্ছিত বিস্মৃত বিগতপ্রাণ
দেশপ্রেমের অপরাধে অপরাধীদের
উদ্দেশে

—এই লেখকের—

মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প (৩য় সং), চীন দেখে এলাম—১ম পর্ব (৫ম সং), চীন দেখে এলাম—২য় পর্ব (২য় সং), বকুল (৩য় সং), জলজঙ্গল (২য় সং), নবীন যাত্রা (৪র্থ সং), এক বিহঙ্গী (৩য় সং), আজ সন্ধ্যায়, কুঙ্কুম (২য় সং) কিংশুক, বাঁশের কেল্লা (৪র্থ সং), উলু (৩য় সং), কাচের আকাশ (২য় সং), দিল্লি অনেক দূর, রাখিবন্ধন (২য় সং), বিপর্যয়, আগষ্ট, ১৯৪২ (৩য় সং), ভুলি নাই (২৬শ সং), শত্রুপক্ষের মেয়ে (৫ম সং), সৈনিক (৭ম সং), ওগো বধূ সুন্দরী (৪র্থ সং), নরবাঁধ (৪র্থ সং), একদা নিশীথকালে (৪র্থ সং), পৃথিবী কাদের ? (৪র্থ সং), দেবী কিশোরী (৩য় সং), দুঃখ-নিশার শেষে (৩য় সং), নূতন প্রভাত (৫ম সং), প্লাবন (৪র্থ সং), যুগান্তর (২য় সং)।

মাতৃভূমি (আশ্বিন—১৩৫২)

১৯৪১ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত বাংলা তথা ভারতের বুক দিয়ে যে বিক্ষুব্ধ প্রবল ঝড় বয়ে গেছে, ভারতের ইতিহাসে তার তুলনা আছে কিনা সন্দেহ। ··জাতীয় জীবনের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ করুণ ভয়াবহ কাহিনী আমাদের জাতীয় সাহিত্যে এতদিন সম্যক প্রতিফলিত হয় নি।

'সৈনিক' নামক নব-প্রকাশিত উপন্যাসে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মনোজ বসু সেই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাই করেছেন। স্বাধীনতার সৈনিক পান্নালাল তাদেরই অন্যতম, যারা জাতীয় আদর্শের জন্য যুগে যুগে বন্ধন-ভয়কে তুচ্ছ করে আশার সোনালি রেখায় সমুজ্জ্বল সুদূর দিগন্তের দিকে এগিয়ে চলে। যুদ্ধের প্রথমে পান্নালাল ছিল গান্ধীজী-প্রবর্তিত ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের সৈনিক। তার ফলে তার কারাদণ্ড হয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে সে দেখল পৃথিবীর নব-রূপান্তর। কলিকাতা শহর বদলে গেছে—সামরিক উদ্যোগ-আয়োজনের ভারে অসামরিক জীবন পড়েছে চাপা। জাপানীদের বিমানাক্রমণের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত শহরবাসীরা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ভিড় জমাতে শুরু করেছে। পান্নালাল ভাবে, সভ্যতার চাকা কি শেষ পর্যন্ত বিপরীতগামী হল? তারপর আগষ্ট-সংগ্রাম, ঝঞ্ঝাবাত্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী—পান্নালাল সবকিছুরই প্রত্যক্ষদর্শী। কিন্তু পান্নালালের মতো আদর্শবাদী মানুষেরা বেশীদিন সরকারী ও সামাজিক অন্যায়-অত্যাচার নীরবে সহ্য করে না। তারা প্রতিবাদ করে, তাই আবার কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তাদের কণ্ঠরোধের প্রয়াস করা হয়। পান্নালালের ভাগ্যেও তাই হল। "রাত্রি-শেষের পাখির মতো, শুকতারার আলোর মতো, আসন্ন প্রভাতবার্তা" কণ্ঠে নিয়ে পান্নালাল আবার কারাবরণ করল। নায়ক পান্নালালকে ঘিরে অনেক চরিত্র গড়ে উঠেছে এবং সুনিপুণ কথাশিল্পী মনোজবাবুর চিত্রাঙ্কনে প্রতিটি চরিত্রই হয়ে উঠেছে বাস্তব—জীবন্ত। উমা, সুপ্রিয়া, অনুপম, হরিহর—এরা আমাদের নিত্য-পরিচিত। পান্নালালের মত উমাও আদর্শবাদিনী। উমা পান্নালালকে ভালবাসে। মাঝে মাঝে আদর্শবাদের আবরণ ছিন্নভিন্ন করে উমার মধ্যে যে রক্তমাংসের নারী জেগে উঠতে চায়, তা দুর্বল মুহূর্তের ফল হলেও অত্যন্ত স্বাভাবিক—নারীসুলভ। সুপ্রিয়ার গায়ে-আঁচড়-না-লাগানো সমাজসেবা, অনুপমের অ্যাসেমব্লি-পলিটিক্স—এ তো আমাদের নিত্য-পরিচিত। পান্নালালের আশ্রয়দাত্রী ছোট চরিত্র অণিমাকেও আমরা ভুলতে পারি না, ভুলতে পারি না এককালের বিপ্লবী, বর্তমানে জীর্ণশরীর দ্বিতীয় শিশুত্বপ্রাপ্ত সূর্যকান্তকে। গ্রামবাসীর চরিত্রাঙ্কনেও লেখক অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন। গ্রামের জীবনকে তিনি যে অন্তরঙ্গভাবে জানেন এ তারই প্রমাণ। দ্বারিক সর্দার, কার্তিক, যামিনী, ভূষণ এরা সবাই বাস্তব, সবাই আমাদের পরিচিত। আরও অনেক চরিত্র বইটিতে ভিড় করে আছে। কিন্তু চরিত্রের ভিড়ে গল্পের গতি কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি। সৈনিকের আখ্যানভাগ সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে শেষ পর্যন্ত প্রবাহিত। পড়তে পড়তে একই সঙ্গে মনে হর্ষ বিষাদ এবং উত্তেজনার সঞ্চার হয়।

মনোজ বসুর প্রথম উপন্যাস 'ভুলি নাই' স্বদেশ-প্রীতির আবেগে উচ্ছ্বসিত, জাতীয়তার মন্ত্রে মুখর। 'সৈনিক' তার চেয়েও বৃহত্তর ও মহত্তর সৃষ্টি। আজকের দিনে এই জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়োজন যে কত, তা বলে বোঝানো যায় না। 'সৈনিকে' মনোজবাবু যে সমাজ-সচেতন সাহিত্য-শিল্পের পরিচয় দিয়েছেন, তা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে।

এই বই সম্বন্ধে

দেশ (৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৫২) মনোজ বসু জনপ্রিয় সুপ্রতিষ্ঠিত কথাশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এবার 'সৈনিক'-এর মধ্য দিয়া তিনি যাহা পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা আমার মতে একেবারে অপূর্ব। আমাদের দেশের সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর যুগের উহা একটি অনুপম নিখুঁত চিত্র। ইহার প্রেক্ষাগার কী বিরাট ও ভয়াল! অথচ কিছুই লেখকের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তিনি এই মহাপ্রলয়ের মহানাটককে অবলীলাক্রমে নিজ মুঠার মধ্যে আনিয়া তার জীবন্ত রূপ আমাদের চোখের সম্মুখে ধরিয়াছেন এবং ইতিহাসের বিচারে পাপিষ্ঠেরা যাহাতে ফাঁকি দিতে না পারে, তাহার অক্ষয় ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বইখানা একাধারে সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন—based on gigantic realities and not on imaginary fiction. আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা কবে অসার উদ্ভট কল্পনাকে বাদ দিয়া এইরূপ সত্যাশ্রয়ী মানবিক সাহিত্য সৃষ্টি করিতে সুরু করিবেন, ভাবি। পরাধীনতার মর্মান্তিক গ্লানি ও অত্যাচারকে বাদ দিয়া যাঁহারা সাহিত্য সাধনা করিতে চান, তাঁহারা দেশকে মরিতে দিয়া দেশের "সাহিত্যকে" বজায় রাখিতে আশা করেন। মনোজবাবু সত্য পথ ধরিয়াছেন। মনোজবাবুর এই বইখানা প্রত্যেক বাঙালীকে পড়িতে অনুরোধ করি। (অনাথগোপাল সেন)

* * * *

বাঁশের কেল্লা ২য় সং। 'The novel unfolds the epic story of India's stuggle for freedom which during the hundred and fifty years of British rule shook out of their peaceful slumber the quiet little villages all over the country…What Monoj Babu has given us, is a work of fiction—the literary exeellence of which is of a high order. But when history fails, fiction has to step in to bridge the gulf. Episodes which are apparently unconnected have been welded into an integrated whole with masterly skill and the resultant gripping narrative is a brilliant first rate novel. The author of BHULINAI to use a clilches has added one more feather to his cap'—**হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড**।

প্রথম পরিচ্ছেদ

(১)

পান্নালাল জেল থেকে বেরুল। জেলে গিয়েছিল সত্যাগ্রহ করে। প্রকাণ্ড ফটকটা খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল তার পেছনে। সে মুক্ত এবার।

হন-হন করে চলেছে। দূর থেকে ডাক আসে, পানু-দা!

উমা যে! তুমি এখানে…জানলে কি করে যে খালাস পাব আজকে?

কাজে যাচ্ছিলাম এদিকে। হঠাৎ দেখি—

ঘাড় নেড়ে পান্নালাল বলে, উঁহু, বিশ্বাস করলাম না। দিন গুণেছ, খবর নিয়েছ তুমি। যথাসময়ে এসে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছ—

উমা হেসে বলে, বেকার মানুষ নই পানু-দা। বাজে খরচের সময় কোথা অত?

করছ কি আজকাল?

মাস্টারি। দু-পাতা ইংরেজি-শেখা মেয়েদের যা চরম মোক্ষ।

খুশী মুখে পান্নালাল বলে, বেশ, বেশ—

রিক্সাওয়ালা যাচ্ছিল ঠুন-ঠুন করে। তাকে ডাক দিল, এই—

তারপর বলে, তোমরা লেখাপড়া শেখ, মাস্টারি করে আবার কতকগুলো ভাবী মাস্টারনি তৈরি করবার জন্য—

উমা বলে, বেশ করি। বেরুলে এদ্দিন পরে—রাস্তায় দাঁড়িয়েই এখন কুচ্ছো চলবে নাকি?

না—রাস্তায় আর কেন। রথ খাড়া আছে, ওঠ—

রিক্সায় চাপল দু-জনে। উমার সঙ্কোচ হচ্ছে ঘেঁসাঘেঁসি করে যেতে এই রকম। বলে, ঘোড়ার-গাড়ি নিলেই হত একটা—

ভাড়া যে পাঁচ গুণ। হেসে উঠে পান্নালাল বলতে লাগল, বোঝা-বওয়া জানোয়ারগুলো পেরে উঠছে না মানুষের সঙ্গে কমপিটিসনে। ঠেলাগাড়ির ঠেলায় গরুর-গাড়ি পয়মাল, রিক্সার জন্য ঘোড়ার আর দানাপানি জুটছে না। একটা মানুষ পোষার খরচ, ঘোড়া পোষার চেয়ে অনেক কম।

মোড় অবধি এসে রিক্সাওয়ালা জিজ্ঞাসা করে, কোন দিকে?

তাইতো, নিশ্চিন্ত ছিলাম সরকারী পাকা দালানে। মুশকিল হল ছাড়া পেয়ে। যাই কোথা এখন? চল্ দেখি পূবমুখো—

উমা দুঃখিত স্বরে বলল, জীবনটা প্রায় জেলে জেলেই কাটালে দেশের জন্য। আজ জায়গার ভাবনা ভাবতে হচ্ছে!

পান্নালাল বলে, সময়টা বড় বেয়াড়া কি না। নইলে দেখতে মালা নিয়ে মিছিল আসত, মোটর-গাড়ি দুয়োর খুলে আমন্ত্রণ জানাত, কোন বাড়ির সামনে দাঁড়ালে শঙ্খ বেজে উঠত উপরের ব্যালকনি থেকে—

উমা হঠাৎ বলল, আচ্ছা—এবারে যে জেলে গিয়েছিলে, তার কোন মানে হয়?

পান্নালালের চোখে ধ্বক করে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। কিন্তু মুখে অমায়িক হাসি। বলে, দুর্লভ মানব-জীবনের দেড়টা বছর বোকার মতো অনর্থক নষ্ট করে এলাম, এই বলতে চাচ্ছ?

উমা বলে, একা একটি প্রাণী পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলে —হৈ-চৈ নেই, কিচ্ছু নেই। একটা বার মুখের কথা না বলে ভারতকে যুদ্ধরত বলে ঘোষণা করেছে, জাতির অবমাননা হয়েছে - তাই জানালে, যুদ্ধ-চালনায় তোমাদের আপত্তির কথা। কিন্তু কে শুনল? ক'টা লোকই বা জানতে পারল! ধরে নিয়ে জেলে পুরে দিল। ব্যস, ঠাণ্ডা। কি ক্ষতি হল ওদের?

ক্ষতি করতে তো চাই নি। শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছে—এটা কি হৈ-চৈর সময়?

তবে?

বলতে চেয়েছি, লড়াইটা জবর কর আরও। অস্ত্রের শক্তি ছাড়া আরও কিছু চাই। যার অভাবে মালয়ে আর বর্মায় কেলেঙ্কারি করলে। যারা মানুষের মতো বেঁচে থাকতে দিচ্ছে না, তাদের বলেছিলাম, মানুষের মতো মরবার অধিকারটুকু দাও অন্তত। ভাতের অভাবে বা টাকার লোভে নয়—স্বদেশের জন্য লড়ছি এই দাবিতে ফ্রণ্টে গিয়ে দাঁড়াব।

কিন্তু কানেই তো নিল না—

নেওয়াতে পারলাম না। শক্তের ওরা ভক্ত। মিউনিকে তার নমুনা দেখেছি। বোঝা গেছে, জাপানের হুমকিতে যখন বর্মা রোড বন্ধ করে দিয়েছিল; স্বাধীনতার যোদ্ধা চীনের দিকে তাকায় নি সে সময়।

উমা বলে, মেনে নিচ্ছ তোমরা শক্তিহীন?

সৈন্য আর ইস্পাতের অস্ত্রকেই শুধু শক্তি বলে মানলে আমরা তাই বটে!

প্রদীপ্ত দুটি চোখ উমার মুখের উপর ফেলে পান্নালাল বলতে লাগল, জগতে কার এমন বুকের পাটা বল দিকি উমা, আগেভাগে নোটিশ দেয়—তোমার সঙ্গে বনছে না, আমার আত্মা অবমানিত হচ্ছে, আমার পথে চলব আমি, যা ক্ষমতা থাকে কর। অশক্তের সাধ্য আছে এই সত্যাগ্রহের?

গম্ভীর হয়েছে পানু, গভীরভাবে ভাবছে। নিশ্বাস ফেলে সে বলল, উভয় সঙ্কট! ও ছাড়া আর কি-ই বা করা যেত বল উমা। খুব কড়া সংঘর্ষের সময় এটা নয়। ভাবীকালের বিচারের জন্য রইল ভারতের ঐ প্রতিবাদ। জগতের মানুষ শুনবে নিরপেক্ষ কান থাকে যদি কারও—

রিক্সা যাচ্ছে রসা রোড দিয়ে। ট্রাম-বাস যে জায়গায় থামে, পোঁটলা-পুঁটলি আর মেয়েলোক কাচ্চাবাচ্ছা নিয়ে অগণ্য মানুষ।

চলল কোথা?

এভ্যাকুয়েশন। রেঙ্গুন গিয়েছে। জাপানীরা জোর কদমে আসছে যে এইদিকে—

পান্নালাল উৎকট হাসি হেসে উঠল।

পরাধীন জাতির একটা সুবিধা উমা, মাথার উপর গার্জেন থাকে, ভরসা করা যায়। এই এরা সব নিশ্চিন্তে পালাতে পারছে—জানে, সাদা অভিভাবকেরা রইলেন—তাঁদের গড়া শহর দেখবেন তাঁরাই।

রিক্সাওয়ালা প্রশ্ন করে কদ্দূর বাবু?

কলেজ স্ট্রীট—

(২)

কলেজ স্ট্রীটে মহেশ নামে এক পুরোনো বন্ধু পাঁঠার দোকান করেছে। দেউলির বন্দিশালায় অনেক দিন এক সঙ্গে বসবাস করে পাকাপোক্ত হয়েছে বন্ধুত্বের ভিত। জেলে যাবার আগে সে মহেশের ঘরে তার সঙ্গেই ছিল মাসখানেক। মহেশ বলত, পলিটিক্স তোবা করেছি ভাই। অগ্নিমন্ত্রের মানুষ আমরা, আজকাল তোমাদের নন-ভায়োলেণ্ট পিটুনি-খাওয়া বরদাস্ত করতে পারি নে। মানুষ মারা মানা হয়ে গেছে, চুপচাপ এই পাঁঠার গলায় কোপ ঝাড়ছি। হাতের নিশপিশানি ওতে কমে খানিকটা।

তা কোপ মারছে দৈনিক এমন একশ দেড়শ পাঁঠার গলায়। দোকান করে ক'বছরেই মহেশ ভুঁড়ি বাগিয়েছে।

দেড় বছর আগেকার জীবনোচ্ছল বিচিত্র কলকাতার ভীত মূর্তি দেখতে দেখতে পান্নালালেরা চলেছে। পলায়নের হিড়িক পড়ে গেছে। লড়াই এসেছে একেবারে ঘরের কাছ বরাবর—কলকাতার না জানি কি দশা হবে এবার! বর্মা থেকে মানুষ আসছে দলে দলে। কায়ক্লেশে এসে যারা পৌঁচেছে, নানারকম কাহিনী তাদের মুখে মুখে। পথে মরে পড়ে আছে শত শত—কলেরা হয়ে, সাপের কামড়ে কিম্বা খাদ্যের অভাবে। বিস্তর কষ্টে ও অবিশ্বাস্য মূল্যে কদাচিৎ পাওয়া গেছে একখানা নৌকা বা গরুর-গাড়ি। খাবার সংগ্রহ

করতে গিয়ে মগেরা ঘিরে ফেলেছে পাড়ার মধ্যে। জল নেই—তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। পাহাড়ের উপর দিয়ে পথ। কে-একজন দয়া করে বাংলা হরফে গাছের গুঁড়িতে ছালের উপর দাগ কেটে কেটে লিখেছে—নেমে যাও, নিচে ঝরনা—

ব্যাকুল হয়ে দলের পর দল নিচে নামছে প্রায় হাত পঞ্চাশ আঁকা-বাঁকা এবড়ো-খেবড়ো পথে। জল পড়ছে বটে ঝিরঝির করে, কিন্তু—

দাও হাতে দাঁড়িয়ে ষণ্ডামার্ক বর্মি জনকয়েক। ছুঁতে দেবে না ঝরনার জল। এক এক টাকা ফেল, তবে এক এক ঘটি। টাকা বের করে দেওয়ায় আরও বিপদ। যা-কিছু সম্বল নিয়ে চলেছে, দেখতে পেলে লোভ উদ্দাম হয়ে উঠবে। সংখ্যায় যে দল কম, ভয়ে ভয়ে তারা ফিরে যায়, জল খাওয়া ভাগ্যে ঘটে না।

এই বর্মা-ফেরতদের মধ্যে বাহাদুর একজন নাকি গল্প করে বেড়ায়, আমি করলাম কি—পায়ে এই মোটা এক ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিয়েছি, ব্যাণ্ডেজের নিচে নোট সাজানো। সবাইকে বলি, পা পিছলে পড়ে ঘা হয়েছে, পুঁজ-রক্ত পড়ছে—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলি—কেউ আর সেদিকে ফিরেও তাকায় না—

হা-হা, আমার সঙ্গে চালাকি?

আবার স্টেটস্‌ম্যানে পড়া গেল, রোমহর্ষক বিবরণ—এভ্যাকুয়েশন নয়, প্রমোদ-ভ্রমণ যেন। প্রশস্ত পথ, যান-বাহনের সমারোহ···মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম-শিবির, সুপ্রচুর খাওয়া-দাওয়া—মায় বলনাচের পর্যন্ত বন্দোবস্ত—

বকবক করে এইসব এতক্ষণ একলাই বকে যাচ্ছিল উমা। কথার শেষে মন্তব্য করে, বুঝলে পানু-দা, পথ ছিলো দুটো। দু-পথের দুই চেহারা।

তিক্ত কণ্ঠে পানু বলল, জাতও দুটো কিনা তাই। মরে গিয়েও মানুষে জাত ভোলে না।

এক অনুপম ঘোষের গল্প বলছিল উমা। উকিল ভদ্রলোক—কিন্তু কোর্টে

যান না, এসেম্বলির মেম্বর, তা ছাড়া অনুমান হয়, অপ্রকাশ্য অনেক-কিছু আছে। আছেন ভাল, দেশসেবা হচ্ছে, দুপয়সা আসছেও। যুদ্ধ-বিশারদ বলে সম্প্রতি বিষম খ্যাতি রটেছে অনুপমের। কাগজে যা ছাপা থাকে এবং যা থাকে না—প্রতিটি খবর তার নখাগ্রে। উমার সঙ্গে চেনা হয়েছে বিশেষ সূত্রে ভদ্রলোকের। তিনি পর্যন্ত রায় দিয়েছেন, গতিক সুবিধের নয়। পালাতে হবে, এ একবারে অবধারিত। অতএব সময় থাকিতে সরে পড়। এখনো তবু চাকার গাড়িতে গড়াতে গড়াতে যেতে পারবে, পরে সম্বল থাকবে কেবল পা দুখানি।

রোজই নূতন নূতন গুজব রটছে চারিদিকে। গুজব বললে আপত্তি উঠবে প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টাদের চোখে-দেখা বৃত্তান্ত। হাওড়া আর শিয়ালদহ—বহির্গমনের প্রশস্ত পথ দুটো ব্যারিকেড-ঘেরা। সাধারণ মানুষের সহজভাবে বেরোবার উপায় নেই। শহরের ভিতর বুকিং-অফিসগুলোয় মানুষ লাইনবন্দি দাঁড়িয়ে আছে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মানুষ ও মালপত্র বোঝাই ঘোড়ার-গাড়ি, মোটর-গাড়ি মিছিল করে যেন চলেছে স্টেশনমুখো। পশ্চিমা গোয়ালারা গাড়ির তোয়াক্কা রাখে না, সংসারের তৈজসপত্র গরু-মহিষের পিঠে চাপিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড বেয়ে। কলকাতার সীমানা ছাড়িয়ে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে ; তারপর এক মাস লাগুক দু-মাস লাগুক, মরে যাক হেজে যাক —কুছ পরোয়া নেই!

রেলের কড়া আইন। একেবারে গোণা-গুণতি টিকিট—সিকিখানা তার উপর ছাড়বার উপায় নেই। অগণ্য মানুষ কাতরাচ্ছে টিকিট-ঘরের জানলায় হাত-জোড় করছে দুয়োরের সামনে দাঁড়িয়ে।

না—না, হবে না, হঠ যাও—

চালাক যারা, পাঁচ টাকার জায়গায় পঁচিশ টাকা নিয়ে জোর করে ঘুলঘুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেয়। টিকিট বেরিয়ে আসে। সম্বল যাদের কম রেল-লাইন ধরে তারা হেঁটে চলেছে ; স্টেশনের পর স্টেশনে খোঁজ নিচ্ছে,

মিলবে কি এবার টিকিট? লাগবে কত? সঙ্গতির মধ্যে পৌঁছলেই টিকিট কেনে। টিকিটের উপর টাকার অঙ্ক একটা ছাপা থাকে, সেটা একেবারেই অবান্তর। রীতিমতো দরদস্তুর করে কিনতে হয়। আর যতই দিন যাচ্ছে হু-হু করে চড়ছে টিকিটের দর।

মহেশের পাঁঠার দোকান বন্ধ। পাশের বিড়িওয়ালা বলল, দিন দশেক মশায় তালা ঝুলছে ঐ রকম। মাংস খাবার পুলক আছে কি মানুষের? আমারও দৈনিক চার সাড়ে-চার বিক্রি ছিল, এখন চারটে পয়সা হয় না। তালা দেব আমিও।

মহেশের বাসায় গিয়েও দেখা গেল, ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বিদায় হয়েছে সেখান থেকে। এককালের অগ্নিমন্ত্রের মানুষটি কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছে, পাত্তা পাওয়া গেল না।

কি করা যায়?

ঘোরাঘুরি করতে করতে একটা হোটেল মিলল শিয়ালদহের কাছে।

তুমি যে বাপু দোকান গুটাও নি এখনো?

হোটেলের ঠাকুর স্টেশনের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বলল, ওখানে মশাই কুরুক্ষেত্র চলছে। খালি পেটে লড়াই জমবে না, তাই আছি কোন রকমে প্রাণটা হাতে নিয়ে।

লোকটার বীরত্ব দেখে পান্নালালের ইচ্ছে করে, বাহবা দিয়ে তার পিঠ ঠুকে দেয়। খদ্দেরের ভিড় খুব। হুড়োহুড়ির ফাঁকে মানুষ কোন গতিকে দু-গ্রাস খেয়ে যাচ্ছে। এক দণ্ড বসে যে একটা নিশ্বাস ফেলবে, এমন ফুরসত নেই।

খাওয়ার পর সেই হোটেলেরই বারাণ্ডার তক্তাপোষের উপর পান্নালাল শুয়ে পড়ল। বড় ক্লান্তি লাগছে। কাজকর্ম নেই, সঙ্গী-সাথী দলের মানুষ কেউ নেই শহরে। সন্ধ্যার মুখে একবার উঠে হাত-মুখ ধুয়ে আবার গড়াবে গড়াবে মনে করছে, উমা এল সেই সময়।

খবর কি?

এইবার বাজ-তক্ত ছাড়তে হবে পানু-দা। চল আমার সঙ্গে—

কোথা?

রাতের উপায় ভাবছ? তোমার হোটেলওয়ালা যত বড় মহাবীর হোক, এই ডামাডোলের বাজারে কিছুতে অচেনা মানুষকে জায়গা দেবে না।

বেরিয়ে এল তারা। এরই মধ্যে পথে একটা মানুষ দেখা যায় না। অন্ধকার-নিমগ্ন শহর। ট্রাম বন্ধ। অনভ্যস্ত পথে পায়ে ঠোক্কর লাগে।

নিঃশব্দে দুজন পাশাপাশি চলেছে—অশরীরী দুটি ছায়া। চেনা-জানা জগতের যেন মৃত্যু হয়েছে, অন্ধকারে চারিদিককার নিশ্বাস নিরুদ্ধ। মানুষের কাছে আর শান্তি ও করুণার প্রত্যাশা নয়—নিষ্ঠুর জিঘাংসায় একজন আর একজনকে হনন করবে, ঢাক পিটিয়ে পরস্পরের কলঙ্ক ঘোষণা করবে—এইটেই পরম স্বাভাবিক আজকের দিনে।

হু-হু করে এক ঝাপটা জোলো-হাওয়া বয়ে গেল, রাজপথের উপর পাতা ঝরল ঝুর ঝুর করে। লোকের ভিড়ে আর আলোর উল্লাসে এ যাবৎ কেউ কি কোনদিন তাকিয়ে দেখেছি, কলকাতার পথের উপর আছে বড় বড় গাছ, বিস্তীর্ণ ডালপালায় আকাশ ঢেকে রেখেছে? এখন ব্লাক-আউটের মধ্যে মনে হচ্ছে, গহন অরণ্য-ছায়ে অনন্ত রাত্রিবেলা চলেছে দুটি প্রাণী। দুপাশের রুদ্ধ-

কবাট নিঃশব্দ বাড়িগুলি যেন বহু শতাব্দীর পরিত্যক্ত অট্টালিকা—মাটির নিচেকার বিলুপ্তি থেকে সম্প্রতি এক প্রাচীন নগর খুঁড়ে বের করা হয়েছে।

ভয়-ভয় করছে উমার। কাছে—অত্যন্ত কাছাকাছি একেবারে পানুর গা ঘেঁষে চলেছে।

পানু-দা গো!

পান্নালাল অন্যমনস্ক ছিল, চমকে ওঠে।

ফুটপাথে উঠে এস। লরী আসছে ঐ যে। চাপা দেবে।

দুটো আলো অনেক দূরে—দৈত্যের রক্তাক্ত চোখ দুটো। গর্জন করতে করতে প্রবলবেগে লরী ছুটে গেল। বন্দুক হাতে একদল বিদেশি তার উপর। তাদের হাসির ধ্বনি আর লরীর আলোয় রাস্তা এক মুহূর্ত জীবন্ত হয়ে আবার গভীরতর অন্ধকারে নিমগ্ন হল।

গাছের ছায়ায় উমা পান্নালালের হাত জড়িয়ে ধরেছে।

কী ঠাণ্ডা তোমার হাত পানু-দা!

পান্নালাল জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাচ্ছ? আর কদ্দুর বল তো'—

উমা জবাব দেয় না। বিরক্ত পান্নালাল বলে, কথা বল যা-হোক একটা কিছু। জমে গেলাম যে!

দুটো রাস্তার মোড়ে বড়গাছের পান-সিগারেটের দোকান। দোকানের আলো বাইরে আসে নি, প্রতিটি আয়োজনের উপর প্রতিফলিত হয়েছে।

উমা বলে, মানুষ দেখে বাঁচলাম পানু-দা। আঁধারে গা ছম-ছম করে, কাঁধে যেন ভূত চেপে বসে।

খিল-খিল করে প্রাণখোলা হাসি হাসল এতক্ষণে।

দোকানের সামনে এক ছোকরা সাহেব। তাকে ঘিরে জন তিন-চার দাঁড়িয়ে। সাহেব এক টিন সিগারেট টেনে নিয়ে ইসারায় দর জিজ্ঞাসা করে।

ওয়ান রুপি ফোর অ্যানাস, মিস্টার—

দু-আঙুলে দু-টাকার নোট একটা ছুঁড়ে দিল। দোকানি পয়সা গুণছে। সাহেব বলে, নো—নো—

ফেরত পয়সা সে চায় না। তাই নয় শুধু—সেখানেই টিনটা খুলল। সিগারেট একটা নিজে ধরিয়ে তারপর যেন হরির লুট লাগিয়েছে। দোকানির দিকে ফেলে দিল গোটা দুই-তিন। যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তাদেরও দিকে টিন বাড়িয়ে বলে, লেও—লেও—

ওধারে ইস্কুপের কারখানা—এক ফালি ঘর, সামনেটা অতি সঙ্কীর্ণ, ভিতরে গহ্বর বিশেষ। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু অহোরাত্র কাজ হচ্ছে। ছুটে বেরুল ক'জন সেখান থেকে।

পাগলা সাহেব এসেছে রে! কোথায় ছিলে সাহেব, সমস্তটা দিন?

সাহেব তাদেরও দিকে টিন বাড়িয়ে সদ্য আয়ত্তে-আনা খাস দেশি ভাষায় বলছে, লেও—বিলকুল লে লেও—

যে যেমন খুশি তুলে নিল। টিন প্রায় খালি। থমকে দাঁড়িয়েছে পান্নালাল। হাত ধরে জোরে টান দিয়ে উমা বলে, রাত হচ্ছে না? চল—

কয়েক পা এগিয়ে এসে বলে, কটমট করে কি রকম তাকাচ্ছে আমার দিকে—ঐ দেখ।

আলোহীন এক বাড়ির সামনে তারা দাঁড়াল।

উমা বলে, এইখানে থাকি। চাকর-বাকর আত্মীয়-অনাত্মীয় অনেক মানুষই থাকত; সবাই প্রায় পালিয়েছে! একলা বুড়োকর্তা চারতলায় যক্ষের মতো আয়রন-সেফ আর শেয়ার-সার্টিফিকেট আগলে আছেন। আর আছে মেয়েটা—সুপ্রিয়া, আমার ফ্রেণ্ড। সে পালাই-পালাই করছে, কিন্তু মুশকিল হয়েছে—বাপকে রেখে যায় কেমন করে? বাপও যাবেন না এ সমস্ত ছেড়ে

পান্নালাল বলে, উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখছ কি ?

খেয়ে দেয়ে বাপ-বেটি উপরে উঠে গেছে কি না, খোঁজ নিয়ে আসি। এক্ষুণি আসছি। নিচে থাকলে ঢুকব না এখন। নতুন মানুষ সঙ্গে দেখলে সাত-সতেরো জেরা করবে।

পান্নালাল বলে, আমি ঢুকছি না। তোমায় পৌঁছে দিলাম, ব্যস—ছুটি আমার। রাতটুকু কোন বারান্দায় পড়ে থাকব। বৃষ্টি আর হবে না বলে মনে হচ্ছে।

উমা রাগ করে বলে, গরজটা কি কৃচ্ছ-সাধনার ? সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় বুঝি !

মালিকের অজান্তে নিশুতি রাত্রে চুপি-চুপি বাড়ি ঢুকব, আমি চোর না ডাকাত ?

তুমি স্বদেশি, জেল-ফেরত। বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াও কিনা, কোন ঘরে তাই জায়গা হল না।

পান্নালাল হেসে ফেলল।

কদর বুঝলে না তোমার পানু-দার। পালাবার হিড়িকে সবাই মত্ত, নইলে এতক্ষণ হৈ-হৈ পড়ে যেত, বড় বড় মিটিং হত, মালা পরাত। বক্তৃতায় কত গুণপনা শুনতে পেতে আমার।

উমা বলে, সে-সব করত, কিন্তু বাড়ির মধ্যে ডেকে আনত না কেউ।

বলতে চাও, ভণ্ড আমার দেশের মানুষ ?

উমাও সমান তেজে কি জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার দিকে চেয়ে থেমে গেল। অন্ধকারে কি দেখল মুখছায়ায়, কে জানে। ঘাড় নেড়ে বলল, না—তারা তোমায় শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ভয় করে আরও বেশি। তোমরা হচ্ছ বিষম একটা অনিয়ম। এই বাজারে তা না হলে এমন গুছিয়ে নিতে পারতে যে চোদ্দ পুরুষের মধ্যে আর নড়ে বসতে হত না।

চারতলায় হঠাৎ আলো জ্বলল। তখনই অন্ধকার। উমা ব্যস্ত হয়ে বলে,

এস—চলে এস পানু-দা। পথচলতি মানুষ আমরা দুটো—তেমনি ভাবে সরে যাই। গলা শুনতে পেয়ে বুড়ো উপর থেকে দেখছে। এইখানে দাঁড়াতে দেখলে সমস্ত রাত বেচারা ঘুমুতে পারবে না। ভাববে, ডাকাত আনাগোনা করছে। চল, পার্কে গিয়ে বসি একটু—

যেতে যেতে আবার বলে, মানুষ দেখলেই সন্দেহ করে—বিশেষ এই রাত্রিবেলা। রাগ কোরো না, ওদের পায়ের নিচেকার মাটি সরে যাচ্ছে। যে নিয়মের মধ্যে বসে আজীবন টাকা জমিয়েছে, সমস্ত টলমল করছে আজকে।

কথা ঠিক। এমনি রাত্রিবেলা হরিহর রায় সুবৃহৎ অলিন্দে এসে সত্যি বড় বিচলিত হয়ে পড়েন। রাস্তার দিকে চেয়ে গা ছম-ছম করে। বাড়িগুলো যেন কিসের এক বিষম আশঙ্কায় নিস্তব্ধ হয়ে আছে। প্রায়ই আজকাল ঘুম হয় না হরিহরের, পায়চারি করে বেড়ান। শহরের উপরে যেন আসন্ন মৃত্যু-ছায়া। লণ্ডনে যা ঘটছে, রেঙ্গুনে যা ঘটে গেছে, সেই দাহন থেকে কলকাতা কি অব্যাহতি পাবে?

সারা জীবনের অবিচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে প্রথম এই অসোয়াস্তির ছায়া পড়ল। বিভিন্ন দেশে বিপ্লব হয়েছে, এক কালের ধনী ও ভাগ্যবানেরা ধূলোর সঙ্গে মিশে গেছে, নূতন চেতনা ও নব ব্যবস্থার অভ্যুদয় হয়েছে মানুষের সমাজে—সিনেমার ছবির মতো সেই সব কাহিনী চকিতে ভেসে যায় হরিহরের মনের উপর দিয়ে। কি করা যায়! কি করবেন এখন তিনি?

ব্যাঙ্কে টাকা আছে। টাকা থাকাও যে কত বড় মুশকিল, প্রথম এই মর্মান্তিক উপলব্ধি হচ্ছে। কিছু পরিমাণে তুলে এনে সিকি দুয়ানি আর রূপোর টাকায় খুচরা করে নিয়েছেন। আয়রন-সেফে রাখা নিরাপদ নয়। যদি গোলমাল ঘটে—ঘটবে তো নিশ্চয়ই—লুঠ করতে এসে সকলের আগে চাইবে আয়রন-সেফের চাবি। হরিহর তাই করেছেন কি…পাশবালিশের মুখ কেটে তার মধ্যে টাকার থলি ভরে আবার মুখ সেলাই করে দিয়েছেন। রাত্রে সেই পাশবালিশ জড়িয়ে তিনি পড়ে থাকেন। দিনমানে অবহেলায়

বালিশ-বিছানা ফেলে রাখেন খাটের পাশে। শুদ্ধাচার মানুষ—তাঁর বিছানা-পত্তরে কারও হাত দিতে মানা।

আর হাত দেবার মানুষ বা কই? অতি পুরানো চাকর দাসু মাত্র ভরসা। দিন তিনেক আগের কথা। সে-ও এসে ভক্তিমান হয়ে প্রণাম করেছিল।

কি ব্যাপার?

দেশে যাব বাবু। শ্বশুরের অসুখ, খবর এসেছে।

শ্বশুর আবার জন্মাল কবে রে? বিয়েই তো করিস নি।

করেছিলাম। বউ নেই···শ্বশুরটা রয়েছে।

বউ যখন গেছে, যাক না শ্বশুরটা। ও পাটই উঠে যাক। পাচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলাম তোর।

তখনকার মতো দাসু চলে গেল। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, দু-এক দিনের মধ্যে আবার সে এসে প্রণাম করবে, নূতন একটা-কিছু মুখে করে। কেউ এসে যখন যুদ্ধের কথা বলে শত কাজ ফেলে সে দরজার আড়ালে চুপটি করে শোনে, কোথায় কি ঘটেছে শুনতে শুনতে মুখ তার ফ্যাকাসে হয়ে যায়।

আজকাল হরিহরের বড় মনে পড়ছে গ্রামের কথা।

বাঁকাবংশি গ্রাম। অনেকদিন যাওয়া-আসা না থাকায় গ্রাম ও গ্রামের মানুষজন ঝাপসা হয়েছে স্মৃতিতে। বড় নদী গ্রামের পূর্বদিকে; আর দক্ষিণে সীমাহীন বিল—বউডুবির বিল বলে তাকে। ফাল্গুন-চৈত্রে বিল মরুভূমির মতো ধূ-ধূ করে, আঁকা-বাঁকা অসংখ্য খাল, সেগুলো হেঁটে পার হওয়া চলে তখন। বর্ষায় এই বিলের আর এক মূর্তি। যতদূর নজর চলে, কেবলি ধান-ক্ষেত। হরিহরের মনে পড়ে, নৌকায় উঠে ছেলেবেলা পুঁটিমাছ ধরতে যেতেন বিলের মধ্যে খালের বাঁধালে।

কি করা যায়? কলকাতার এই অবস্থা! অবস্থা জানিয়ে হরিহর চিঠি দিয়েছেন গ্রামের বড় কারবারি ভূষণ দাসকে। ভূষণ তাঁর বড় অনুগত, মাল গস্ত করতে এলে হরিহরের বাসায় এসে একবার অন্তত খোঁজ-খবর নিয়ে যাবেই।

সমস্তটা দিনই তো গড়িয়েছে হোটেলের তক্তপোষে, তবু পান্নালালের চোখ ভেঙে আসছে। কত যুগ এই রকম হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছে। পার্কে ঢুকে একটা বেঞ্চিতে সে শুয়ে পড়ল। শিয়রে উমা, ধীরে ধীরে তার রুক্ষ অবিন্যস্ত চুলে আঙুল বুলাচ্ছে।

এক একটা মুহূর্ত অতি করুণ—সুদীর্ঘ কালের কঠিন বাধা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। চঞ্চল আঙুলগুলো কখন স্থির হয়ে গেছে, উমা চুপচাপ পানুর কাছে বসে। রাজশত্রু এই পান্নালাল—বছরের পর বছর কেটে গেছে জেলের অন্ধকারে গ্রামান্তের নির্বাসনে। কিন্তু এখন যেন আর এক মানুষ—মেঘ-ম্লান তারার আলোয় শান্ত কোমল অত্যন্ত অসহায় মূর্তি!

পান্নালালের তন্দ্রা এসেছিল। মধুর স্বপ্নাবেশ। কাপড়ের খসখসানি···চোখ মেলে দেখে, কি সুন্দর অনতিস্পষ্ট ছবি একখানা। সারাদিন যে-উমা তার সঙ্গে ঘুরেছে, এ যেন সে নয়। ঝিনমিন চুড়ির শব্দ···সুঠাম বাহু অবধি অনাবৃত · কাপড়ে-চোপড়ে মৃদু সুবাস। মনে বিভ্রম জাগায়। অনেককাল আগেকার ছেঁড়া-ছেঁড়া স্মৃতি। দেড় বছরের অনাদৃত কারাগারের বাইরে এত স্নেহ বিছানো রয়েছে তার জন্য!

গুনগুন করে কি গুঞ্জন করছে উমা! কথা স্পষ্ট হল ক্রমে। কবিতা। তারার বিষণ্ণ আলোয় কি মাধুরী উমার মুখে!

বিল নিঃসাড়···ডিঙা বাঁধা, চাঁদ আকাশে হাসে—
রাতের পাখিরা পাখা ঝাপটায়—
জাগো জাগো বধূ, দেখতে পাও
দিগন্তে ওড়ে লাখ লাখ পাখি,
জ্যোৎস্না-সায়রে ঢেউ রঙিন?

বিলের স্বপন আজ নিশিরাতে ঝাঁকে ঝাঁকে হল গাঁয়ে উধাও-
পত-পত-পত স্বপন-পাখনা ক্ষীণ—ক্ষীণতম · বাতাসে লীন।
রাঙা স্বপনের কণিকা কি বধূ,
পড়ল তোমার ঠোঁটের পাশে ?
বিভল রাত্রি ··ডিঙা বাঁধা, আর
চাঁদ ও তারারা আকাশে হাসে !

কোথা গ্রাম-রেখা ? সীমাহারা বিল !
আমি একা জাগি এ ঘুম-পুরে।
জাগো জাগো বধূ, দেখ আজ এ কি
রূপসী রাতির চোখে আবেশ !
অতন্দ্র রাতি অনন্ত বিল ফিসফিস করে এ-ওর কানে—
চুপি চুপি কথা···মনে মনে কথা···
কথা অফুরান···কথা অশেষ—
কেবল একটি ছোট্ট মানুষ রাতি ও বিলের মধ্যখানে !
যদি দেখে ফেলে ? ভয় হয়, যদি
মুঠো করে মোরে ফেলায় ছুঁড়ে ?
আর, এ আকাশ বিল ও রাত্রি
হা হা হেসে ওঠে বিজন পুরে ?

জাগো বধূ, ওঠো—কাছে এসো, দাও দুখানি হাত।
আজি সীমাহারা শূন্য বিলের তেপান্তরে

মোহিনী রজনী এলায়ে পড়েছে ;

ধান-পাতে রূপ গড়ায়ে হায়—

মৌন প্রহরী তারারা দীপিছে মাথার 'পরে ;

আর একপাশে কচি ধানবনে

ছোট আমাদের ডিঙা ঘুমায়।

কোথা প্রাণ নাই, আলো-রেখা নাই,

জ্যোৎস্না অতল, গভীর রাত—

আমি ডুবে যাই রাতের গভীরে

ওঠো ওঠো প্রিয়া, ধর দুহাত।

হাসিভরা মুখ তুলিয়ে উমা জিজ্ঞাসা করে, বুঝতে পার ? মনে পড়ে ?

পড়ে অতি-আবছা রকম একটু—

কি বল তো ?

স্নিগ্ধস্বরে পান্নালাল বলে, নিষ্কর্মা ভাবপ্রবণ এক কিশোর ছিল, নাম তার পান্নালাল। উমা নামক এক স্বপ্নমূর্তি সে গড়েছিল মনের তৃপ্তি দিয়ে, আনন্দ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, আর এমনি সব আগডুম-বাগডুম কবিতার প্রলাপ দিয়ে।

একটু থেমে নিশ্বাস ফেলে বলল, একদিন এসব লিখেছিলাম, ভাবতে আজ লজ্জায় মুখ তুলতে পারিনে। তারপর অনেক দূরে চলে এসেছি—দুজনেই। সেই উমা আজ ইস্কুল-মাস্টারণী আর সে-পান্নালাল মরে ভূত হয়ে সরকার আর সরকারের অনুগৃহীত সাধু-সজ্জনের আতঙ্ক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঘুমের আবিলতা কেটে যেতে পান্নালাল কড়া হয়ে উঠল।

এ কি উমা ?

ঝিমুনি এসেছিল পানু-দা। এই একটুখানি—

লজ্জা করে না তোমার ? ছিঃ ছিঃ—

উমা অপ্রতিভ হয় না। বলে, আমার মা আর তোমার বাবা চেয়েছিলেন তো আমাদের এক বাসরে ঢোকাতে। জেলে জেলে থাক, এতকাল পরে ফুরসত হল আজকে—এই রেলিং-ভাঙা পার্কে কাদা-মাখা বেঞ্চির উপর। আলোর মুখ চুঙিতে ঢাকা—এই একটুখানি যা আবরু। আমাদের নতুন কালের নতুন বাসর পানু-দা।

আমার বাবা আর তোমার মা কখনো চান নি এ রকম ··

নতুন কালকেই তাঁরা চান নি। আগেকার নায়ক-নায়িকা মিষ্টি ব্যবধান গড়ত নিজেদের মধ্যে। যেন দুটো পাখি আলাদা দুই দ্বীপের নারিকেলকুঞ্জে গান গাইছে, সিন্ধু-সমীর উতলা হয়ে উঠছে। যা তারা কখনো নয়, তাই নিয়ে একে অন্যের স্বপ্ন দেখত। আর এখন···

কি মোহ আছে উমার কণ্ঠে, পান্নালালের মনের উষ্ণতা আবার জুড়িয়ে আসে। সে প্রতিধ্বনি করে, এখন?

দেখ, দাঁড়িয়ে কে। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে আমাদের।

পান্নালাল হেসে বলে, ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব আর কি! বাসরঘরে পাতান দিচ্ছে। বাইরে এসেছি, ওদেরও চোখের ঘুম হরে গেছে অমনি।

উমা বলে, বোঝ তা হলে। দু-দণ্ড থেমে দাঁড়িয়ে প্রেমালাপের আর সময় নেই পানু-দা। দ্বিধা-সঙ্কোচের অবসর কোথা? কাব্য নয়, কল্পনা নয়—পুরুষ আর নারী এখন এই আমাদের নিরলঙ্কার রূপ। আগে মুখে যখন বলেছি 'না' মনের কথা সে সময় 'হাঁ'। কত মধু ঝরেছে হাঁ-না-এর সংগ্রাম নিয়ে। আর এখন তোমার পাশে বসে ঘন ঘন উপরে তাকাচ্ছি, চাঁদ-তারার মাঝে কখন বম্বার এসে অগ্নিক্ষরণ শুরু করবে। কখন ঐ দরদী কুটুম্ব আবার তোমায় জেলের পাকা ঘরে তুলে সোয়াস্তির শ্বাস ফেলবে।

লোকটির দিকে এক নজর চেয়ে পান্নালালের দুচোখে যেন অগ্নিশিখা ফুটল।

আমরা স্বাধীনতা চাই···এর মধ্যে ডিপ্লোমেসি কিছু নেই। বাঁ-হাত কারো

লুকানো নেই যে গুপ্তি-ছোরার আবিষ্কার হবে পিছন দিকে। নিরস্ত্র দলে দলে বেয়নেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছি, সর্বস্ব হারাচ্ছি, মরছি অহিংস সংগ্রাম করে। তবু এ সব কেন? এই অবিশ্বাস, এই পিছন-পাহারার বন্দোবস্ত?

সে উঠে দাঁড়াল।

হাত ছাড় উমা। জল-কাদায় ঝোপের ভিতর কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মোলাকাত করে আসি, আমারই জাতভাই তো!

ব্যাকুল কণ্ঠে উমা বলে, না—না, ঘরে চল তুমি। ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমোবে আজকে—এই একটা রাত্রি অন্তত।

(৫)

এক রকম বন্দী করে এনে উমা খিল এঁটে দিল দরজায়।

পান্নালাল হুকুম করে, চা নিয়ে এস তা হলে। জলে ভিজে সর্দি ধরেছে।

উমা বলে, চলেছিলে ঐমুখো মোলাকাত করতে। নিয়ে গিয়ে ওরা চা খাওয়াত, দাওয়াই দিয়ে সর্দি সারিয়ে দিত!

পান্নালাল বলে, যাই বল, ওরা কিন্তু খাওয়ায় ভালো। আতিথ্যের নিন্দে করব না, তোয়াজে রাখে।

মায়া কাটাতে পার না বুঝি সেই লোভে? বলতে পার, জ্ঞান হবার পর কদিন একসঙ্গে বাইরে থেকেছ?

হাসতে লাগল পান্নালাল। জিজ্ঞাসা করে, শুতে হবে কোথায়? এই ঘরে, না আর কোথাও?

উমা বলে, তোয়াজে থাকা অভ্যাস, স্প্রিংয়ের খাটেই বিছানা করে দেব। তেমন কি হবে ওদের মতো!

আর তুমি?

নিস্পৃহ কণ্ঠে উমা বলে, খাটে না হোক, ঘরটা বড় আছে। কুলিয়ে যাবে দুজনেরই।

পান্নালাল সবিস্ময়ে বলে, বল কি ?

ভয় করে ? বাঘ-সিংহ নই। বনে-বাদাড়ে কত রাত্রি কাটিয়েছ, নিরীহ একটা মেয়ে কি ভয়ানক তারও চেয়ে ?

তুমি মুখ দেখাবে কি করে উমা ?

সবাই পালাচ্ছে, থেমে দাঁড়িয়ে মুখ দেখবার সময় কার ? কদিন পরে একটা মানুষও থাকবে না শহরে, মুখ মোটে দেখাতেই হবে না পানু-দা।

সুইস টিপে আলো নিভিয়ে দিল।

পান্নালাল উঠে দাঁড়াল তো ছুটে গিয়ে উমা দরজা আটকায়।

যাবে কি করে পানু-দা ? জোরাজুরি করে ঠেলে না ফেললে তো যাবার পথ নেই।

পান্নালাল বলে, যাব না তো কি পাগলের সঙ্গে থেকে মারা পড়ব ? নিশ্চয় তুমি ক্ষেপে গেছ।

ক্ষেপি নি, ক্ষেপাচ্ছিলাম। খিল-খিল করে হেসে উমা আলো জ্বালল। বলতে লাগল, দরখাস্ত করে কেঁদে ককিয়ে তোমার পায়ের নীচে জায়গা নিতে হবে, মান-ইজ্জত নেই নাকি আমার ?

ক্ষণকাল চুপ করে পানুর দিকে চেয়ে উমা বলে, একদিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম আর এই মুখের দিকে চেয়ে চাঁদের আলোয় তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে— কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলে। চুপি-চুপি আমায় ডেকেছিলে। মনে পড়ে ?

সজোরে ঘাড় নেড়ে পান্নালাল বলে, কিছু মনে পড়ে না। বাজে কথা, মিথ্যে কথা। কবিতা তোমার মাথায় চেপেছে, বিষম জিনিস।… তুমি চা আনতে পারবে কি-না বল। চা খেয়ে সরে পড়ি।

উমা রাগ করে বলে, এক বর্ণও মিছে বল নি যে মরে তুমি ভূত হয়ে গেছ। বলছিলে, লজ্জা করি নে কেন ? তোমায় আবার লজ্জা ! কাঠ-পাথরকে কেউ লজ্জা করে ? এক বোঝা হাড়-পাঁজরা ছাড়া আছে কি তোমার ?

সেই স্প্রিংয়ের খাটে আয়েস করে বসে পান্নালাল চা খাচ্ছে, আর বলছে, সত্যিই ভূত আমি। বাতাসে ভেসে আছি, এখানকার যেন কেউ নই। দেড় বছরে যেন দেড়শ বছর কেটে গেছে জেলের বাইরে। কি শহর রেখে গেছলাম, আর ফিরে এলাম এ কোথায়? কর্তাদের বলতে ইচ্ছে করে, যেখানে গ্রেপ্তার করেছিলে, সেইখানে পৌছে দাও আমায়।

উমা রেগে আছে, জবাব দেয় না।

এঃ, পোকা পড়েছে তোমার চায়ে।

কাপের সমস্ত চা পান্নালাল ছুঁড়ে দিল জানলা দিয়ে। জানলায় দাঁড়িয়ে হো-হো করে হেসে উঠল।

লক্ষ্যভেদ করেছি উমা, দেখ—দেখে যাও—

আনন্দের আতিশয্যে হাত ধরে টেনে উমাকে সেখানে নিয়ে আসে। বলে, দেখ কাণ্ড। ফ্রণ্টে গেলে একলাই পুরো রেজিমেণ্ট সাবাড় করতে পারতাম। বোমা নয়, মেশিন-গান নয়—গরম চায়ে ঘায়েল করেছি। পার্ক থেকে বেটা পিছু নিয়েছে। নজর ছিল আমারও—

রাস্তার ও-পারে গ্যাস-পোস্টের নিচে একটা লোক ব্যাকুল হয়ে জামার আস্তিনে হাত মুছছে, মুখ ঘসছে।

পান্নালাল বলে, পিছু নেবার কি আছে? কোন কাজটা আমরা চুরি করে করি? কোটি মানুষের বুকের রক্তে লেখা স্বাধীনতার সঙ্কল্প—কার ভয়ে আমরা গোপন পথ ধরতে যাব?

উমা নজর করে দেখে বলে, যা ভাবছ তা নয়। ও যে সেই সাহেবটা। পিছু নিয়েছিল তোমার নয় পানু-দা, আমার।

তাই তো! পান্নালালও শেষটা চিনতে পারল।

সর্বনাশ, মাননীয় অতিথি! নাবালক জাতের অভিভাবক—মাতব্বর হয়ে দেশ ঠেকাতে এসেছে আমাদের। ডেকে নিয়ে আসি।

উমার দিকে চেয়ে বলে, রাগ করে আছ কেন? তোমার তো খুশী হওয়াই উচিত।

উমা বলে, চোখ দিয়ে আমায় গিলে খাচ্ছিল, আর খুশী হব?

ওদের দেশের মেয়েরা হয়। তারা মনে করে, রূপ আর যৌবনের বন্দনা।

বেরিয়ে এসে পান্নালাল সাহেবকে বলল, দুঃখিত—অত্যন্ত দুঃখিত, দেখতে পাই নি। ভিতরে এস, তোমার হাত-পা কোট-কামিজ ধোয়ার ব্যবস্থা করছি।

সাহেব কৃতার্থ হয়ে একগাল হেসে উঠে এল।

বছর পঁচিশ বয়স, ভদ্রবংশীয়। য়ুনিভার্সিটিতে পড়ত, যুদ্ধের ডাকে ছিটকে পড়েছে। কথার জাহাজ, পাঁচ মিনিটে পঁচিশ বছরের সকল কথা বলে খালাস। বলে, ব্যারাকে মন বসে না, বাড়ির জন্য প্রাণ হু-হু করে। ফাঁক পেলেই ঘুরে ঘুরে তোমাদের দেশ দেখে বেড়াই—

হেসে পান্নালাল বলে, খবরদার খবরদার! পাড়ায় পাড়ায় ঘুরো না কিন্তু ও-রকম। বিপদে পড়বে।

পান্নালালের চা করতে গিয়ে অমনি একটা পান সেজে গালে দিয়ে এসেছিল উমা। সাহেব ছোকরার ফরমায়েস, পান চাই। দোকানের মতো নয়, যত্ন করে তৈরি করা আর্টিষ্টিক খিলি।

গল্প করছে, তোমাদের এক স্বামীজি ন্যু-ইয়র্কে আমার বুড়ি পিসির বাড়ি অতিথি হয়েছিলেন কয়েকটা দিন। কি জাদু ছিল তাঁর—যে টেবিলে তিনি লিখতেন, যে শয্যায় শুতেন, জীবনান্ত অবধি পিসি সেসব শুদ্ধাচারে রেখে-ছিলেন, কাউকে ছুঁতে পর্যন্ত দিতেন না।

গদগদ হয়ে বলতে লাগল, আমার বড় ভাগ্য স্বামীজির দেশ—টেগোর আর গান্ধির দেশ চোখে দেখতে পেলাম।

ছেলেটির সরল কথাবার্তা ভারি ভাল লাগে। গভীর কণ্ঠে পান্নালাল বলল, না ভাই, কোথায় টেগোর? তাঁর পৃথিবী আজও জন্মায় নি। গান্ধিও তো অতি বেয়াড়া মানুষ তোমার উপরওয়ালাদের মতে।

বোধ করি লজ্জা পেয়ে ছেলেটি মুহূর্তকাল চুপ করে থাকে। শেষে নিশ্বাস ফেলে বলে, যাই বল—শান্তিতে আছ তোমরা। তোমাদের ভারতবর্ষ অন্যের রাজ্যে নাক ঢোকাতে যায় না।···কেন তোমাদের পিছু নিয়েছিলাম শোন। ছুটিতে তোমরা আসছিলে, মনে হল চিরসুখী একজোড়া দম্পতি। হাঁটছিলে নৃত্যের ছন্দে, কথাবার্তায় যেন আনন্দের গান। যেন কোনোদিন বিচ্ছেদ হয় নি তোমাদের মধ্যে। দেখে মনটা কেমন করে উঠল।

একটা সিগারেট ধরাল ছোকরা। আস্তিনে অকারণ মুখ মুছল।

আমরাও বেড়াতাম ঠিক ঐ রকম—আমি আর জুডি। তারপর যুদ্ধ এল। সে ভোলে নি! চিঠি আসে—এক মেলে দুখানা তিনখানাও। ছবি পাঠায়।

বুকপকেট থেকে ফোটো বের করল একখানা। সাদাসিদে পোশাক, শান্ত-চেহারা সুশ্রী মেয়েটার। ছোকরা যেন চোখ ফেরাতে পারে না, একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

উমা পান সেজে নিয়ে এল। তাকে প্রশ্ন করে, কি রকম দেখছ ছবিতে? লভলি—নয়?

টপাটপ গোটা চার-পাঁচ খিলি ফেলল মুখের ভিতর। শতমুখে তারিফ করে, ফুলের আদল ফুটিয়ে তুলেছ সামান্য খিলির উপর। শিল্পীর জাত তোমরা। চমৎকার, চমৎকার!

চুনে গাল পুড়িয়ে জিভ মেলে হা-হা-হা করে। হেসে বলে, চমৎকার হলেও কিন্তু অতি-সাংঘাতিক তোমরা। শুনেছি, তোমাদের মতো মেয়েরা নাকি নিখুঁত তাক করে রিভলভার ছোঁড়ে। হাত কাঁপে না।

উমা বলে, মেরেছি এককালে। সে কাল উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি এখন। তোমাদের হাত থেকেও কামান-বন্দুক-রিভলভার কেড়ে জলে ফেলে দেব, এই হল আজকের ভারতের সঙ্কল্প।

উমার মুখের দিকে চেয়ে ছোকরা বলে, শুনলাম তুমি রাগ করেছ। বিশ্বাস

কর, অপমান করতে চাই নি। অনেকদিন পরে কেমন জুডির কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ।

তারপর বলতে লাগল, কোটি কোটি মানুষের এত বড় দেশ খবরদারি করতে কেন আসতে হয় আমাদের? কেন, কেন? এ অন্যায়। তোমাদের ভার তোমরা নাও, ভারত ছেড়ে চলে যাই আমরা।

পান্নালাল বলে, খবর রাখ সাহেব, ভার নেবার জন্যই আমরা সর্বস্ব খোয়াচ্ছি ; কতজনে প্রাণ দিয়েছে!

উমা বলে, বোলো তুমি নিজের দেশে ফিরে তোমার বাপ-মা ভাই-বোন আত্মীয়জনের কাছে, কোটি কোটি মানুষের একটা দেশ দেখে গেলে—হাত-পা-মুখ বাঁধা, কিন্তু প্রাণে সকলের অনির্বাণ স্বাধীনতার ক্ষুধা। এই যে দেখছ এই মানুষটিকে—আটত্রিশ বছর বয়স, যোগ করে দেখলে তার মধ্যে জেলে বাস বিশ বছরের বেশি ছাড়া কম নয়। এমনি চলবে যতদিন বুকের নিচে ধুক-ধুক করবে প্রাণটা, যতদিন স্বাধীনতা না আসে দেশের।

ছোকরা অস্ফুট শব্দ করে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকাল।

উমা বলে, একজন-দুজন নয়—হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ। এদের নিন্দায় দুনিয়া ভরে গেল। সরকারী গ্রামোফোনরা নানান সুরে এদের গালিগালাজ করে বেড়াচ্ছে দেশে-বিদেশে।

দেয়ালঘড়ি বাজে টং-টং করে। এগারোটা। ব্যস্ত হয়ে সাহেব উঠে দাঁড়াল।

এত রাত্রি, টের পাই নি তো। গুডনাইট!

উমা ডেকে বলে, কদ্দিন থাকবে এখানে জানি নে। মন খারাপ হলে চলে এস দূর-দেশের এই ভাই-বোনের বাড়ি।

কৃতজ্ঞচোখে ছোকরা ফিরে তাকাল একবার।

জনহীন রহস্যাবৃত রাজপথ। দরজা বন্ধ করে উমা ফিরে এল। ও-ঘরে গিয়ে নিজের জন্য বিছানা করছে। পান্নালালের নড়াচড়া নেই, চোখ বুজে

পড়ে আছে আরাম-চেয়ারে। দেয়ালঘড়ি টক-টক করে চলেছে। বুকের ভিতরেও স্পন্দন অমনি শোনা যাচ্ছে বুঝি। হঠাৎ কার গান শোনা গেল অনেক দূরে—কোথায়। আঁধারের মধ্যে আলো, পাখি আর হাসি-আনন্দের গান। 'প্রিয়, আছ স্মরণে তুমি'—এই হল গানের কথা। কাজ বন্ধ করে উমা স্তব্ধ হয়ে শোনে। গান এখনো আছে পৃথিবীর কণ্ঠে? শ্মশানের উপরেও গান? আলো জ্বালতে মানা, কিন্তু গান গাইতে আটকায় না কোন আইন?

ট্রাঙ্ক খুলে বের করল পরম যত্নে-রাখা অনেক দিন আগেকার অনেক চিঠি।

উমা গ্রামে থাকত, সেই তখন পান্নালাল লিখেছিল। আজ কে বিশ্বাস করবে, পান্নালালের চিঠি এসব? রীতিমতো রোমান্টিক কবিতা লিখত এই পান্নালাল? কী মোহ রাত্রির! কবিতা আজ ঘুমুতে দেবে না উমাকে।

ওগো মেয়ে, আঁজো তারা দেখে থাক,
—পোহাতি তারা?

কবে—কোন যুগে উঠত সে তারা, স্মরণে আছে?
তারা-তুবড়ির ফুলকি ঝরত চাঁপার গাছে?
খুব ভোর বেলা ··ধরণীর চোখে ঘুমের ঘোর···
বিলে ধানবনে কাঁপত তারার আলোর ধারা,
তুমি আর আমি বসে দেখতাম পলক-হারা—
দেখে থাক সেই সোনার তারা?

চিঠি লিখো মেয়ে, লিখো—আজো সেই
তারা কি ওঠে?

চাঁপার বনের ফাঁকে চুপি-চুপি তেমনি চায়?
বাতাসে বাতাসে ধানবনে আলো ছড়ায়ে যায়?

ছড়ায়ে গড়ায়ে আসত ও দুটি আঁখির পটে,
গড়ায়ে পড়ত সে-আলোর ঢেউ মনের তটে,
তুমি আর আমি, আমি আর তুমি—
আর ঐ তারা · একলা মোটে !
সে তারকা আজো তেমনি ওঠে ?
সেই চাঁপা-বন—শুনছি, সে নাকি ভেঙেছে ঝড়ে ?
জঙ্গল কেটে হয়েছে মস্ত ইটের ঘর ?
পাঁচিলে আটকা পড়েছে তেপান্তর ?
আর বিল মজে নিঃসীম ধূ-ধূ বালির চর ?
আমারে জানায়ো—জানায়ো জানায়ো
সোনার মেয়ে,
ভোরে আজো তারা ওঠে কি তোমার মুখের 'পরে ?
সেই যে দু'জনে তারা দেখতাম, মনে কি পড়ে ?
তোমারো মন কি ভেঙেছে ঝড়ে ?

উমা এসে ডাকল, খাটে গিয়ে ভাল হয়ে শোও, ও পানু-দা—

পান্নালাল চোখ মেলে তাকাল। ওঃ, তাই তো—

হঠাৎ উমা প্রশ্ন করে, লড়াই কবে শেষ হবে, বলতে পার ?

পান্নালালের মুখের উপর ব্যাকুল দৃষ্টি ফেলে বলতে লাগল, যেদিন আর জেলে জেলে নয়, ধরা দেবে ঘরের কোণে ? মেঘ কেটে চাঁদ উঠবে আকাশে— যে আলোয় নতুন চোখে আবার একদিন চেয়ে দেখবে আমার মুখ ?

চেয়ারের হাতার উপর জুড়ি। ফোটো ফেলে গেছে পাগলটা। কেশের গোছা থরে থরে পড়েছে কাঁধের দুপাশ দিয়ে। আনীলনয়না তাকিয়ে আছে। ভিন্ন তারা ভিন্ন চাঁদের দেশের মেয়ে। কবে তার প্রদীপ্ত মুখ আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠবে সৈনিকের অস্ত্র-জর্জর বুকের তলায় ? কবে ?

(৬)

পান্নালাল ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে—আজ এখানে কাল সেখানে। কোথাও স্থিতিলাভ করে নি। দুপুরের খাওয়া এবং দুপুরের শোয়ার জায়গা শুধু ঠিক আছে—সেই শিয়ালদহর হোটেল এবং বারান্দার তক্তাপোশখানা।

পান্নালাল অভয় দেয়, কিছু ব্যস্ত হয়ো না উমা। যে রেটে মানুষ পালাচ্ছে তুমি আমি এই রকম জন দুই-চার থাকব মোটে। দেদার বাড়ি থাকবে, বারান্দায় পড়ে থাকার শোধ তুলে নেব সেই সময়।

দিন পাঁচেক পরে উমা সু-খবর নিয়ে এল। সুরাহা হয়েছে। শুধু থাকবার জায়গা নয়, চাকরি অবধি জুটে গেছে।

বটে! কোনখানে শুনি?

উমা বলল, সেই যে—আমি যে বাড়ি থাকি। বুড়ো কর্তার সঙ্গে কথাবার্তা হল। মস্তবড় ধান-চালের বিজনেস—রাইস-প্রিন্স বলে লোকে। বর্মার কারবার নয়-ছয় হয়ে গেছে, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন। তবু যা আছে, সাত পুরুষে উড়িয়ে শেষ করতে পারবে না। আটখানা বাড়ি এই শহরে। সেই বাড়িগুলো তুমি দেখাশুনা করবে, ভাড়া আদায় করবে—

বিরাট চাকরি বাগিয়েছ তো! উৎসাহে পান্নালাল লাফিয়ে উঠল। বলে, থাকতে দেবে—খেতেও দেবে তো?

ঘাড় নাচিয়ে হাসিমুখে উমা বলে, আরও মাইনে···

ব্যস, ব্যস—এক্ষুনি চল।

একটা রাত্রি থেকে গিয়েছিল পান্নালাল। অন্ধকারে তেমন ঠাহর হয় নি; দিনের আলোয় এখন বাড়িখানার চেহারা দেখে ঐশ্বর্যের আন্দাজ পাওয়া গেল।

গ্যারেজের উপর নিচু-ছাত ঘরখানা দেখিয়ে উমা বলে, কিন্তু তোমার কোয়ার্টার এই—ওদিকে নয়। উঠে দেখে যাবে নাকি?

উঠতে হবে কেন? এই তো দিব্যি দেখা যাচ্ছে। শক্ত কণ্ঠে পান্নালাল তারিফ করতে লাগল। খাসা ঘর—চমৎকার ঘর—সোজা হ.য় দাঁড়ানো যাবে না অবিশ্যি, তা শোবার ঘরে দাঁড়াবারই বা দরকার কি? দাঁড়াবার জন্যে তো উঠোন রয়েছে, মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা রয়েছে—

হরিহর নিরহঙ্কার সদাশয় ব্যক্তি। নিবিষ্ট মনে পরমহংসের কথামৃত পড়ছিলেন। বাইরের অবস্থা যত খারাপ হয়ে আসছে, নানারকম সাধুগ্রন্থ পড়ে ততই তিনি আত্মস্থ হবার চেষ্টা করছেন। উমাকে দেখিয়ে বললেন, বুঝলে বাপু, এটিও আমার এক মেয়ে। এর কোন কথা ঠেলতে পারি নে। গাঁয়ের লোকে ডাকাডাকি করছে, দেশে গিয়ে কিছু-দিন থাকব ভাবছি। তুমি তা হলে এখানেই থাক। হাত-খরচও পাবে টাকা কুড়িক করে।

কথা বন্ধ করে হঠাৎ তিনি চশমার ফাঁকে তাকিয়ে রইলেন পান্নালালের দিকে। কুণ্ঠিতভাবে তারপর বলে উঠলেম, আপনাকে কি—

ধুপধাপ ছুটে এল সুন্দরী একটা মেয়ে—সুপ্রিয়া। এসে হরিহরের কাঁধ জড়িয়ে আদর করতে যাচ্ছিল, পান্নালালকে দেখে থমকে গেল। একনজর দেখেই সুপ্রিয়া বলে উঠল, আপনাকে চিনি তো। আসানসোলে সেই মাতাল গোরাগুলো আমাদের জিনিসপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিল, আপনিই তো—

কৃতজ্ঞকণ্ঠে হরিহর বলে উঠলেন, বড় র:ক্ষ করেছিলেন সেদিন আপনি—

সুপ্রিয়া অভিমান ভরে বলল, এত করে বলে এলাম—তারপর একটা দিন এলেন না আমাদের বাড়ি। ঠিকানা পর্যন্ত লিখে দিয়ে এলাম।

পান্নালাল বলল, ঠিকানা হারিয়ে গিয়েছিল। আর তা ছাড়া—

সুপ্রিয়া তাকিয়ে আছে মুখের দিকে।

তা ছাড়া জেলে গিয়েছিলাম সত্যাগ্রহ করে। দেড় বছর পরে বেরিয়েছি। বেরিয়েই এসেছি। এসে চাকরি পেয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে।

সুপ্রিয়া হাসিমুখে হরিহরকে জিজ্ঞাসা করে, কি চাকরি দিলে এঁকে বাবা?

হরিহর বললেন, দূর! তুইও যেমন খুকি! কি চাকরি আছে আমাদের

যে ওঁর মতো মানুষকে দিতে পারি?…অবিশ্যি, সত্যিই যদি ওঁর কাজকর্ম করবার ইচ্ছে হয়ে থাকে, খোঁজখবর করে নিশ্চয় দেখব, বন্ধুবান্ধব সবাইকে বলব—

উমা বলল, কেন—আপনার ঐ ভাড়া আদায়ের কাজ? ওতেই পানু-দার আপাতত চলে যাবে।

হরিহর জিভ কেটে বলেন, ছি-ছি! ওঁর মতো মহাপ্রাণ মানুষ দেশের কাজকর্ম নিয়ে রয়েছেন, ওঁকে কি—

পান্নালাল বলে, কপাল ভেঙেছে উমা, দেখছ কি? চাকরি ধোপে টিকল না। দেশের কাজে জেলে যায়, এই উড়ন-চণ্ডুই মহাপ্রাণদের বিল-সরকারি দিয়েও ভরসা করতে পারেন না এঁরা।

হাসিমুখে জোড়হাত করে বলে, আচ্ছা, নমস্কার!

হরিহর চিঠি লিখেছিলেন, ভূষণ দাস তার জবাব দিয়েছে। বাঁকাবড়শির লোক রায় মশায়ের নাম করে আর দশখানা গাঁয়ের মধ্যে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়, যদিও অধিকাংশই চোখে দেখে নি তাঁকে। তিনি যদি সত্যিই গ্রামে যান, গ্রামের তা হলে অভাব কি? দুঃখ কি? গ্রামবাসীরা তাকিয়ে আছে অধীর অপেক্ষায়। তাঁকে সকলে মাথায় করে রাখবে।

সেই চিঠি হরিহর মেয়েকে দেখালেন।

কি বলিস?

সুপ্রিয়া লাফিয়ে ওঠে। ছেলেবেলা সে-ও একবার গিয়েছিল গ্রামে। স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। বলে, লিখে দাও বাবা, আমরা যাচ্ছি। তোমার আবার হয়তো মত ঘুরে যাবে, আজই লেখ। রোসো, আমিই লিখছি।

উমার অফুরন্ত উদ্যম। পরদিন হোটেলে আবার এসে হাজির।

পান্নালাল বলে, হল কি? বাজে খরচের এত সময় আজকাল? মাস্টারিতে ইস্তফা দিলে নাকি?

উমা বলে, যা জিজ্ঞাসা করি জবাব দাও। কাল রাত্রে ছিলে কোথা ?

পরমোৎসাহে পান্নালাল বলে, সে একটা সুবিধে হয়েছে। কালকেই মাথায় এল বুদ্ধিটা। আর তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। তোফা জায়গা।

কোথায় ?

ট্রামগাড়িতে। রেলিং টপকে ডিপোয় ঢুকেছিলাম। দিব্যি ছিলাম। ব্ল্যাকআউটে বেশ মজা, সন্ধ্যের পর সবাই অন্ধ।

উমা বলে, পোঁটলা-পুঁটলি কিছু থাকে তো নাও। আছে নাকি ? আজকে আর-এক জায়গায়। ভয় নেই, ফিরতে হবে না। এবার নির্ঘাত।

নিয়ে গেল অনুপমের বাড়ি। অনুপম ঘোষ—সেই যুদ্ধ-বিশারদ। দুজনে সোজা লইব্রেরি-ঘরে গিয়ে উঠল।

সত্যি, পরিশ্রম করে অনুপম। অতিকায় টেবিলে ঘরটা প্রায় ভর্তি। বড় বড় ম্যাপ শোয়ানো টেবিলের উপর। আলপিনের মাথায় চিত্র-বিচিত্র কাগজের নিশানা দিয়ে যুদ্ধরত জাতিগুলোর প্রতীক বানিয়েছে ; বিভিন্ন দলের অগ্রগমন ও প্রত্যপসরণ রোজই সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত্রি অবধি পিন পুঁতে সে আয়ত্ত করে নেয়। পৃথিবীব্যাপ্ত রণক্ষেত্র তার কুঠুরির মধ্যে—একেবারে চোখের সামনে। এরা ঢুকেছে, কিন্তু এমন নিবিষ্ট অনুপম যে কিছু টের পায় নি। বিষম খাপ্পা হয়ে উঠেছে কোন অনামা সেনাপতির প্রতি, ম্যাপের দিকে চেয়ে খুব ধমকাচ্ছে, ব্রেইনলেস গর্দভ ; কোন আক্কেলে এগোচ্ছ এমন আন-প্রোটেকটেড ? জাঙ্গল-অ্যাটাক নিশ্চয় হবে, টের পাচ্ছ না ?

উমা মৃদুকণ্ঠে বলল, আমরা—

মুখ ফিরিয়ে অনুপম হেসে ফেলল। ফর্সা—লিকলিকে প্যাঁকাটির মতো হাত-পা। মানুষ ভাল। বলল, বসুন। দেখছেন—মাথা খারাপ করে দিচ্ছে একেবারে। কোদালি ধরতে জানে না, তারা সব অস্ত্র ধরেছে।

পান্নালালকে বলে, আপনিই বুঝি ? নমস্কার! বাড়িতে একেবারে একা

হয়ে পড়েছি মশায়, হাঁপিয়ে উঠি। তেতলায় আমি থাকতাম, সেটা আপনি দখল করুন। আমি একতলায় থাকব। হাসছেন কেন ?

পান্নালাল বলে, পাশা উলটে যাচ্ছে—

অর্থাৎ ?

বোমা তেতলার মানুষদের একতলায় নামাচ্ছে, শহরের মানুষদের গাঁয়ে পাঠাচ্ছে। গাঁয়ের শিয়াল-কুকুর গোরু-ছাগল এসে শহর দখল করবে এইবার—

অনুপম হাসতে লাগল। বলে, আজকেই আসছেন তো ? তাই আসুন। কাইগুলি।

পান্নালাল বলে, এসেই তো গেছি। আমাদের আসার সুবিধা আছে। হাঙ্গামা নেই, জিনিস বওয়া-বওয়ি করতে হয় না। পা দুখানা অনায়াসে পৌঁছে দেয় দেহটা।

তারপর হেসে বলে, পরিচয় জানেন আমার ? সরকারের সঙ্গে সম্প্রীতি নেই। জেল থেকে বেরিয়েছি এই কদিন আগে—

নমস্কার মশায়, নমস্কার ! দুহাত জুড়ে অনুপম কপালে ঠেকাল। বলতে লাগল, আমরা জেলে যাই নে, কিন্তু যাঁরা যান তাঁরা নমস্য। এই যে আনা দুই আন্দাজ স্বরাজ পেয়েছি, অ্যাসেম্বলির গদিতে বসে চুটিয়ে দেশ-সেবা করছি—এ যে কাদের ঠেলায় তা বুঝি মশায়। অকৃতজ্ঞ নই।

বলতে বলতে হেসে ওঠে। বলল, শুধু একটা আরজি—আপাতত কিছুদিন এবার বাইরে থাকুন অনুগ্রহ করে। এই দুটো কি তিনটে বছর—তার মধ্যেই ইংরেজ আবার গোছগাছ করে নিতে পারবে। তদ্দিন এইখানে সঙ্গী হয়ে থাকবেন আমার।

উমা বলল, ইংরেজ জিতবে শেষ পর্যন্ত, এই আপনার অনুমান ?

অনুমান নয়, পাকা সিদ্ধান্ত। বলে অনুপম ঘাড় নাড়ল। বলতে লাগল, সর্বস্ব স্টেক করছি। সে সব খুলে বলবার ব্যাপার তো নয়, অনুমান করে

নিন। কত লেনদেন বিলিব্যবস্থা বাকি থাকবে, ইংরেজ না জিতলে রক্ষা আছে? জেতাতেই হবে—

পান্নালাল বলে, আমরাও একমত আপনার সঙ্গে। আমাদের নিজেদের বাহিনী যখন নেই, অগত্যা এই পক্ষেরই জয় চাচ্ছি—

অনুপম আশ্চর্য হয়ে বলে, আপনারা?

কারণ, জিতলেও নখদন্তহীন এরা সাম্রাজ্যিক শোষণ টিকিয়ে রাখতে পারবে না। নতুন বিজয়ে মাতাল আর-এক বিদেশির আনকোরা জোয়াল ঘাড়ে করার চেয়ে এটা মন্দের ভালো।

তেতলায় নিয়ে চলল অনুপম। পাশাপাশি চারটে ঘর। বলে, এটা বসবার ঘর, ওটা শোবার ঘর, ওটায় কাপড়চোপড় থাকবে, আর ঐটে হবে আপনার স্টাডি। অসুবিধা হবে না, কি বলেন?

পান্নালাল বলল, তা গোড়ায় হবে বই কি! নিশ্চয় হবে।

একটু আশ্চর্য হয়ে অনুপম তাকাল তার দিকে।

পান্নালাল বলতে লাগল, শোবার ঘরেই হয়তো পোশাক পরে ফেলব কখন, স্টাডিতেই পড়ে পড়ে ঘুমোব। সময় লাগবে বই কি এত অভ্যাস করে নিতে।

আস্তানা ঠিক করে এবার একদিন উমার সঙ্গে পান্নালাল চলল ভবানীপুরে রঞ্জনলাল দাসের কাছে। রঞ্জন নাম-করা কর্মী, মফস্বলে বাড়ি, বার মাস মফস্বলেই থাকে, কদিনের জন্য এসেছে কি কাজে। তার কাছে দেশের মানুষের খাঁটি খবর সে জানতে পারবে। জেনে ওয়াকিবহাল হবে। দেড় বছরের মধ্যে বিস্তর অঘটন ঘটে গেছে। রেঙ্গুন জাপানীদের দখলে। বর্মার উত্তর অঞ্চলে সম্প্রতি এঁরা সংগ্রাম ও বীরোচিত বেগে অপসরণ করছেন। সাত সমুদ্র পার হয়ে ক্রীপস সাহেব উড়ে এসেছেন প্রতিশ্রুতি-পত্র নিয়ে, পাঁচটার মধ্যে চার দফাই তার দুর্নিরীক্ষ্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। গান্ধিজির কথায় —দেউলে হতে চলছে যে ব্যাঙ্ক, তার উপর দূর-তারিখের দরাজ চেক-কাটা।

পুরাতন কথার নূতন ভাষায় মোলায়েম আবৃত্তি। ক্ষুণ্ণ চিত্তে অবশেষে ফিরে গেছেন ক্রীপস সাহেব। ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ যেন ভারতের আবহাওয়ায়। দেশের নাড়িতে কি প্রতিক্রিয়া চলছে এ সমস্তর, ভাল করে জানবার দরকার বই কি!

হেঁটে যাওয়া চলে না অত দূর। ভবানীপুর কি এখানে? ট্রামে লোকারণ্য। জানলার কাঠ ধরে শূন্য মার্গে ঝুলছে অন্ততপক্ষে জন ত্রিশ। সমস্ত দিন জনপ্রবাহ চলছে এই রকম স্টেশনমুখো! বিপাকে পড়ে আবালবৃদ্ধ অকস্মাৎ বিষম ব্যায়ামবীর হয়ে পড়েছে। গাড়ির দরজা দিয়ে ওঠানামা মুষ্টিমেয়র ভাগ্যে ঘটে, জানলার খোপ কিম্বা পিছন দিক দিয়ে সব লাফিয়ে উঠছে, টপকে পড়ছে।

অতএব যদিচ দক্ষিণ দিকে ভবানীপুর, এরা চলল উত্তরে। ডিপো মাইল-খানেক পথ। তার আগে ওঠা যাবে কি না, সেটা নির্ভর করে গায়ের জোর আর কলকৌশলের উপর। জেলে থাকার দরুন এ সম্বন্ধে পান্নালাল নিতান্ত আনাড়ি। বিশেষত উমা আছে সঙ্গে। অতএব ডিপো পর্যন্তই যেতে হবে, মনে হচ্ছে।

অনেক কষ্টে অবশেষে তারা বেঞ্চির উপর বসেছে। গাড়ি ছাড়ো-ছাড়ো। পিছনের ভিড় থেকে পিঠে পড়ল মৃদু এক টোকা।

মুখ ফিরিয়ে পান্নালাল অবাক হয়ে বলে, আপনি?

সুপ্রিয়া একেবারে তাদের বেঞ্চির পিছনটিতে এসেছে। পান্নালাল প্রশ্ন করে, আপনি যাচ্ছেন ট্রামে?

সুপ্রিয়া বলে, আশ্চর্য হচ্ছেন?

না আনন্দ হচ্ছে।

দুর্দশা দেখে? পেট্রোল পাওয়া যায় না, গ্যারেজে পচছে ক্রাইসলারখানা—

পেট্রোল এইরকম না পাওয়া যায় আর কখনো!

অর্থাৎ বিজ্ঞানের নির্বাসন চান সমাজ থেকে?

পান্নালাল বলে, বিজ্ঞানের সুখ পেলাম কবে যে নির্বাসনের কথা উঠবে? সে তো শুধু আপনাদের জনকয়েকের—

হাসিমুখে আবদারের ভঙ্গিতে সুপ্রিয়া বলল, উঠুন। দাঁড়িয়ে আছি দেখছেন না? বসব।

আপনি বসলে আমাকেই যে দাঁড়াতে হবে।

মহিলার সম্ভ্রমজ্ঞান নেই? ছি-ছি—

পান্নালাল বলে, দেখুন, লেখাপড়া শিখেছেন—স্বতন্ত্র সম্ভ্রমই বা চাইবেন কেন আপনারা? হেসে উঠে বলল, আপনারা কি সংখ্যালঘিষ্ঠ? ঐ যেমন কাগজে লিখে থাকে—প্রমাণ করুন যে তাই আপনারাও। হৈ-চৈ করে চরম পরাকাষ্ঠা দেখান আত্মমর্যাদার।

উমা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

বসো ভাই সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া বলে, না—না, সে কি? তোমাকে কে বলছে?

পান্নালাল বলে, তোয়াজে রাখা শরীর আপনার, দাঁড়িয়ে হাঁপ ধরে যাচ্ছে। আর রোদে পিকেটিং করে করে কড়া পড়ে গেছে উমার চামড়ায়। তার উপর মাস্টারনি—বেত নাচিয়ে গ্রামার শেখায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ও-ই দাঁড়িয়ে থাকুক। অভ্যাস আছে, ক্ষতি হবে না।

সুপ্রিয়া যেমন ছিল, দাঁড়িয়েই রইল। পান্নালাল উমাকে বলে, মিছে তুমি জায়গা করে দিলে। বসবেন না উনি, বসতে পারেন কি আমার মতো লোকের পাশে?

সুপ্রিয়া ভ্রূভঙ্গি করে তাকাল পান্নালালের দিকে।

তা পারব কেন? পিন পোঁতা রয়েছে কি না আপনার পাশে!

ঝুপ করে সে বসে পড়ল।

তা হলে আমিই উঠলাম।

সত্যি পান্নালাল জায়গা ছেড়ে উঠল।

এ কি রকম অনর্থক ঝগড়া! উমার বড় অসোয়াস্তি লাগছে। ব্যাপারটা লঘু করে সে উড়িয়ে দিতে চায়। বলল, আমার দুঃখে বিচলিত হয়ে বুঝি দাদা?

উঁহু। সুপ্রিয়ার দিকে আড়-চোখে চেয়ে পান্নালাল বলতে লাগল, আশঙ্কা হচ্ছে—হয়তো উনি মনে করবেন, কৃতার্থ হয়েছি ওঁর সুকোমল সান্নিধ্য পেয়ে—হয়তো বা গল্প করবেন এই সব—

সুপ্রিয়ার দুচোখে যেন অগ্নিকাণ্ড। এক ঝটকায় উঠে জনতা ঠেলে পথ করল। সেইখানেই একটা স্টপ—চক্ষের নিমিষে নেমে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উমা দুঃখিত স্বরে বলল, এ বিষম অন্যায় তোমার পানু-দা—না-হক এমনি অপমান করা, তোমার মনে সব সময় একটা কমপ্লেক্স পীড়া দিচ্ছে।

না রে, পীড়া দিচ্ছিল ছারপোকা। কষ্টে-সৃষ্টে মান-ইজ্জতের ভয়ে বসেছিলাম এতক্ষণ। ঝগড়া করে উঠে দাঁড়িয়ে বেঁচে গেলাম রে ভাই—

সে হেসে উঠল।

জেলের দরজায় পান্নালালকে যে বোঁচকাটা ফেরত দিয়েছিল, তার মধ্যে ছিল এক জোড়া খড়ম, প্রায় মান্ধাতার আমলের। যে সময়ে কলেজে সে ইস্তফা দিল, সেই তখনকার কেনা। গভীর রাত অবধি সেই খড়ম পায়ে খটখট করে পাশাপাশি চারটে ঘরের মধ্যে সে পায়চারি করে বেড়ায়। অনুপম শুয়ে শুয়ে ঘুম না আসা পর্যন্ত কংক্রিটে তৈরি নূতন বাড়িতে সেই আওয়াজ শোনে। শুনে আরাম পায় মনে মনে, গোঁয়ার-গোবিন্দ ঐ স্বদেশি মানুষটা জেগে জেগে তার বাড়ি পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

পায়চারি করতে করতে পান্নালাল একবার বা বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ায়। অন্ধকারমগ্ন শহর আকাশের চাঁদ-তারার মাঝ দিয়ে অগ্নিক্ষরণের ভয়ে নিরুদ্ধশ্বাস হয়ে আছে। নিঃশব্দ, পথ-ঘাট নির্জন, জীবন্ত মানুষ সমস্তই যেন

চলে গেছে—বাড়িগুলো পড়ে রয়েছে শুধু। যেমন একবার সে ফতেপুর সিক্রিতে বিশাল পরিত্যক্ত রাজধানী দেখে এসেছিল তেমনি। আবার যেন সুতানুটি-গোবিন্দপুর দেখা দিচ্ছে এই শহরে, সন্ধ্যাবেলা শিয়াল ডাকবে চৌরঙ্গিতে, রাত দুপুরে আসবে বাঘের আওয়াজ।

কিছু লিখবে বলে অনেক দিনের পর বসল পান্নালাল। লেখক মানুষ সে—কিন্তু পোষাপাখির মতো প্রথম বয়সের সেইসব মিষ্টি মিষ্টি বুলি কপচাতে এখন তার লজ্জা লাগে। মরুভূমিতে ফুল ফোটে না—কেবল কাঁটাভরা ক্যাকটাস। জাত-গোলামের আবার ভালবাসাবাসি কি? নিছক যেটুকু সামাজিক প্রয়োজন—তার অধিক নয়…

কে আসে?

এস. বি. পুলিশ নয়—সুপ্রিয়া। তার ঘরে লক্ষপতি রাইস-প্রিন্সের মেয়ে—ট্রামের মধ্যে যাকে অপমান করেছিল। সত্যি, আজব পৃথিবী দেখছে সে দেড় বছরের পর এই বাইরে এসে।

কলকণ্ঠে সুপ্রিয়া প্রশ্ন করে, এখানে থাকেন আপনি?

খুঁজে বেড়াচ্ছেন?

সুপ্রিয়া বলে, অনুপমবাবুকে—

তাই বলুন। সমস্যার যেন মীমাংসা হয়ে গেল, এমনিভাবে নিশ্চিন্তে মুখ ফিরিয়ে পান্নালাল আবার লিখতে লাগল।

সুপ্রিয়া গেল না, উসখুস করছে। পান্নালাল হাত তুলে দেখিয়ে দেয়, অনুপমবাবু নিচে; তেতলা ছেড়ে নেমে গিয়েছেন আজকাল।

পাশে এসে সুপ্রিয়া ঘনিষ্ঠ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, কি লিখছেন?

গালিগালাজ—

এ বিদ্যেয় মহামহোপাধ্যায় তো আপনি। পাত্র পেলে স্থান-কালের বিচার করেন না। ঘরে বসে তারই মক্স করেন বুঝি?

পান্নালাল বলল, এ গালি যাদের নামে তারা অবোলা বঙ্গনারী নয়।

শুনতে পেলে মুখ রাঙা করে নেমে যাবে না, চোখ রাঙা করে তেড়ে আসবে।

হঠাৎ সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা—একটা কথাও হেসে কইতে পারেন না কি আপনি? এ কি রোগ আপনার—কেবলই মুখ বাঁকিয়ে বেড়ান সমস্ত মানুষ আর সমস্ত কাজের উপর—

পান্নালাল বলে, ঐ যে বিদেশি সৈন্যগুলো চরে বেড়াচ্ছে এখানে, ওদের নামে এত অপবাদ শোনা যায় কেন বলুন তো! তারাও মায়ের ছেলে, বোনের ভাই—

কেন?

অস্বাভাবিক জীবন যাপন করে বলে। মানুষ মারবার কল-কৌশল শিখতে হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। দরদ নেই, শুধু নিয়মানুবর্তিতা। আমাদেরও তাই। পরাধীনতা মানুষের সমাজে সবচেয়ে জঘন্য অনিয়ম।

গভীর দৃষ্টিতে সুপ্রিয়া চেয়ে আছে। লজ্জা হল পান্নালালের। নিতান্তই গায়ে পড়ে অপমান করেছিল সেদিন, একগাড়ি মানুষের মধ্যেও রেহাই করে নি। বলল, স্থূল মনে আঘাত তেমন হয়তো লাগে না, কিন্তু আমার বিচার-বুদ্ধি একেবারে ঘুলিয়ে যায়। সেদিনকার ব্যাপারে আপনি রাগ করেছেন নিশ্চয়—

না, রাগ করব কেন?

করা উচিত ছিল। পান্নালালের স্বর নিমেষে রুক্ষ হয়ে উঠল। বলে, স্থূল মনের কথা বলছিলাম, আপনিই তার একনম্বর দৃষ্টান্ত। অপমান বেমালুম হজম করতে পারেন, প্রতিকার তো পাছের কথা—রাগ করবার শক্তিটুকুও নেই।

সুপ্রিয়া বলল, কিন্তু সে আপনি বলেই। আর একদিন অতবড় অপমান থেকে বাঁচিয়েছিলেন, সে কি ভুলে যাব? আসানসোল রেল-স্টেশনে—

মাতাল গোরাগুলোর সঙ্গে ঘুসোঘুসি করেছিলাম। বিশ্বাস করুন,

আপনাদের অপমান থেকে বাঁচাবার মতলব তাতে ছিল না। দেশটাই যখন গরিব-কাঙালের, গোটাকয়েক দরিদ্র-অক্ষমের সেবায় পৌরুষ দেখানো তথা পুণ্যলাভের লোভ আমার নেই।

তা হলে?

তাদের বুঝিয়ে দিলাম, সাদা চামড়া হলেই লাটসাহেব হয় না। পরাধীনের পায়ের শিকলের খবরদারি করে বেড়ায়—ওদের জব্দ করবার সুযোগ পেলে কিছুতে আমি ঠিক থাকতে পারি নে।

সুপ্রিয়া বলে, গোটা জাতের বিরুদ্ধে আক্রোশ? কিন্তু ইংরেজ কেবল তো লিওপোল্ড আমেরি নয়, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজও—

পান্নালাল বলে, সেইটে মনে থাকে না। দুশ বছরের গোলামি স্মৃতিভ্রংশ করে দেয়। শুনুন, সন্তোষ বলে এক কলেজি বন্ধু ছিল আমার। একদিন চুনোগলি দিয়ে যাচ্ছি, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের এক বাচ্চাকে একলা পেয়ে সন্তোষ কান মলে দিল। মাতাল গোরা পেয়ে ঐ যে আমি হাতের সুখ করে নিয়েছিলাম—সেই রকমটা আর কি? বলবেন, নিছক কাপুরুষতা সন্তোষের—এবং আমারও। কিন্তু পরাধীনকে কাপুরুষ বললে গালাগালিটা বেশি হল কি? আপনাকে যে অপমান করেছিলাম, সে-ও একরকম কর্তাকে না পেয়ে পেয়াদার উপর এক হাত নিয়ে নেওয়া। স্বীকার করছি, মন আমার অসুস্থ।

শুধু মন নয়, দেহটাও। দরদে অতি স্নিগ্ধ সুপ্রিয়ার মুখখানা। বলল, উমার কাছে আমি আপনার সমস্ত শুনেছি। এদ্দিন আটকা ছিলেন, ফাঁকায় যাবেন আমার সঙ্গে আমাদের গ্রামে?

পান্নালাল বলল, গ্রামে যাচ্ছেন?

বাবার মন টেনেছে এবার। সবাই যাচ্ছি আমরা। মস্ত এক গ্রামোন্নয়নের স্কীমও ফেঁদে ফেলেছি এর মধ্যে। কৃষক-সভা করে চাষাদের জাগিয়ে তুলব। ভাল করব সকলের, সবাই বেঁচে যাবে—

সকলের না হোক, আপনাদের ভাল হবে সন্দেহ নেই।

অর্থাৎ ?

শহরে হরিহর রায় হাজারটা আছে, ও-তল্লাটে আপনারা হবেন বিশেষ একটা—

নাম বাজাতে যাচ্ছি, আপনি বলতে চান ?

ইচ্ছে করে যাচ্ছেন না। জাপানিরা তাড়িয়ে তুলছে। মহাত্মা গান্ধি আর সতীশ দাশগুপ্ত এত বক্তৃতা আর লেখালেখি করে যা পারেন নি, জাপানিরা তাই করল।

সুপ্রিয়া রাগ করে না। হেসে বলল, বেশ তাই। কিন্তু জাপানিরা রেহাই দেবে না আপনাকেও। আপনি চলুন। উমাকেও তা হলে নিয়ে যাব টেনেটুনে।

না—বলে ঘাড় নাড়ল পান্নালাল।

অধীরকণ্ঠে সুপ্রিয়া বলতে লাগল, বোমার ঘায়ে চুরমার হবে এখানকার ঘরবাড়ি, মড়া রাস্তায় পচবে, লুঠতরাজ চলবে বেপরোয়া···হাসছেন আপনি ? বড় বড় নেতারা অবধি পালাচ্ছেন—

পান্নালাল বলে, বড় বলেই যাচ্ছেন তাঁরা। তাঁরা মরলে নেতৃত্ব মারা পড়বে, টাকা-পয়সা-মান-ইজ্জত যাবে। আমার কি—আমি মরলে যাবে তো শুধু প্রাণটা—

আবার কি বলতে যাচ্ছিল সুপ্রিয়া। বাইরে হাত বাড়িয়ে পান্নালাল বলল, নিচের ঘরে অনুপমবাবু। উনি যাবেন হয়তো ; ওখানে যান।

এক গম্ভীর বিচিত্র কণ্ঠস্বর পান্নালালের। সুপ্রিয়া আর কিছু বলতে ভরসা করে না। এক-পা দু-পা করে বেরিয়ে গেল।

পান্নালাল লিখে যাচ্ছে। দেড় বছর নেপথ্য-বাসের পর বাইরের এ কি চেহারা ! একটা বিচিত্র উল্লাস অনুভব করছে সে। গতানুগতিক দিনকাল আর নেই। এই ভাঙা-গড়ার পরিশেষে···তারপর ? রোমাঞ্চ লাগে মনের মধ্যে। যুদ্ধ মিটে গেলে যে যেমনটি ছিলেন—লণ্ডভণ্ড সম্পত্তি গুছিয়ে-গাছিয়ে

আবার যে সব গ্যাঁট হয়ে বসবেন, সেটি হবে না। বিপাকে শত্রু-মিত্র সবাই লম্বা ফিরিস্তি দিচ্ছে বড় বড় চার্টারে—কথার মারপ্যাঁচে হয়কে নয় করা চলবে কি এবার? জালিয়ানওয়ালাবাগে সেই সেবার যেমন ভারতবর্ষের মিলেছিল পুরস্কার? সঙ্কটের শেষে যে জায়গায় পৌঁছবে বলে সাবধানী ডিপ্লোম্যাটরা নিখুঁত হিসাব কষছে, তীরবেগে ঘটনাধারা ঠেলে ভাসিয়ে বিপর্যয় ঘটিয়ে দেবে সে সমস্তর। নূতন জীবন, নূতন জগৎ, নবীনতম ব্যবস্থা। এত শীঘ্র যে আসবে এমন দিন, অতি বড় আশাবাদীও কি ভাবতে পেরেছে? ভাবতে পেরেছিল কি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ার মানুষ?

খসখস করে মনের ভাবনা লিখে যাচ্ছে পান্নালাল। ভাষায় এসব সরব হলে পরাধীন দেশে বিপদ আসে! তবু সে লেখে এইরকম মাঝে মাঝে। মনের অব্যক্ত ব্যথা খানিকটা তাতে প্রকাশের তৃপ্তি পায়। কত দেশে আরও এমনি কোটি কোটি মানুষ দহন সইছে, লিখতে বসে ক্ষণিকের জন্য তাদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে পান্নালাল। লেখার পর হয় সে পুড়িয়ে ফেলবে, নয় তো এমন জায়গায় লুকোবে যে মানুষের চোখে তা পড়বে না। আজকের যাঁরা বনেদি দেশ-নেতা তাঁদের চোখেও নয়। তাঁরাও স্তম্ভিত হবেন ভবিষ্যতের সেই চেহারা দেখে, এত বিবর্তন বরদাস্ত করতে পারবেন না। অনেক বন্ধু হারাব, আবার নূতন নূতন বন্ধু পাশে এসে দাঁড়াবে অগ্রগমনের পথে। জনপ্রবাহ কারো ছক-কাটা সড়ক বেয়ে চলে না, নিজের বেগে পথ বানিয়ে নেয়। ভাব দিকি, প্রথম যুগের সেই আবেদন-নিবেদনপন্থী স্বরাজ-প্রচেষ্টা আজ কোথায় এসেছে, আর চলেছেও এ কোন্ দিকে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

বড় গ্রাম বাঁকাবড়শি। নদী ও বিল দুই প্রান্তে। বিলের ভিতর কাছাকাছি আরও দুটো গ্রাম আছে—মাদারডাঙা ও গড়ভাঙা। যেন দুটো দ্বীপ। নূতন বর্ষায় এখন আউশ-ক্ষেতের মাঝখানে বাড়ি-ঘর আম-কাঁঠাল-খেজুর-বাগান দেখতে ছবির মতো লাগে।

গড়ভাঙার কেদার মোড়লের বউ রূপদাসী বাপের বাড়াবাড়ি অসুখ শুনে বাপের বাড়ি ছুটল। গিয়ে দেখে বাপ মারা গেছে। কান্নাকাটি এবং শ্রাদ্ধ-শান্তিও চুকল। মাগ্যিগণ্ডার বাজারে কতদিন পরের সংসারে পড়ে থাকবে? আর থাকবেই বা কেন—নিজের ঘরে আধ-আউড়ি ধান এখনো। মেয়ে আর বাপ কি করছে, তিন তিনটে দোওয়া-গোরু ঠিকমতো জাবনা পাচ্ছে কি পাচ্ছে না—সংসারের নানা ভাবনায় মন তার বড় উতলা হয়ে পড়েছে।

আসবার দিন পাগল হয়ে এসেছিল—খানিক পথ হেঁটে, খানিকটা হাটুরে নৌকোর এক পাশে বসে। সে উত্তেজনা নেই এখন। ছোট ভাই মুকু নেড়ামাথায় পাড়ার মাতব্বরদের বাড়ি বাড়ি ঘুরছে, বড় ভাইটা নাকি ডাহা ফাঁকি দিচ্ছে, পৃথক না হলে আর চলে না। রূপদাসী বলে, যা করবার করিস রে ভাই, আগে আমায় রেখে আয়।

এখনো বিয়ে হয় নি, তাই বোনের কথা মুকুই যা একটু-আধটু শোনে। ঘাটে নৌকো নেই। এমনকি কাঠাখালি অবধি একদিন ঘুরে দেখে এল, সেখানে যদি কোন নৌকো ভাড়ায় যায়। ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, রূপদাসী পথ তাকিয়ে আছে, সেই সময় ভিজতে ভিজতে মুকু ফিরে এল। বলে, না দিদি, দেড় টাকা কবুল করলাম, তবু শালারা ঘাড় নাড়ে।

লাট সাহেব হয়ে গেল নাকি সব ?

ক্ষেতে যে বড্ড গোন। আউশ কাটা, আমন রোওয়া। আউশ ঘরে এনে তুলছে, আমন-চারা বওয়াবয়ি করছে ক্ষেতে। তার উপর বাঁধে মাটি দেওয়া আছে। এক ক্রোশ দুক্রোশ থেকে মাটি আনতে হয় নৌকোয় করে। নৌকো আজকাল কেউ ছাড়বে না।

রূপদাসী সভয়ে বলে, হেঁটে যেতে হবে নাকি তা হলে ? ওরে বাবা !

হাঁটবে কোথা ? আলপথ সব জলের নিচে। সাঁতরে যাওয়া ছাড়া উপায় দেখি নে।

কি করা যায় !

নিঃসীম বিলের দিকে চেয়ে চেয়ে রূপদাসীর কাঁদতে ইচ্ছে করে। কি করবে সে এখন ?

মুক্ত বলল, হতে পারে এক তালের ডোঙা। চড়তে পারবে ? বড্ড টলে কিন্তু।

ডুবে যাবে না তো ?

পিঁড়ি পেতে দেব। নড়াচড়া কোরো না, বসে থাকবে পুতুলের মতো।

এ ছাড়া উপায়ই বা কি ? একটা সুবিধা, নৌকোর আধাআধি সময়ে ডোঙা ঘাটে পৌঁছে যাবে।

রূপদাসী সাবধান করে দেয়, অথই জলে নিয়ে যাস নে কিন্তু। খবরদার। খালের কিনারে কিনারে যাবি।

মুক্ত বলে, বয়ে গেছে খাল ঘুরে ঘুরে যেতে। ধানবনের ভিতর দিয়ে কোণাকুণি চালিয়ে দিচ্ছি, দেখ না।

প্রাণপণে মুক্ত লগি ঠেলছে। ধানগাছ কাত হয়ে পথ করে দিচ্ছে। ডোঙার গায়ে খসখস আওয়াজ। ধারাল ধান-পাতা লাগছে রূপদাসীর গায়ে, নিটোল কালো বাহুর উপর সাদা সাদা দাগ ফুটে উঠেছে। বলেছে ঠিক— তীরের মতো চলেছে ডোঙা।

সারি সারি কয়েকটা শোলার ঝাড়—বিলের একটানা চেহারার মধ্যে রকমফের দেখা দিল। ঠিক সামনে বাঁশের খুটি দিয়ে মাচা বাঁধা হয়েছে, তার উপর হাত দুই-তিন উঁচু খড়ের কুঁজি। জায়গাটাকে বলে বড়-বাঁধাল। শোলার ঝাড়ের ধারে ধারে বিস্তর কুয়ো। আর দিনকতক পরে জলে টান ধরলে জেলেরা বাঁশের পাটা দিয়ে মাছ আটকাবে। অগুনতি মাছ এখানে, কই মাগুর সিঙি—

প্রলুব্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে মুক্ত লগি ঠেলছে। বলে, কুয়োর মুখে চারো পেতেছে দিদি। মাছ পড়েছে—মাছ পড়েছে—ঘাসবন নড়ছে ঐ দেখ। রোসো।

লগির লাথায় চারো উঁচু করে তোলবার চেষ্টা করে। হয় না। তখন ডোঙা সেইখানটায় ঠেলে নিয়ে নিচু হয়ে তুলছে। সহজে ওঠে না—ধানের পাতায় পাতায় গিঁঠ দিয়ে রাখা, উপরে শেয়াকুলের কাঁটা। চারো একটু উঁচু হতেই খলবল করে ওঠে ভিতরের মাছ। প্রকাণ্ড একটা শোল। মনের উল্লাসে লগি ফেলে সে দু হাতে মাছসমেত চারো জাপটে ধরতে যায়। হঠাৎ ডোঙা কাত হয়ে জল উঠল। রূপদাসী চেঁচিয়ে ওঠে, কুয়োর পাড়ে লাফাতে গিয়ে পড়ে গেল জলের মধ্যে।

কারা ওখানে? অঁ্যা—

মানুষের গলা, খুব কাছেই মানুষ। নূতন বর্ষায় উল্লসিত ঘন সতেজ ধানচারা এক একটা দিন আকাশের দিকে যেন এক এক বিঘত মাথা তুলছে। তোমার কাছ থেকে এক হাত দূরেও যদি কেউ থাকে, কথা না বলা পর্যন্ত টের পাবে না। কসাড় ধানবন বেমালুম ঢেকে রাখে।

শোলার ঝাড়ের আড়ালে খটাখট আওয়াজ, ডিঙি বেয়ে দ্রুত আসছে। এসে পড়ল—জোয়ান যুবা, লোহার মতো শরীর। ভর সন্ধ্যা। লোকটা হাঁক দেয়, তাই তো বলি—এত মাছ আস্ফালি করে বেড়ায়, চারোয় আমার মাছ ঢোকে না কেন? বারে বারে ঘুঘু তুমি—

রাগের বশে হাতের বৈঠা উঁচিয়েছে মুক্তর মাথার উপর। তখনো হাতে চারো—বামালসুদ্ধ ধরা পড়ে গেছে, কি আর বলবে মুক্ত, বাঁহাতখানা উঁচুতে তুলেছে, বৈঠার বাড়িতে মাথাটা দুফাঁক করে না দেয়। আর ওদিকে রূপদাসী চেঁচাচ্ছে, পাঁকে পা বসে যাচ্ছে—বাঁচাও গো বাঁচাও।

লোকটা ফিরেও তাকাল না, মুক্তর হাত থেকে এক টানে চারো নিয়ে যথাস্থানে বসাতে লাগল। রূপদাসী ক্রমাগত কাঁদছে, মরে যাই যে! তলিয়ে যাচ্ছি—ডুবে মরলাম।

মরবার অবশ্য কোন সম্ভাবনা নেই এরকম জায়গায়। খুব বেশি হলে কোমর-জল। চারোর উপর কাঁটা সাজিয়ে দিতে দিতে নিস্পৃহভাবে লোকটা বলে, দু পা এগিয়ে কুয়োর পাড়ে উঠে নাকে কাঁদোগে ঠাকরুন। বড় বড় জোঁক এখানটায়।

জোঁকের ভয়ে উঠি-পড়ি করে রূপদাসী উঠল পাড়ের উপর! ডিঙির দিকে আর লোকটার দিকে চেয়ে মুক্ত বলে উঠল, কার্তিক? ও দিদি, মাদার-ডাঙার দ্বারিক সর্দারের ছেলে—কার্তিক আমাদের।

মুক্তর কথা কানে না নিয়ে কার্তিক রূপদাসীকে প্রশ্ন করে, কোথায় যাচ্ছিলে তোমরা?

গড়ভাঙা—আমাদের বাড়ি সেখানে।

এস আমার নৌকোয়।

তাড়াতাড়ি মুক্ত খাতির জমাবার চেষ্টা করে। তা নৌকো একখানা বটে! এই হল বুঝি তোমার নীলমণি? কি গড়ন, কি রকম চলন! শখ করে নৌকার নামখানা যা দিয়েছ বাপু, একেবারে মোক্ষম।

বলে সে-ও এগিয়ে আসছিল। কার্তিক সঙিনের মতো বৈঠা উঁচিয়ে বলে, খবরদার! এক নম্বর হারামজাদা তুমি—আমার চারো ঝাড়ছিলে। নৌকো চড়তে হবে না, জল ভেঙে বাড়ি যাও। শামুকে পা কাটবে, সাপেও ঠুকতে পারে। বেশ হবে, চমৎকার হবে।

কুয়োর পাড়ে—রূপদাসী যেখানটায় দাঁড়িয়েছে, সেইখানে নৌকো লাগল। মুক্ত হতাশ হয়ে বলে, তুমি তা হলে যাও দিদি। আমি দেখি, ডোঙাটা তোলা যায় কিনা।

নীলরঙের ছোট নৌকো, পরিষ্কার ঝকঝক করছে। জল ছোঁয় কি না ছোঁয়—পাখির মতো উড়ে চলল। দেখতে দেখতে অনেক দূরে গেল। মুক্ত তখন চিৎকার করে বলে, ওরে আমার নেয়ে রে! তিনখানা গাঁয়ের মানুষ নৌকো-নৌকো করে মরছে—চাষবাস ভেস্তে যাবার দাখিল, আর বাবু বেড়াচ্ছেন চারো পেতে মাছ ধরে ফুর্তি মেরে। দুও—দুও—

সোজা উত্তর দিকে বটতলায় লাইনবন্দি গোলপাতার ঘর আর ছোট ছোট চালা। বউডুবির হাট ওটা, এ অঞ্চলের প্রধান গঞ্জ। মাঝারি গোছের এক নদী গিয়েছে হাটখোলার নিচে দিয়ে। এদের অতদূর যেতে হবে না। গড়ভাঙা এসে গেল বলে, তিনটে তালগাছ ঐ যে—ওরই কাছাকাছি ঘাট।

ঘাটে নেমে রূপদাসী বলে, এস বাবা—

কার্তিক ঘাড় নাড়ে, উঁহু।

বাড়ি আমাদের ঐ দেখা যাচ্ছে।

তা হলে যাও না গুটিগুটি। আমার কাজ আছে।

এত কষ্ট করে পৌঁছে দিলে। না বাবা, সে হবে না।

রূপদাসী খপ করে তার হাত ধরল।

মুখ বেজার করে কার্তিক পিছু-পিছু চলে। বলে, কত কাজকর্ম বাকি! মানুষের ভাল করতে গেলে হয় এই রকম। কলিকালে ভাল করতে নেই।

উঠোনে পা দিয়েই রূপদাসী কেদারকে বলে, যা বোঠে উঁচিয়েছিল ছেলে—মাথা ভেঙে ছাতু-ছাতু হয়ে যেত।

কার্তিক অপ্রতিভ হয়ে মুখ ফেরাল। দাওয়ার উপর থেকে খিল-খিল করে হেসে উঠল কেদার নয়—মেয়ে যামিনী।

খুশি যেন উপছে পড়ছে রূপদাসীর। কেদারের কানে কানে বলে, সেই

কার্তিক গো। চার বচ্ছর ঘোরাচ্ছে ওরা, আশায় আশায় মেয়ে থুবড়ো করছি। কায়দায় পেয়ে বাড়ি নিয়ে এলাম। আসতে কি চায়!

কার্তিক তখন বলছে, চলি এবার, কি বলেন?

কি রকম! এক-হাঁটু কাদা—হাত-পা ধোও, নেহাত দুটো নারকেলসন্দেশ মুখে দিয়ে যাও।

না, না,—আজ থাক, আর একদিন আসব।

কেদারের কাছে গিয়ে বলে, কলকেটা দেন বরং, দু টান টেনে যাই।

কার্তিক কলকে টানছে। যামিনী তখন দাওয়ার ওধারে পিঁড়ি পেতে জলের গ্লাস এনে জল ছিটোচ্ছে।

কার্তিক বিরক্ত হয়ে বলে, বললাম যে খাব না। গোরু মাঠে বাঁধা। গিয়ে এখন গোরু গোয়ালে তুলব। বসে বসে খাই কখন?

গরুর কথা মনে পড়তে শিউরে ওঠে। রাত হয়েছে, এখনো মাঠে পড়ে। এই বিল পাড়ি দিয়ে গাঁয়ে পৌঁছতে আরও কত রাত্রি হবে। সে উঠানে নেমে পড়ল। শব্দ শুনে পিছনে চেয়ে দেখে, যামিনী পিঁড়ি তুলে নিয়েছে; গেলাসের জলটা ছড়াত করে ঢেলে ফেলে দিল।

(২)

আসবে বলেছিল, তা কথা রেখেছে কার্তিক। দিন পাঁচেক পরে ঠিক দুপুরবেলা আপনি এসে উপস্থিত। রূপদাসী গামছা আর জলের ঘটি আনছিল। কার্তিক বলে, লাগবে না। ঘাট থেকে ভাল করে হাত-পা ধুয়ে এলাম।

আবার আমতা-আমতা করে কৈফিয়ত দেয়, হাটে যাচ্ছিলাম। তা মনে হল, কেমন আছেন সব দেখে যাই অমনি এই পথে।

কেদার বলে, হাটে আমিও যাচ্ছি। ওঠ তা হলে, কথাবার্তায় যাওয়া যাবে। রূপদাসী বলে, ছেড়ে দিও না কিন্তু আজকে, সঙ্গে করে এনো। রাত্রে থাকতে হবে বাবা, বুঝেছ?

কেদারকে ডেকে চুপি-চুপি বলে দেয়, মাছ কিনে এনো ভাল দেখে। সর্দার-বাড়ির ছেলে, যেমন-তেমন খাওয়া অভ্যাস নয় ওদের। আদর-যত্ন করতে হবে।

দুজনে যাচ্ছে। মাদারডাঙা গ্রামেরই রতন সর্দারের সঙ্গে পথে দেখা। অবাক হয়ে রতন বলে, হাটে চলেছ কার্তিক-দা? শুনলাম, তুমি পালিয়ে গেছ। তোমার বাপ তো কুরুক্ষেত্তোর লাগিয়েছে। গালি দিয়ে ভূত ভাগাচ্ছে তোমার নামে।

কার্তিক বলে, এই দেখ। গাঁজা খেয়ে রটায় নাকি এই সমস্ত? বাবাই তো হাটে পাঠাল। কালোবয়রা ধানের বীজ-পাতা কিনতে যাচ্ছি।

হাটখোলায় সবচেয়ে বড় আড়ত ভূষণ দাসের। তারও বাড়ি গড়ভাঙায়—কেদারের গ্রামে। আউশধান সবে উঠছে; যা আমদানি হয়, প্রায় সবই ভূষণ দাস কিনছে। ধান-চালের চালান দেবে এবার কলকাতায়, এইরকম মতলব। হরিহর রায়ের বর্মার ব্যবসা ডুবেছে, কায়েমি হয়ে তিনি কলকাতায় এসেছেন। ভূষণের সঙ্গে তাঁর যে চিঠিপত্র চলেছে, চালানি কারবারের প্রসঙ্গও আছে তার মধ্যে।

কেদার ধানের দর নিতে এসেছে। এ সময়টা প্রায় প্রতি হাটেই সে আসে; নূতন ধান যা পেয়েছে, তাক বুঝে তার কতক বেচে দেবে। জমিজমা বেশি নয়; আর শরীর ভাল নয় বলে খাটতেও পারে না সে রকম। সামাল হয়ে হিসাবপত্র করে চলে। আর রূপদাসীও পাকা গিন্নী। সেই জন্য অভাব নেই তার সংসারে।

ভূষণের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং আর দু'চারজন ব্যাপারির সঙ্গে দরাদরি করে কেদার ও কার্তিক মেছোহাটায় ঢুকল। জো আছে ঢুকবার? পায়ে জুতো চাষাপাড়ার সকলেরই। নূতন ধান-বিক্রির টাকায় মেজাজ গরম। টেড়ি-কাটা কানে বিড়ি গোঁজা ফূর্তিবাজ ছোকরাগুলো কনুই ঠেলে মাছের ডালার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ছে।

জেলেরা মাছ নামিয়ে রেখে ভাঁড় নিয়ে ছোটে নদীর ঘাটে। কেদার ডালা উঁচু করে করে দেখে, পছন্দসই মাছ কি এল। এসেছে—কার্তিকেরই কপাল-জোর—এ রকম ভেটকি ইদানীং আসে না বড়-একটা।

জেলে ফিরে এসে মাছে জল ছিটাতে লাগল। কেদার বলে, তোল দিকি ঐটা পাড়ুয়ের পো।

ছোটখাট অন্য মাছ তুলছে জেলে, কেদারের কথা কানে নিচ্ছে না। কেদার আঙুল দেখিয়ে বলে, আহা ঐ যে—ঐ ভ্যাকটটা—(ভেটকি বড় হলে সম্মান করে এই নাম দেওয়া হয়।)

জেলে বলল, হাট লাগুক ভাল করে। আসুক মানুষজন।

এত মানুষ—দেখতে পাচ্ছ না চোখে ?

এবারে জেলে মনের কথা স্পষ্ট বলে ফেলল। মানুষ আছেন আজ্ঞে, কিন্তু এ মাছ খাবার মানুষ নেই এক দ্বারিক সর্দার ছাড়া।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, কি জানি আসছেন না কেন এখনো ? তিনি এলে তুলব।

কথাটা এমন খাঁটি যে এত লোকের মধ্যে একটা কথা কেউ বলল না। কার্তিক কেবল আগুন হয়ে উঠে, এ তল্লাটে আর কেউ নেই তিনি ছাড়া ?

আবার কি বলতে যাচ্ছিল জেলে। চিৎকার করে কার্তিক বলে, কত দাম চাও, বল—

তখন জেলে মাছটা ডালায় তুলে দর হাঁকে, পুরো টাকা।

ভিড়ের মানুষদের সাক্ষি মেনে কেদার বলে, শুনলে তো ? শোন সকলে, এক টাকা চাচ্ছে মাছের দাম।

জেলেকে বলে, খেদাই না উঠোন চষি—তোমার হল সেই বৃত্তান্ত। মাছ তুললে বটে, কিন্তু বেচবে না দেখছি দ্বারিক না আসা পর্যন্ত। একটা মাছের দাম এক টাকা—কোন পুরুষে কেউ শুনেছে ? খদ্দের-তাড়ানো দর বললে চলবে কেন বাপু ?

জেলে নরম হয়ে বলে, এক দরে কেনা-বেচা হয় না তো। আপনি কত বলছ ?

তিন আনা—

চোখ টিপে হাসিমুখে কেদার জেলের দিকে তাকায়।

কি হে, বলছ না যে কিছু ?

কি বলব ? জানি তো সবাইকে ! ঐ জন্যেই তুলতে চাচ্ছিলাম না—

কেদার বলে, চৌদ্দ পয়সা···যাক্‌গে সমান সমানই হল।

সমান সমান অর্থাৎ চার আনা—পুরোপুরি সিকি একটা।

জেলে চটে গিয়ে বলল, চার আনায় মোড়ল মশায় এ মাছের কানকো দিতে পারি একখানা।

কার্তিক লাফিয়ে পড়ে মাছ চেপে ধরে। বেশ, কানকো কেটে দাও। ছাড়ব না—শুধু কানকোই নিয়ে যাব। ইয়ার্কি খদ্দেরের সঙ্গে ?

গণ্ডগোল জমে উঠল। চেঁচামেচিতে যত হাটুরে মানুষ ছুটছে সে দিকে। কেদারকে জিজ্ঞাসা করে, হল কি মোড়ল ? তুমি বুড়ো মানুষ—ছি-ছি, হাটের মাঝখানে এ সমস্ত কি কাণ্ড ?

কেদার লজ্জা পায়। অবস্থা বুঝে কার্তিক সরে দাঁড়াল। বলে গেল, আচ্ছা—কে নেয় ও-মাছ ওর বেশি দিয়ে, দেখি। চলে যাচ্ছি নে আমরা।

এদিক-ওদিক তারা ঘোরাঘুরি করছে। তরকারিহাটায় গিয়ে কাঁচকলা কিনল। ভূষণের কর্মচারী তিনকড়ির সঙ্গে কার্তিকের ভাব-সাব আছে, সেখানে বাখারির মাচার উপর বসে বিড়ি ধরাল একটা। নজর সব সময় ঐ মাছের দিকে।

হঠাৎ কার্তিক শুকনো মুখে উঠে দাঁড়ল। মাথা ঘুরছে।

সে কি ? মহাব্যস্ত হল কেদার। তাই তো, মুশকিল হল যে এই হাটের মাঝখানে !

দোকানের ঝাঁপের বাঁশটা ধরে একটু সামলে কার্তিক বলে, ও কিছু না। মাঝে মাঝে হয় এই রকম। বেসাতি করুন আপনি—আমি ফিরি।

কেদার বলে, যাচ্ছ আমাদের ওখানে তো? না গেলে যামিনীর মা বড্ড রাগ করবে।

তাই যাব আজ্ঞে। দাঁড়াতে পারছি নে, চললাম।

একরকম সে ছুটে বেরুল।

দ্বারিক সর্দারকে দেখা গেল ওদিকে। ধেনোহাটে দর নিয়ে সে আসছে। দীর্ঘ দেহ—পাকা চুল ও পুষ্ট গোঁফ-ওয়ালা মুখ হাটের সকল মানুষ ছাড়িয়ে দেখতে পাওয়া যায়। কথা বলে—যার না জানা আছে, সে মনে করে ঝগড়া করছে। বয়স হয়েছে কিন্তু সামর্থ্য একটুও কমে নি। পুরো জোয়ান, কেউ তার সঙ্গে লাঙল ঠেলে পারে না। হাট-বাজার সমস্ত সে নিজে করে। দ্বারিক যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, আপন-পর সবাই তটস্থ।

এমন মাছটা দেখে দ্বারিক উল্লসিত হল।

কত?

কিছু দর কমিয়ে জেলে বলে, বারো আনা—

দ্বারিক বলে, উঁহু, আট আনা। তুলে দাও—

কেদার ছুটে আসে। মাছ যে আমি তুলেছি সর্দার-ভাই—

এই এদের মধ্যে দস্তুর, একজনের পছন্দ-করা জিনিস দরাদরি চলতে থাকা অবস্থায় অপর কেউ নিতে এগোয় না।

দ্বারিক বলে, তুমি তো ছিলেই না মাছের কাছে।

কলহের সম্ভাবনা দেখে জেলে মাছটা তাড়াতাড়ি তুলে দিতে যায় দ্বারিকের খালুইতে। কেদার হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, কত দিচ্ছে সর্দার? বড্ড বাড় বেড়েছে, বিস্তর পয়সা হয়েছে—না?

আট আনা দর সাব্যস্ত হয়েছে, তা সত্ত্বেও দ্বারিক একটা আধুলি দিয়ে তার উপর ছুঁড়ে দিল আবার একটা সিকি।

অপমানিত কেদার হাঁক দিয়ে ওঠে, মাছ দিও না—খবরদার! আমি চোদ্দ আনা দেব।

রোখ চেপেছে দ্বারিকেরও। সে বলে, পাঁচ সিকে—

এর ভিতরে এসে পড়ল বিনোদ দাস—ভূষণের ছেলে। জেদাজেদি চলল দস্তুরমতো। শেষ পর্যন্ত সেই মাছ সাতসিকেয় এসে রফা হল। আধুলি আর সিকির উপর নিতান্ত বাজে কাগজের মতো একখানা এক টাকার নোট ফেলে বিজয়ীর দৃষ্টিতে এদিন-ওদিক চেয়ে দ্বারিক তুলে নিল মাছটা। বিনোদেরা কারবারি মানুষ—টাকা থাকলেও এমন অপব্যয় ধাতে সয় না। বিশেষ করে বাপের মুখোমুখি হতে হবে এখনি, এক শ' গণ্ডা কৈফিয়ত দিয়ে মরতে হবে, গালি খেতে হবে অতিরিক্ত দামে মাছ কেনার জন্য।

রূপদাসী ছিল রান্নাঘরে ; কেদারের সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এল।

কি নিয়ে এলে ? কই—একগাদা কাঁচকলা দেখছি যে কেবল। মাছ কোথা ?

হল না। দ্বারিক সর্দার ছোঁ মেরে নিয়ে গেল চিলের মতো।

গলা নামিয়ে কেদার জিজ্ঞাসা করে, ছেলেটা এসেছে তো ? মাথা ঘুরছে বলে চলে এল হাট থেকে।

রূপদাসী বলে, মাদুর পেতে দিয়েছি, চোখ বুজে পড়ে আছে। ঘুমিয়েছে বোধ হয়।

তারপর বিব্রত ভাবে সে বলে, কি করি এখন! মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে। তুমি হাড়-কিপ্পন—জানতাম, এই রকম কিছু হবে। ভাল ঘরের ছেলে, কোনদিন আসে না, কাঁচকলা সেদ্ধ আর ভাত আমি দেব কেমন করে ?

কেদার বলে, কি করব বল ? কে পারবে দ্বারিকের সঙ্গে ? পয়সা তো নয়—ধান-বেচা কাগজ। ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পয়সা যদি মনে করত, দরদ হত তা হলে।

অপমানের ব্যথা টন-টন করে ওঠে। হঠাৎ জলে উঠে সে বলতে লাগল, ধরাকে সরা ভাবছে—অতি-বাড় ভাল নয়। খোয়ারটা দেখে নিও এর পর—এই আমি বলে রাখলাম।

তামাক সেজে কেদার দাওয়ায় উঠল। ঘুম কোথায়—বেড়া ঠেশ দিয়ে বিলমুখো তাকিয়ে আছে কার্তিক। কেদার বেকুব হয়ে গেল। কথাবার্তা শুনতে পায় নি তো ছোকরা?

পায়স হবে, পিঠে হবে, মাছের খুঁত অন্য দশ রকমে পুষিয়ে দেবে। রান্নার ভারী আয়োজন। রূপদাসী রাঁধছে; যামিনী বাটনা করে দিচ্ছে, টেমি ধরিয়ে ঘন ঘন জল বয়ে আনছে পুকুর থেকে।

কলসি নিয়ে যেতে যেতে একবার শুনতে পায়, কথা হচ্ছে কেদার আর কার্তিকের মধ্যে—কেদার কার্তিকের বাড়ি-ঘর-দোর জোতজমি বিষয়-আশয়ের খবরাখবর নিচ্ছে।

টেমিটা রান্নাঘরে রেখে এসে আঁধারে আঁধারে যামিনী দাওয়ার পাশে দাড়াল। টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়ছে, আঁচলটা তুলে দিল মাথায়। আর কি কথাবার্তা হয় শুনবে সে ভাল করে।

সীমাহীন বউডুবির বিল। বাদলার বাতাস আসছে হু-হু করে, গাছপালার ব্যবধান নেই। আঁধার ধানবনের মধ্যে অনেকগুলো আলো ঘুর-ঘুর করছে। কি, ও সমস্ত কি? আলচোরা (অর্থাৎ আলেয়া) নাকি? গাঁয়ের এত কাছাকাছি এসেছে আলচোরা? কেদার বুঝিয়ে দেয়, উঁহু—আলোর মাছ-মারার মরশুম পড়েছে আমাদের এদিকটায়। গাঁয়ের মানুষ মাছ মারতে এসেছে।

শিকারি কার্তিক লাফিয়ে ওঠে। যাই না কেন?

বল কি? বিকেলবেলা তোমার অসুখ হল—

কার্তিক কানেই নেয় না কেদারের কথা। ডাক দেয়, ও যামিনী, দা-টা আনো দিকি। আর লণ্ঠন একটা। আহা, আপনি কেন—বুড়োমানুষ, আপনাকে যেতে হবে না—

কিন্তু সর্দার-বাড়ির ছেলে, একটা রাতের অতিথি, সে একলা বিলে যাবে এই বা কেমন করে হয়! আর মেয়েটা তেমনি—মুখের কথা না বেরোতে খেজুরগাছ-কাটা ধারাল দা দিয়ে গেল, কাচে-ঘেরা লণ্ঠনের মধ্যে টেমি জ্বেলে রেখে গেল।

বিস্তর মানুষ ধানবনে। এক হাতে দা এক হাতে আলো, আর পিছনে চলছে আর একজন খালুই নিয়ে—এই রকম দুজনে এক-একটা দল। ধান-বনের আড়ালে-আবডালে সন্তর্পণে যাচ্ছে, কখন বা আলো ধরে থমকে দাঁড়াচ্ছে জলের উপর। আলো দেখে স্ফূর্তিতে মাছ কাছে চলে আসে, আলোয় সম্মোহিত হয়ে চুপচাপ মাথা ভাসান দিয়ে থাকে। তখন দা দিয়ে দেয় কোপ ঝেড়ে! জল রক্তাক্ত হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি মাছটা ধরে খালুইতে পুরে ফেলে।

হোগলাবনের নিচে এদিকে-সেদিকে এরা ঘুরল অনেকক্ষণ। একটা কই আর দুতিনটে শিঙি মাত্র শিকার হয়েছে। জুত হচ্ছে না, মাছ সব সেয়ানা হয়ে গেছে, জলের উপর এত আলো নাড়ছে—মাছ আসে কই?

কেদার বিরক্ত হয়ে বলে, এত মানুষ এসে জুটেছে, মাছ তো মাছ—বাঘ অবধি ভয় পেয়ে যায়। আর কিছু হবে না, চল—উঠে পড়ি।

বহুদূরের কটা সঞ্চরণশীল আলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে কার্তিক বল্লে, ওদিকে হৈ-হৈ নেই। অনেক দূরে গেছে ওরা, বুদ্ধির কাজ করেছে। নৌকো নিয়ে গেছে বুঝি?

কেদার ঘৃণার ভাবে বলে, যাকগে—অমন যাওয়া কারো যেতে না হয়। হাঘরে মানুষ—ইটে নেই, ভিটে নেই। চাষার কি নৌকা নিয়ে মাছ ধরবার সময় এখন? না, প্রবৃত্তিতে আসে?

এমন সময় ধানবনের মধ্য থেকে ডাকছে, কোন গ্রাম এটা? উদ্বিগ্ন ব্যাকুল কণ্ঠে বারম্বার চিৎকার করছে।

কেদার হাঁক দেয়, কারা গো?

এটা কি বাঁকাবড়শিতে এলাম ভাই?

বাঁকাবড়শি যাবে, তবেই হয়েছে! দিকভুল হয়ে গেছে। ঘাটে এস। সমস্ত রাত চললেও বাঁকাবড়শি পৌছবে না।

কেদার লণ্ঠন উঁচু করে দাঁড়াল ঘাটের উপর। একখানা পানসি এসে লাগল। সওয়ারি হরিহর রায় আর সুপ্রিয়া। তাঁরা দেশে আসছেন। দেশে থাকবেন যতদিন গণ্ডগোল না মেটে। বিকালে স্টেশনে নেমেছেন। বর্ষার সময়টা সোজাসুজি বিল পাড়ি দিলে অনেক পথ-সংক্ষেপ হয়, সেই আশায় বিলে নেমে পড়ে দুর্গতি। সেই সন্ধ্যাবেলা থেকে ধানবনের অকূল পাথারে লগি ঠেলাঠেলি চলছে।

আশ্চর্য হয়ে কেদার বলে, আ আমার কপাল! কাশীনাথ মাঝি—তোমার এই কাণ্ড? যাবে উত্তরে, চলেছ সটান পশ্চিমমুখো—

কাশীনাথ লজ্জা পায়। এ অঞ্চলের নাড়ি-নক্ষত্র তার চেনা, তবু এই অবস্থা। দিনের বেলাতেই ধানবন পথ ভুলিয়ে দেয়, মাঝ-বিলে গিয়ে যেদিকে তাকাও এক চেহারা—তালগাছ, আমগাছ, খেজুরগাছ, বাঁশঝাড়, হয়তো বা খড়ের চালার একটুকু। যেটা দেখছ, সেইটাই মনে হবে তোমার গ্রাম। রাত্রে আরও মুশকিল। আলো দেখে বসতি অনুমান করতে হয়। সে আলো আলেয়া হতে পারে, ক্ষেতে-জ্বালানো আগুন হতে পারে—অন্ধের পথ-চলার অবস্থা আর কি!

হরিহর বললেন, পথটা খুব ভাল করে বাতলে দাও তো বাপু। ঠিকঠাক যাতে উঠতে পারি, আর ঘুরে মরতে না হয়—

কেদার বলে, নেমে আসুন কর্তা। কোন বেঘোপে গিয়ে পড়বেন, সমস্ত রাত কষ্ট পাবেন। আপনার মাঝির কাছে শুনে দেখুন—এ তল্লাটে সবাই জানে গড়ভাঙার কেদার মোড়লের নাম। গরিব মানুষ, কিন্তু ভালবাসেন সকলে।

পানসির ঠিক সামনে এসে দাঁড়াল। একেবারে নাছোড়বান্দা। বলে,

যখন আসা হয়েছে, পায়ের ধূলো দিতেই হবে। আমার বাপ-ঠাকুরদার কিরে দেওয়া আছে। বাঁকাবড়শি পথ বেশি নয় অবিশ্যি, কিন্তু কষ্ট হবে আল বাঁচিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে। ভাঁটা হয়ে গেছে, জলই নেই হয়তো অনেক জায়গায়, নৌকো চলবে না। কাজ কি, চলে আসুন। আসুন কর্তামশায়, আসুন খুকি-ঠাকরুন।

কাশীনাথ মাঝি চুপি-চুপি পরিচয় বলল, শুনে কেদার তাজ্জব হয়ে যায়। বাঁকাবড়শি আর মাদারডাঙা—দুখানা তালুকেরই মালিক ইনি। বউডুবির হাটও এঁর—ভূষণ দাস ইজারা নিয়েছে। সেই লক্ষপতি মানুষটি পরীর মতো পরমাসুন্দরী মেয়ে নিয়ে আজ পাড়াগাঁয়ে বিলের মধ্যে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। দেখ কাণ্ড!

হরিহর বলেন, এটা গড়ভাঙা? আমাদের ভূষণের বাড়ি এখানেই তো!

হাতজোড় করে কেদার বলে, তিনি বড়লোক, সেখানে তো যাবেনই। গরিবের উঠানের উপর দৈবাৎ যখন এসে পড়েছেন, কিছুতে ছাড়ব না, একটিবার নামতে হবে।

সুপ্রিয়া বলে, নামাই যাক না বাবা। দাসু আছে, চেনা মাঝি কাশীনাথ—

খেজুর-গুঁড়ি সাজিয়ে তৈরি খালের ঘাট, অনতিদূরে খোড়ো ঘর, পরিপাটি আঙিনা—তারার ম্লান আলোয় রূপকথার দেশের মতো লাগছে। এতক্ষণের আতঙ্ক গিয়ে আনন্দ উপছে পড়ছে সুপ্রিয়ার মনে।

(৪)

কেদারের পেটকাটা ঘরে হরিহর রায় জাঁকিয়ে বসেছেন। পাশে সুপ্রিয়া। খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে চিঁড়া-ভেজানো, পাকা কলা আর দুধ।

খেয়ে দেয়ে পরমানন্দে হরিহর ঢেকুর তুলছেন। ভাত রাঁধলেন না বলে খুঁতখুঁত করছিল কেদার। হরিহর বলেন, আরে ভাত তো অহরহ খেয়ে থাকি। একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম এ সবের আস্বাদ।

কেদারের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এদিককার অবস্থা কেমন? চাষবাস চলছে ভাল? পাল-পার্বণ হয় আগেকার মতো? চৈত্র-সংক্রান্তিতে মাদারডাঙায় সেই যে জাঁকিয়ে মেলা বসত—এখন হয়ে থাকে সে রকম?

ম্লানমুখে কেদার বলে, দিনকাল বদলে গেছে বাবু। না খেলে পেট মানে না, তাই খাওয়া। খাওয়ার সে আমোদ-ফুর্তি নেই। পাল-পার্বণ আছে, কোন রকমে রীত-রক্ষে। মানুষ কি রকম হয়ে যাচ্ছে যেন।

হরিহর বলেন, তবু তোমরা খাসা আছ হে। টানা-পোড়েন করে করে মরে গেলাম আমরা। যথাসর্বস্ব ফেলে প্রাণ হাতে করে এলাম বর্মা মুলুক থেকে। দুটো দিন জিরোতে না জিরোতে কলকাতা থেকেও তাড়া। কি যে আছে অদৃষ্টে, কি বলব।

শ্রোতাগুলি আগ্রহে উৎকর্ণ হয়ে আছে।

দম নিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, দেখছ কি, কলি ওলটাবে এবার। মহা-প্রলয়! রেঙ্গুন আর পেগুতে আমার চারটে আড়ত কড়কড়ে বোঝাই, আর এক তাঞ্চি চাল জোগাড় করতে গিয়ে পথের মধ্যে মেরে ফেলেছিল আর কি!

ভাগ্য ভাল যে, মেয়েরা কলকাতায় ছিল, বর্মায় ছিলেন তিনি একা। পাহাড়-জঙ্গল অতিক্রম করে লুণ্ঠক মগদের হাত থেকে আধ-মরা অবস্থায় দেশে এসে পৌচেছেন! এ এক নূতন জন্ম বললে হয়!

এরা শুনে যাচ্ছে, চমৎকার লাগছে। লোকে রূপকথা যেমন নির্লিপ্ত আগ্রহে শোনে, তেমনি একটা ভাব চোখে-মুখে। রেঙ্গুন নামটা শোনা আছে, কোথায় কেউ জানে না—রেঙ্গুন থেকে চাল আসে, একেবারে স্বাদহীন সাদা রঙের চাল, নিতান্ত অপারগ না হলে কেউ তা খায় না। আর জাপানি বোমাও জানে সকলে। একবার কালীপূজোর সময় নকড়ি দফাদার কি কি জাপানি মসলায় বোমা বেঁধেছিল, পয়সা-পয়সা বিক্রি করত। শেষ পর্যন্ত কোন বোমা ফাটল, কোনটা ফাটল না। নকড়ি বলত, তোমাদের কপাল

বাপু, আমি কি করব? সেই বোমায় নাকি রেঙ্গুন শহর তোলপাড় হয়ে গেছে, বোমাওয়ালারা দ্রুত এখন এগিয়ে আসছে এদিকে।

কার্তিক কেবল মাছ মারে না—বুনো শূয়োর, ক্ষেপা কুকুর, এমনকি কেঁদো-বাঘও কতবার সড়কির ফলায় গেঁথেছে। তার বীর-হৃদয় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বলে, মানুষ নেই সে দেশে? রুখতে পারল না?

সুপ্রিয়া বলল, দেশটা তাদের—তাই কি তেমন করে ভাবতে পেরেছে তারা? ভাবতে দিয়েছে কি?

ভাল রে ভাল! তাদের নয়—কার তা হলে? এই যে গড়ভাঙা-মাদারডাঙা—এ আমাদের হল না, হবে কি বিলপারের সাতু চক্কোত্তির?

সুপ্রিয়া জবাব দেয় না। কথা মনে লাগে। কিছুদিন থেকেই সে ভাবছে এই ধরনের কথা। ভাবছে, এ যে চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাচ্ছে দেশের মানুষ। বিপাকে পড়লে খিল-পারের চক্রবর্তী মশায়েরা বিল ঝাঁপিয়ে ঠিক ঘরে গিয়ে উঠবেন, মরতে মরব তখন আমরা হতভাগার দল। না—না—বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে যতটা সম্ভব তৈরি হতে হবে এরই মধ্যে। তৈরি করতে হবে এই এদের—গ্রামের প্রতি মানুষের প্রতি মন যাদের মমতায় ভরা।

হরিহর বলছিলেন, সে যাই হোক, দেশ পরের হোক বা নিজেরই হোক—কাজটা কি এগুবে তাতে? সবাই যে আমরা ঠুঁটো-জগন্নাথ। শুধু-হাতে লড়াই চলে?

বড্ড হাসি পায় কার্তিকের। এই সব ঘরে বসে গলাবাজি করেন, একটা আরশুলা উড়ে এলে কিন্তু এখনি চেঁচিয়ে কুরুক্ষেত্র বাঁধাবেন। মারামারি লড়াই-দাঙ্গার কি জানেন এঁরা? বলে, দেখেন নি কর্তামশায়, রোখের মুখে বেড়াল কি রকম লাথি মারে কুকুরের মুখে? গায়ের জোরের হিসাব করে লড়াই হয় না। আসুক দিকিনি সেই তারা আমাদের এ তল্লাটে—ধানবনে নাকানি-চুবানি খাইয়ে মারব না?

তা মিথ্যে নয়, সেটা মানি অবশ্য। বলে হেসে হরিহর ঘাড় নাড়লেন। ধানবনের মহিমা বিকাল থেকে তিনি হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছেন। বললেন, এসব জায়গায় আসা বাস্তবিক বড় মুশকিল বাইরের লোকের পক্ষে। কলকাতায় এতগুলো বাড়ি আমার—সমস্ত ছেড়ে তাই তো গাঁয়ে যাচ্ছি। জাপানি-জার্মান কারও চিনে আসতে হবে না এই ধাপধাড়া-গোবিন্দপুরের দেশে—

কার্তিকের ধরন-ধারন স্থপ্রিয়ার বড় ভাল লাগল। জোয়ান মরদ—তেজ আছে। অনেক রাত হয়েছে। সঙ্গে বিছানা ছিল—মেজেয় বিছিয়ে হরিহর শুয়ে পড়েছেন। স্থপ্রিয়া এখনও গল্প করছে। এদের মাঝখানে এই রকম জায়গায় রাত কাটছে, এ তার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। গেরিলা-যুদ্ধের গল্প হচ্ছে—সর্বস্ব হারিয়ে তবু মানুষ সকলের হুমকি মেনে নিচ্ছে না, কেমন করে পথ ভুলিয়ে নিজেদের খপ্পরে নিয়ে ফেলছে, শত্রু মারছে—মরছে নিজেরাও।

কার্তিককে বলে, শোন, এই সব কায়দা শেখাতে হবে সমস্ত অঞ্চলে। ঠিক শেখাবার জিনিস নয় অবশ্য। তবু যাঁরা এ সম্বন্ধে জানেন শোনেন, তাঁদের গ্রামে নিয়ে আসব। কৃষক-কনফারেন্স করব, এই দুর্দিনে কৃষকদের কর্তব্য বুঝিয়ে দেওয়া হবে। খবর দেব, তুমি যাবে তো? নিশ্চয় যেও। কাজ তোমাদের, তোমরাই সব ব্যবস্থা করবে।

কার্তিকের সত্যিই মাথায় ঢোকে না, সভাসমিতি করা ও শেখানোর কি আছে এই ব্যাপারে? বুনো-শূয়োর একবার তাদের মানকচু-বন তছনছ করেছিল। সড়কি নিয়ে সে ছুটেছিল বাঁধাঘাট অবধি শূয়োরের আড্ডায়। মানুষ-জন ডেকে কায়দা-কানুন শিখে আগে ভাগে তালিম দিতে হয়েছিল কি সে সময়?

শুয়ে শুয়েও কার্তিকের মনের মধ্যে তোলপাড় করছে ঐ সব। এই গ্রাম কি তার নয়? তার এবং আর যারা আছে এই অঞ্চলে? বউডুবির বিল, বড়-বাঁধাল, বউডুবির হাট, ধানক্ষেত, বাঁওড়, লাউমাচা, মাঠে-বাঁধা গরু-ছাগল, বিলে শাপলাফুলের রাশি,—কে আসবে জবরদস্তি করে এই সকলের মাঝে?

আসুক দিকিনি। চাঁদ উঠেছে, দাওয়ার উপর জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে পড়েছে। চাঁদটাকেও মনে হচ্ছে একেবারে নিজস্ব তাদের। সমস্ত মিলিয়ে যেন একখানা সাজানো বাগান। সে, তার বাবা, তার পিতামহ আর এমনি হাজার হাজার মানুষ রোদে পুড়ে বৃষ্টি আর ঘামে ভিজে বাগান সাজিয়ে রেখেছে, লণ্ডভণ্ড করতে এলে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবে নাকি তারা? নিঃসীম ধানবন—শনশন করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছে কম্পমান ধানের আগা। নৌকা নিয়ে ওর মধ্যে এক হাত দূরে ওত পেতে থাকলেও নজরে আসে না। শত্রু এলে ধানবনের ঐ গোলকধাঁধায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেরে ফেলবে তাদের। কার্তিকের নীলমণির নীল রং রাঙা হয়ে যাবে রক্তের ছোপে।

(৫)

অনেক মানুষ বাড়িতে। মা আর মেয়ে রান্নাঘরে শুয়ে ছিল। শেষ রাতের দিকে যামিনী ঘুম ভেঙে দেখে, একটা লণ্ঠন যেন চলেছে উঠান পার হয়ে—হাঁ, লণ্ঠনই। কার্তিক যাচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে ঝাঁপ খুলে সে ঠাহর করে করে দেখে। যাচ্ছে হোগলা-বনের দিকে। জঙ্গলের মধ্যে অবাধে ঢুকে পড়ল। বাপরে বাপ! আস্ত ডাকাত—সাপের ভয়ও করে না!

সকালবেলা হরিহরেরা চলে যাচ্ছেন। সুপ্রিয়া রূপদাসীকে বলে, চমৎকার কাটিয়ে গেলাম রাত্রিটা।

রূপদাসী বলে, কিছু যে খাওয়াতে পারলাম না মা! আমাদের ক্ষেতের লক্ষ্মীভোগ চাল—ভুরভুরে গন্ধ ছাড়ে, ফুঁ দিলে ভাত উড়ে যায়—

তার জন্যে কি? গাঁয়ে থাকছি তো, একদিন এসে খেয়ে যাব দেখবেন।

তারপর বলে, হাঙ্গামা মিটে যাক। কলকাতায় গঙ্গাস্নানে যান-টান যদি—আমাদের বাড়ি উঠবেন। বাগবাজারে, গঙ্গার থেকে দূর নয় বেশি—

রূপদাসী ঘাড় নেড়ে বলে, আ আমার কপাল! পাপী যাবে গঙ্গাস্নানে ঘুঁটে কুড়োবে কে?

কিন্তু পাপী হওয়ার দরুন দুঃখ মোটেই নয়—দেমাক-ভরা হাসি তার মুখে। বলে, দুদিন বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম, শেষটা ছুটে আসতে পথ পাই নে। আষ্টেপিষ্টে এমন বাঁধনে বেঁধেছে মা, যে না মরলে আর নড়বার উপায় নেই।

হাসতে লাগল রূপদাসী। কোমরের ভারী রুপোর গোট দুলছে হাসির সঙ্গে।

কার্তিক পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। উঠানে পুরো এক খালুই মাছ। সন্ধ্যার দিকে জুত হয় নি, কার্তিক করেছে কি—আবার নিশুতি রাত্রে জনহীন বিলে নেমে মনের সাধে মাছ মেরে এনেছে। বাতিক বটে!

ভাল করে রোদ না উঠতে দ্বারিক সর্দার এসে হাজির। রতন সর্দারের সঙ্গে সেই যে দেখা হয়েছিল কার্তিকের, খোঁজ দিয়েছে সে-ই। এতটা পথ দ্বারিক ছুটতে ছুটতে এসেছে। পা হড়কে পথে পড়ে গিয়েছিল, সর্বাঙ্গে কাদা। এসেই—ঘুমন্ত মানুষ বলে করুণা নেই—কার্তিকের পিঠের উপর দমাদম ঘুষি।

লাফিয়ে উঠে কার্তিক হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়াল।

মর, মর—মরিস নে কেন তুই?—মুখ দেখাবার জো থাকল না। হুঁকো-নাপিত বন্ধ হবে তোর জন্যে।

গতিক তাই বটে। বর্ষা চেপে পড়েছে, দিনরাত্রি খবর হচ্ছে—এই এখানে বাঁধ ভাঙল, ওখানে ভাঙো-ভাঙো। বৃষ্টি-বাতাস আলো-আঁধার নেই, দু-চারজন ঘুরছেই। আশঙ্কার কিছু দেখলে হাঁক ছাড়বে, এ-এ-এ—হৈ! ভয়ঙ্কর আওয়াজ। দিনমানে হোক, রাতদুপুরে হোক—সে ডাক শুনে কারও ঘরে থাকবার জো নেই। তোমার ধানজমি এককাঠাও যদি না থাকে, যেতে হবে দশজনের কাজে। ঘাটে যে নৌকো থাক—হোক তালুকদার-বাড়ির কিম্বা

ভূষণ দাসের অথবা বিদেশি গুড়ের ব্যাপারির—তখনি বিলে নিয়ে ছুটবে। ক্রোশের পর ক্রোশ ধানবন, এক ঝুড়ি মাটি আনতে হলে যেতে হবে গ্রাম অবধি। তার জন্য চাই নৌকো—দশ, বিশ, পঞ্চাশ—গোনাগুনতি নেই, যেখানে যত আছে সমস্ত। এ হেন সময়ে স্বার্থপর কার্তিক কিনা তার নীলমণি নিয়ে এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে !

কার্তিক আকাশ থেকে পড়ল।

পালিয়ে তো আসি নি—এঁরা নেমন্তন্ন করেছিলেন, তাই। তা বলে নৌকো আনলাম কখন ? কে লাগিয়েছে মিথ্যে করে, আর অমনি তুমি ক্ষেপে গেছ। এই এঁদের সব জিজ্ঞাসা করে দেখ না, নৌকো দেখেছেন কিনা ?

কেদারও প্রবল কণ্ঠে সায় দিল, না না—নৌকো-টৌকো নেই। আপনার কার্তিক এমনি চলে এসেছে। আমরা কেন মিছে কথা বলতে যাব ?

অপ্রত্যয়ের স্বরে দ্বারিক বলে, নৌকো হল ওর প্রাণ—নৌকো রেখে আসবে ? কি জানি ! কার্তিককে বলে, নিয়ে আসিস নি তবে কোথায় রেখে এলি, বের করে দিয়ে যা হারামজাদা, যদি ভাল চাস।

হাত ধরে এক রকম হিড়-হিড় করে তাকে টেনে নিয়ে চলল। ঘাট অবধি গিয়ে দ্বারিক আগুন হয়ে আবার ফিরে আসে। কেদারকে বলে, মিছে কথা বলেন না যে আপনি ? নৌকো নাকি আনে নি !

কেদার অবাক হয়ে বলে, এনেছে ? কই, আমরা তো—

দেখেন নি তো, দেখে যান। আপনি না দেখে থাকেন, আপনার মেয়ে কিন্তু দেখেছে। দেখে যান, নৌকোর উপর আপনার মেয়ে।

ঘাটে খণ্ডপ্রলয় বেঁধেছে। হোগলা-বনে নীলমণি লুকানো ছিল, যামিনী টের পেয়ে অনেক কষ্টে বের করে এনেছে। টের পেয়েছে শেষরাত্রে কার্তিক যখন চুপি-চুপি নৌকো নিয়ে আলোর মাছ মারতে বেরুল। এ সময়টা সবাই ওদিকে—খালের ঘাটে কারও আসবার কথা নয়। যামিনী লগি ঠেলছিল,

এই ফাঁকে কিছু শাপলা তুলে আনবার মতলবে। দ্বারিক যখন রাগে গরগর করতে করতে কেদারকে ডাকতে বাড়ির দিকে গিয়েছে, কার্তিক মেয়েটার কান ধরে নামিয়ে দিয়েছে নৌকো থেকে, কষে দিয়েছে এক চড়।

যামিনীর চোখে জল টলটল করছে। বলছে, নৌকো কি খেয়ে ফেলেছি? কেন মারবে আমায় তুমি? কেন? কেন?

দ্বারিক আর কেদার আসছে। কি না জানি ব্যাপার—রূপদাসীও খানিকটা পিছনে। কার্তিক উচ্চকণ্ঠে নালিশ জানায়, দেখেন তো—কাদা মাখিয়ে ছিরকুট্টি করেছে আমার নীলমণি।

বলতে বলতে স্বরটা ভারী হয়ে ওঠে। কেঁদে ফেলবে নাকি? বলে, সবাই নিন্দে করে, বাবা দুবেলা গাল-মন্দ করেন, তবু আমি এক কোদাল মাটি তুলতে দিই নে। দুবেলা ধুই, ছায়ায় ছায়ায় রাখি, রঙ মাখাই। দেখেন তো দেখেন, কি করেছে—

তখনো মেয়ের গালে পাচটা আঙুলের দাগ ফুটে রয়েছে। রূপদাসী দ্রুত কাছে আসে। কিন্তু মেয়ের হয়ে কিছু বলে না, উল্টে গালি দেয় তাকে।

মদ্দা মেয়ে, লজ্জা করে না নৌকো বাইতে? আবার ঝগড়া করছে দেখ না!

দ্বারিক এসে চোখ মুছে দিল যামিনীর। স্নিগ্ধকণ্ঠে বলে, কাঁদিস নে—কাঁদিস নে মা। হারামজাদাটাকে নিয়ে কি যে করি। কাজকর্ম করবে না—এই এক ডিঙি হয়েছে, খালি টহল দিয়ে বেড়াবে।···উঁহু, আর নয়—এই শ্রাবণেই চুকিয়ে ফেলতে হবে।

কেদারকে ডেকে বলে, বুঝলেন বেহাই, আর দেরি করব না, দেরি করে অন্যায় করেছি। কাজকর্ম কিছু দেখবে না, খালি টহল মেরে বেড়াবে। কাজ নেই আর বাছাবাছির। আপনার এখানে—এই শ্রাবণেই—

যাক—পাকা-কথা পাওয়া গেল এতদিনে। যামিনী মুখ ঢাকে। রূপদাসী কেদারকে ডেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, বেহাইকে বল—ছেলে অনেক মাছ মেরে এনেছে, দুপুরে দুটো খেয়ে যেতে হবে।

দ্বারিক ফিরল। বেলা হয়ে গেছে, এমন অবস্থায় 'না' বললে ভাল দেখায় না। আর বিয়ের কথাবার্তাও খানিকটা এগিয়ে রাখা যাবে। সত্যি, যত দিন যাচ্ছে, ভারি বেয়াড়া হচ্ছে কার্তিক। বিয়ে না দিলে ঠাণ্ডা হচ্ছে না হতভাগা।

যামিনীকে একবার আড়ালে পেয়ে কার্তিক বলে, চড়টা একটু বে-আন্দাজি হয়ে গেছে রে!

অনুতপ্ত হয়ে প্রকারান্তরে সে মাপ চাইছে আর কি! বলে, মুখ ভার করে থাকিস নে। নৌকোর হেনস্তা দেখলে আমার কেমন মাথা খারাপ হয়ে যায়। তা শোন—একদিন তোকে নৌকো চড়িয়ে অনেক দূর ঘুরিয়ে আনব।

যামিনী মুখ ঘুরিয়ে বলে, বয়ে গেছে নৌকোয় উঠতে।

অনেক—অনেক দূর। বাঁধাঘাটে গিয়েছিস কখনো?

বাঁধাঘাটের নামে যামিনীর চোখের তারা জ্বল-জ্বল করে উঠে। জায়গাটার নাম শুনেছে। বলে, নিয়ে যাবে? সেখানে নাকি মস্ত পদ্মবন—অনেক পদ্ম ফুটে থাকে?

কার্তিক ঘাড় নেড়ে বলে, আর বেতবাগান, বাঁশঝাড়, ভাঙা ইটের পাঁজা। কত শূয়োর মেরেছি। তোকে নিয়ে গিয়ে পদ্মের চাক তুলে দেব এই এমন এক বোঝা।

যে কটা কথা বলল যামিনীকে, তার চেয়ে অনেক বেশি মনে মনে ভাবছে। সমস্ত মুখ ফুটে বলা যায় না। নিঃশব্দ রাত্রে যামিনীকে নিয়ে সে বেরুবে। পাখির মতো তার নীলমণি—কেউ টের পাবে না, রাতের মধ্যেই নূতন বউকে নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু তার আগেও তো একবার যেতে হচ্ছে বাঁধাঘাটে পদ্ম তুলতে। পদ্ম ফুলে সাজাবে নীলমণির এ-মাথা থেকে ও-মাথা। বাজনা বাজবে ঢোল, কাঁসি, সানাই—ধানবন আলোড়িত হবে। ফুলের সাজে সাজানো নীলমণি ধানবন ফুঁড়ে মাদারডাঙা থেকে সগর্বে আসবে এই গড়ডাঙায় তার বউ নিয়ে যেতে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

কৃষক-নগর।

খুব লম্বা এক দেবদারুগাছ কেটে চাঁচাছোলা হয়েছে। তার মাথায় বাঁশের ফ্রেমে তুলোর অক্ষরে লেখা নামটা অনেক দূর থেকে—বউডুবির হাটখোলা থেকেও দিব্যি পড়া যাচ্ছে।

কৃষক-সভা—কৃষকদের ব্যাপার। কিন্তু মাতব্বররা বিশেষ ধরা-ছোঁওয়া দিচ্ছে না। তবু আয়োজন চলছে। সুপ্রিয়া একাই এক-শ'। আর আছে কায়েত-পাড়ার জন কয়েক কলেজি ছেলে। কলেজ বন্ধ—এ অবস্থায় গ্রামে এসে নিষ্কর্মা হয়ে ছিল; কাজ পেয়ে তারা মেতে উঠেছে। আর কার্তিক আছে, প্রাণ দিয়ে সে খাটাখাটনি করছে। যা বলা যাচ্ছে, তাতেই সে উঠে পড়ে লেগে যায়।

চাঁদা তোলা হচ্ছে। নগদ টাকা-পয়সা বিশেষ ওঠে না, তবে ধান-চাল আদায় হচ্ছে কিছু কিছু। পুরুষমানুষদের যে সময়টা বাড়ি থাকার কথা নয়, বিশেষ করে সেই সময়টা ছেলেরা বেরোয়। মেয়েদের গিয়ে বলে, সভা হবে, মোটরগাড়ি পুরে শহর থেকে বড় বড় নেতারা আসবেন; যুদ্ধ দেখানো হবে একদিন—ভিক্ষে দাও মায়েরা। মেয়েরা এদিক-ওদিক তাকিয়ে ধান এনে ঢেলে দেয় তাদের ধামায়। আট-দশ বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে ধামা ভরতি। বউডুবির হাটে সেই ধান তারা বিক্রি করে হাটখোলার মাঝখানে বসে।

হরিহর মনে মনে বিরক্ত। বড় মুশকিল মেয়েকে নিয়ে। চুপচাপ থাকা

তার কোষ্ঠিতে নেই। বিপাকে পড়ে গ্রামে এসেছেন—দেশের কাজ এ ক'টা দিন স্থগিত থাকুক না, ভারতবর্ষ তাতে রসাতলে যাবে না। লড়াই মিটে যাক —ভালয় ভালয় কলকাতায় ফিরে সভাসমিতি যত খুশি করিস সেখানে।

মনে মনে অহরহ তিনি এই সব তোলাপাড়া করছেন, কিন্তু সুপ্রিয়ার কাছে প্রতিবাদ করতে সাহস হয় না। মা-হারা মেয়ে, বড্ড অভিমানী। হরিহর ভয়ে ভয়ে থাকেন, আর সেইজন্য সে এত আস্কারা পেয়েছে। বিয়ে-থাওয়া হয়ে দুটো-একটা ছেলেপেলের মা যতদিন না হচ্ছে, এ ছটফটানি রোগ নিরাময় হবে না। এখানে এসে হরিহর অনুপমকে তিন-চারখানা চিঠি দিয়েছেন—চলে এস, যত কাজ থাকুক একবার এসে দেখে যাও আমাদের ; দেখে যাও, কি হুজুগ লাগিয়েছে আবার খুকি···

সদর রাস্তা ও নদী—মাঝখানে বড় এক উলুখেত। প্যাণ্ডেল বাঁধা শুরু হয়ে গেছে সেখানে। ইতিমধ্যে সদর থেকে কনফারেন্স করবার অনুমতি এসে গেল। কাজে আরও জোর বাধল। হাটে নূতন তোলা বসল, যারা তরিতরকারি ও মাছ বেচতে আসবে, কনফারেন্সের দরুন সবাইকে দিতে হবে এক পয়সা হিসাবে।

কথা উঠল, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হচ্ছে কে ?

ছেলেদের মুখে মুখে সুপ্রিয়া-দির নাম। কিন্তু সুপ্রিয়া বলে, এ অঞ্চলের প্রবীণ কোন চাষীর হওয়া উচিত, তাদেরই অনুষ্ঠান যখন। কেদার মোড়ল হলে কেমন হয় ?

কেদারের সেই রাত্রির আতিথ্য বড় মনে পড়ে। গ্রামের সরল সংস্কৃতির মূর্তিমান একটি রূপ যেন কেদার। ঐ রকম আর দু-চারজনের সঙ্গেও পরিচয় ঘটেছে মাঝে মাঝে। অনেক শতাব্দী আগেকার বাংলাদেশের এক এক অবিকৃত টুকরো যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে তাদের হাবে-ভাবে, আলাপ-আচরণে।

ছেলেরা মুখ বাঁকায় কেদারের নামে। কেশো রুগী—'ক' লিখতে কলম

ভাঙে। বড় বড় নেতারা আসবেন, তাঁদের সামনে হাঁটকেল করবে যে বুড়ো! গ্রামের বদনাম।

একজন বলে, চাষীর ভেতর থেকে যদি নিতে হয়, দ্বারিক সর্দারকে দিয়ে হতে পারে বরং। তেজ আছে লোকটার। সব চেয়ে দামী ঘর; বয়সেও সে সকলের বড়।

ভূষণ দাসের নামেও প্রস্তাব ওঠে। হাটের ইজারাদার—হাটখোলায় দোকান করে লাল হয়ে যাচ্ছে। খবরের কাগজে নাম বেরুবে, এই লোভ দেখিয়ে মোটা রকম কিছু খসানো যাবে তার কাছ থেকে। টাকারও তো দরকার খুব!

এই রকম সব কথাবার্তা চলেছে। কমফারেন্সের দিন দশেক আগে অভাবিত ব্যাপার ঘটল। অনুপম এসে উপস্থিত। শেষ চিঠিতে হরিহর কি লিখেছেন জানা যায় নি,—কিন্তু এসেম্বলির অধিবেশন হচ্ছে, তা সত্ত্বেও সে চলে এল।

পৌঁচেছে দুপুরবেলা, বেলা পড়তেই কৃষক-নগরে বেড়াতে এল। বলে, প্যাণ্ডেল ছাইতে ছাইতে বন্ধ করে দিয়েছ, বৃষ্টি-বাদলার সময়—দকদজ হয়ে যাবে যে! ছ্যা-ছ্যা—এমন কাঁচা কাজ করে?

একটি ছেলে মুখ চুন করে বলে, ইচ্ছে তো ছিল গোলপাতা দিয়ে ঢাকবার। যোগাড় হয়ে উঠল না। শুধু প্যাণ্ডেলের খরচই তা হলে পাঁচ-শর উপর উঠে যাবে। সুপ্রিয়া-দি তাই বললেন, থাকগে—আরও কত রকমের কত দরকারী খরচ রয়েছে—

অনুপম দরাজ হুকুম দিয়ে দিল, টাকার জন্য ভেব না, আমি এসে গেছি যখন। কাজটা কিসে নিখুঁত হয় তাই দেখ। গোলপাতা কেনগে, নাও টাকা—

নোটের গোছা সে বের করল—টাটকা-ছাপা চকচকে নোট।

হরিহরের পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপের দুপাশের দুটো কামরা বছর পনের কুলুপ

দেওয়া আছে। দরজা খুলতে গিয়ে কব্জা গেল ভেঙে। ঝেড়েপুছে সাফ করা হল, দুয়ারে জানলায় নূতন পর্দা খাটানো হল, নেতারা এসে থাকবেন এই জায়গায়।

উৎফুল্ল মুখে সুপ্রিয়া অনুপমকে বলল, আপনি যে এত করবেন আশা করি নি—

অনুপম হো-হো করে হেসে ওঠে।

আমি আর আমার যত ভাই-ব্রাদার করে খাচ্ছি তো এই গণ্ডমূর্খগুলোর ভোটের জোরে। এদের নামে পয়সা খরচ করে একটু ফূর্তি করলামই বা! এ-ও একরকম স্পেক্যুলেশন বলতে পার। লোকে শেয়ার কেনে, মাইকা-মাইন বন্দোবস্ত নেয়—আমরাও আগামী ইলেকশনের টোপ ফেলে বেড়াচ্ছি। লেগে যায় তো কেল্লা ফতে। না লাগে—মনে করব, ঘরের থেকে তো যাচ্ছে না, যা আসে ষোল আনা তার কখনো ঘরে তোলা যায় না। আর তা ছাড়া—

বলে সুপ্রিয়ার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে অনুপম স্তব্ধ হল।

সুপ্রিয়া শেষ কথার সূত্র ধরে প্রশ্ন করে, তা ছাড়া?

তুমি রয়েছ এর মধ্যে। তুমি যখন আছ, উচিত-অনুচিতের প্রশ্নই নেই। তোমার সঙ্গে খাটব, সেই লোভে এসেম্বলি ফেলে জংলি গাঁয়ে ছুটে এসেছি।

আনন্দে কৃতজ্ঞতায় সুপ্রিয়া আর কথা বলতে পারে না।

(২)

কৃষক-নগরের অফিসে বিনোদ দাস এসে হাজির।

দশটা টাকা এই বাবা পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন, আরও কিছু দেবেন হাটবারের দিন।

অফিস-সেক্রেটারি বলল, বুঝে সমঝে দেবেন কিন্তু। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করা হয়েছে অনুপমবাবুকে।

বিনোদ মুখ কালো করে চলে গেল। শোনা গেল, ভূষণ নাকি 'হায়' 'হায়' করছে। জেলার মধ্যে নাম হয়ে যেত, বড় বড় নেতাদের সঙ্গে নামটা কাগজে উঠত। টাকা রোজগার করে ভূষণের এখন নাম-যশে লোভ হয়েছে ভয়ানক।

কার্তিককে পেয়ে বিনোদ একদিন বলল, তোমাদের ঐ পদটা নিলামে তুললে না কেন, ওহে সর্দারের পো? আমরা একটু চেষ্টা করে দেখতাম। দোকান আছে, পৈতৃক গাঁতিও আছে একটা। দেখা যেত, কত টাকা আছে কোথাকার ঐ অনুপম ঘোষের। এক—চাষীদের মধ্য থেকে হত, তোমার বাবা হতেন—সে আলাদা কথা। বাইরের একজনকে সকলের মাথা ডিঙিয়ে আকাশে তুললে, অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছ তোমরা।

প্যাণ্ডেল ছাওয়া হয়ে গেছে। তার সামনে বাঁশ পোঁতা। বাঁশের মাথায় দড়ি বেঁধে সঙ্গে পতাকা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। বিশিষ্ট নেতা শ্রীকণ্ঠ চৌধুরি বক্তৃতা সহযোগে দড়ি ধরে দেবেন টান—নিশান শূন্যে উড়বে।

ভলাণ্টিয়ারের দল তৈরি হচ্ছে অনুপমের নির্দেশে। খালি গায়ে চলবে না, হাফ-সার্ট চাই সকলের। এর খরচও অনুপমের। বউডুবির হাটখোলায় দুটো মাত্র দরজি, তারা কামিজের জোগান দিয়ে পারছে না। কার্তিক একদিন নীলমণি নিয়ে জলমা থেকে আড়াই ডজন কিনে নিয়ে এল। সমস্ত দিনই প্রায় তালিম দেওয়া হচ্ছে ভলাণ্টিয়ারদের। জি. ও. সি. কার্তিকের অধীনে নূতন কামিজ গায়ে লাঠি হাতে চাষার ছেলেরা এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে কুচকাওয়াজ করে বেড়াচ্ছে। চেঁচাচ্ছে—

জাপানকে—রুখতে হবে
রুখতে হলে—রাইফেল চাই
দাও আমাদের—রাইফেল দাও

দলের এক অল্পবয়সি ছেলে কার্তিককে জিজ্ঞাসা করে, রাইফেল কি?

কার্তিক তৈরি ছিল না এরকম প্রশ্নের জন্য। অথচ পদমর্যাদার খাতিরে জবাব একটা দিতেই হয়। বলল, কিরিচ—

পুনরায় প্রশ্ন, কিরিচ কাকে বলে ?

বিপন্ন কার্তিক জবাব দেয়, বুঝতে পারনি যে ? উড়োজাহাজ থেকে ছুঁড়ে মারে আর কি !

কথাটা কি রকম ভাবে কানে গিয়েছিল অনুপমের। হাসাহাসি চলছিল নিজেদের মধ্যে।

সুপ্রিয়া বলে, ঠাট্টা নয়—ভেবে দেখুন অবস্থা। নূতন নূতন অস্ত্র বের করে দেশের পর দেশ ওরা নিশ্চিহ্ন করে ফেলছে, আর এখানে কার্তিকের মতো সাহসী জোয়ান মানুষ রাইফেল কি জিনিস, জানে না।

অনুপম বলে, না-ই বা জানল। রাইফেল ছুঁড়ে সভ্যতা এগুচ্ছে না। কংগ্রেসি না হলেও মনে মনে মানি, গান্ধীজির পিছনে পিছনে চলেছি আমরা ভাবী-কালের নূতন সমাজে—দেশশুদ্ধ সবাই চলেছি। তাঁর নিন্দায় যারা পঞ্চমুখ, তারাও চলেছে। নিখিল জগৎকেও সঙ্গে নিয়ে চলব আমরা—অস্ত্রের হানাহানি সেখানে নেই।

সুপ্রিয়া বলে, পৌঁছে গেলে তারপর অস্ত্র অকেজো হবে বটে, কিন্তু পথের কাঁটা অস্ত্র দিয়েই তো সাফ করতে করতে যেতে হবে। কংগ্রেসও আজ এটুকু মেনে নিয়েছে। দেশের জন্য অস্ত্রের লড়াই করতেই ব্যাকুল আমরা। শুধু কায়ে নয়, কায়মনে। আজকের বিরোধ এই নিয়েই প্রভুদের সঙ্গে।

ভাবতে গিয়ে অধীর হয়ে ওঠে সুপ্রিয়া। পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দেশ তৈরি হচ্ছে সমগ্র সম্পদ একীভূত করে। আর আমাদের ঘাড়ের উপর শত্রু—কিছু করবার নেই এই চরম সময়ে ! শুধু ঘুমানো ? চাষবাস করা ? পাশাখেলা ? নেতৃত্ব, নাম-বাজানো আর বেপরোয়া মুনাফার লোভে নানারকম প্যাঁচ কষে বেড়ানো ?

ভলান্টিয়ারের দল মার্চ করে যাচ্ছে মাঠের ওদিক দিয়ে। শুনতে পেল চিৎকার করছে তারা—

জাপানকে—রুখতে হবে

সুপ্রিয়ার চোখ জলে উঠল। আগুন জ্বালাতে হবে শহরে গ্রামে সর্বত্র মানুষের মধ্যে। সাম্রাজ্যলোভীদের রুখব এক হাতে; আর এক হাতে ঘাড় ধরে বিদায় দেব সাম্রাজ্যভোগীদের।

ভূষণ দাসের দূরসম্পর্কীয় ভাগনে বিজয় মজুমদার। ত্রিসংসারে আপন কেউ নেই বলে ছেলেবেলা সে এখানে কাটিয়েছে, এখানকার পাঠশালায় তালপাতা লিখে আড়াই ক্রোশ দূরবর্তী ভোমরার মাইনর ইস্কুলেও পড়াশুনা করেছে কিছুদিন। তারপর ভূষণের দোকানে খাতা লিখত—মাইনে নয়, পেট-ভাতে। সাড়ে সাত টাকা তহ্‌বিল তছরূপের দরুন ভূষণ একবার বেদম মার মারে। দোকান ছেড়ে সেই থেকে বিজয় চাকরির উমেদারিতে আছে। দশ-বিশ দিন কাজের চেষ্টায় নিরুদ্দেশ—ফিরে এসে যথারীতি আবার ভূষণের অন্ন ও গালিগালাজ খেয়ে শিস দিয়ে এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে বেড়ায়।

বিনোদ রেগে আছে। কনফারেন্সের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না তারা, উঁকি মেরেও তাকিয়ে দেখবে না। বিজয় বলে তাই কি পেরে উঠবে বড়-দা? মামার ইষ্টদেব হরিহর রায়—তাঁরা রয়েছেন এর মধ্যে।

বিনোদ বলে, রায় মশায় নন, তাঁর মেয়ে। রায় মশাই কি খুশী মেয়ের 'পরে? চাষার চোখ ফুটলে তালুক নিলামে উঠে যাবে, এ তিনি বোঝেন।

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

আর থাকেনও যদি! বুঝতে পারছ না, ইংরেজ টাকা দিয়ে এ সমস্ত করাচ্ছে লড়াইয়ে লোক জোটাবার জন্যে। এর মধ্যে আমরা থাকতে পারি নে কখনো।

বিনোদ দাস অকস্মাৎ বিষম ইংরেজ-বিরোধী হয়ে পড়েছে দেখা যাচ্ছে।

ভলান্টিয়াররা যাচ্ছিল বাড়ির সামনে দিয়ে—

জাপানকে—রুখতে হবে

রুখতে হলে—রাইফেল চাই

বিজয় বেরিয়ে এসে জিওলের বেড়া ঘেঁসে দাঁড়িয়ে টিপ্পনী কাটছে, কুথতে হলে বঁটি চাই—

বাইরের আটচালা থেকে ভূষণ বলে ওঠে, শুধু বঁটি নয় রে বাবা, মাছ-কোটা আঁশ-বঁটি। মুরোদ কত!

কার্তিক আগে আগে যাচ্ছে। কোমরে বেল্ট-আঁটা, গায়ে কামিজ। কামিজের উপর দিয়ে পৈতের মতো ঝোলানো কনফারেন্সের ব্যাজ। রোদে মুখ রাঙা, রক্ত বেরুবে এই রকম অবস্থা। বেড়া দেখে কার্তিক মানল না—এক বাঁকা সজনেগাছ ছিল, তার গুড়িতে চড়ে বেড়া লাফিয়ে হাত ধরল বিজয়ের। বলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মস্করা করলে চলবে না ভাই। এস—বিস্তর কাজ আছে, চলে এস।

বিজয় এঁকে বেঁকে হাত ছাড়বার চেষ্টা করে, পেরে ওঠে না। কার্তিকের বজ্রমুষ্টির নিচে তার কব্জি গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাবার দাখিল। হিড়হিড় করে বিজয়কে সে টেনে নিয়ে চলল।

রাগের বশে ভূষণ খড়মসুদ্ধ দাওয়া থেকে লাফিয়ে পড়ে। বেরোও—বেরোও বলছি আমার বাড়ির সীমানা থেকে।

কার্তিক হেসে বলে, বেরিয়েই যাচ্ছি তো। বিজয়কে নিয়ে যাচ্ছি। এক পাঠশালে পড়েছি, আমার এয়ার-বন্ধু লোক। আপনি এর মধ্যে কথা বলতে আসেন কেন দাস মশায়?

ভলান্টিয়ারের কর্তা হয়ে এ ধরনের আলাপ ইতিমধ্যেই চমৎকার সে রপ্ত করে নিয়েছে।

গোলমাল শুনে বিনোদও বাড়ির ভিতর থেকে দৌড়ে আসে।

বেরোও—বেরোও—

(৬)

কনফারেন্স শুরু হল। এ অঞ্চলে কাঁচা রাস্তা, মোটর আসতে অসুবিধা হয়—নৌকাপথই সুবিধা। কিন্তু জগদীশ আচার্য ও ঐ ধরনের কয়েক জন ছাড়া আর কেউ মোটর ভিন্ন আসতে চান না। দেশ-উদ্ধারের মহৎ কাজ কাঁধে নিয়েছেন, সময়ের এক তিল অপচয় করবার উপায় নেই। অগত্যা মোটরের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। ধুলোয় ধুলোয় মানুষের রাস্তা চলা দায়।

শ্রীকণ্ঠ চৌধুরি পৌঁছে গেছেন। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, প্রশস্ত কপাল, ইয়া দশাসই চেহারা। পতাকা-উত্তোলন উপলক্ষে বক্তৃতা করলেন। যেমন ঈশ্বর-দত্ত গলাখানি তেমনি ভাষার ঝঙ্কার—

এই দেশ আমাদের, আজকের চরম দুঃসময়ে একথা মনে প্রাণে উপলব্ধি করতে পারছি কি আমরা? দেশে দেশে জনগণ সর্বস্ব পণ করছে নিজের ভূমি ও জাতি রক্ষার জন্য। আমাদের তার জন্য প্রস্তুতি কই? দেশরক্ষার কি ব্যবস্থা করছি আমরা?

জনতার মধ্য থেকে কে-একজন বলল (বিনোদেরা যা সব বলাবলি করে তারই পুনরুক্তি আর কি!), গরজ যাদের তারাই করুক গে—

অগ্নিস্রাবী কণ্ঠে শ্রীকণ্ঠ বলতে লাগলেন, আমাদের চেয়ে গরজ কার বেশি? ভারতবর্ষ জাপানের কবলে পড়লে পালিয়ে ওরা নিরাপদ দ্বীপে চলে যাবে; মরতে মরব আমরাই। দীর্ঘকাল পরাধীন থেকে এদেশ যে আমাদেরই অস্থিমজ্জায় গড়া, ওরা বিদেশি মাত্র—এই সত্য আমরা ভুলে যাই। দেশের নরনারী এত নির্যাতন সয়ে আসছে স্বাধীনতার জন্য। স্বাধীন আমরা হবই। আসুন ভাই সব, এই পতাকা-তলে মিলিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করি দেশরক্ষায় প্রাণ দেব আমরা…

সন্ধ্যার পর নেতারা ক্লান্ত হয়ে বসেছেন হরিহরের চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে। সারাদিন বড্ড ধকল গেছে। মিছরির শরবত দেওয়া হয়েছে। তারপর বেতের টেবিল-চেয়ার সাজানো হল, টেবিলের উপর রকমারি জলযোগের ব্যবস্থা।

জগদীশ বলরে, এ কি মশায়—কলকাতা থেকে এদ্দুর এলাম, কলকাতাও যে পিছু নিয়েছে দেখছি। কেক-পুডিং মায় ভীমনাগের সন্দেশ অবধি। এখানকার জিনিস নিয়ে আসুন না। চিঁড়ে-দোভাজা, খেজুরগুড়—মুখ বদলে যান এঁরা সবাই।

অনুপম হেসে বলে, তা-ও হবে বই কি! তিন দিন তো থাকতে হবে কষ্ট করে। কলকাতার জিনিস থাকবে বড় জোর কাল দুপুর অবধি। তারপর ঐ ভরসা।

শ্রীকণ্ঠকে তারিফ করছে অনুপম—

যা আজকে বক্তৃতা করলেন মিস্টার চৌধুরি, শুনে রোমাঞ্চ হচ্ছিল। এসেম্বলিতে হরদম তো বক্তৃতা শুনি—তার মধ্যে প্রাণ নেই।

বিরক্তমুখে কুঞ্চিত দৃষ্টিতে অন্য দিকে চেয়ে ছিলেন শ্রীকণ্ঠ। মুখ ফিরিয়ে বললেন, এঃ মশায়, ঐ কি বক্তৃতা? কলকাঠি বেহাত হয়ে গেছে। মিছরির পানায় কি আওয়াজ বেরোয়?

বুঝতে না পেরে অনুপম বোকার মতো চেয়ে থাকে।

শ্রীকণ্ঠ বলেন, স্টেশনে ওয়েটিং-রুমে আলো ছিলো না, আর মশাও তেমনি। সমস্ত রাত জেগে বসে থাকতে হল। অন্ধকারে আন্দাজ পাই নি, ঢালতে ঢালতে গলার মধ্যে পুরো বোতলই ঢেলে ফেললাম। তা মশায়, কাল যদি আবার সভা চালাতে হয়—ইঞ্জিনে স্টীমের বন্দোবস্ত করুন। নাভিশ্বাসের অবস্থা—রাত কাটবে কি করে তাই ভাবছি।

অনুপম হেসে বলে, আচ্ছা—সব বন্দোবস্ত হবে। কাজে নেমেছি, দরকার হলে বাঘের দুধ পর্যন্ত যোগাড় করব।

জগদীশ আচার্য বুড়ো মানুষ—হাঁক-ডাক নেই, জনপ্রিয়তা শ্রীকণ্ঠের সিকির সিকিও নয়। হুগলি জেলার দুর্গম একটা গ্রামে আশ্রমের মতো করেছেন, সেখানে কাজকর্ম নিয়ে থাকেন। জেলে যান, আবার নিঃশব্দে বেরিয়ে আসেন। সভাসমিতিতে বড় একটা যান না, ডাকও আসে না। এবার এসেছেন—এই অঞ্চলে তাঁর শৈতৃক বাড়ি, তাই একটা অন্তরের টান রয়েছে বলে। আন্তরিক দুঃখিত হয়ে তিনি বললেন, ছি-ছি শ্রীকণ্ঠ, কি মনে করছেন বল তো এঁরা! কেন যে তোমরা গেলো এই সমস্ত ছাইপাঁশ—

শ্রীকণ্ঠ বলেন, নিজের পয়সায় বিষ কিনে খাব—কার তোয়াক্কা রাখি আচার্য মশায়? বলে রাখছি অনুপমবাবু, এর জন্য কেউ আপনারা সিকি পয়সা খরচ করেছেন তো এখুনি এই রাতের মধ্যে বিদায় হয়ে যাব।…গন্ধ আছে, কোথাও কাছে পিঠে?

কার্তিক বলে, বউডুবির হাটখোলা—

ও সব গেঁয়ো হাটবাজারে হবে না। হেসে উঠলেন শ্রীকণ্ঠ। চিতানো বাঁ-হাতের খানিকটা উঁচুতে ডান-হাত উপুর করে ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলেন, মিলবে?

মামা ও মামাতো ভাইয়ের আপত্তি না মেনে বিজয় সেই থেকেই আছে এদের সঙ্গে। দিনরাত পড়ে আছে, যাবে কোথায়? ভূষণেরা নাকি শাসিয়ে বেড়াচ্ছে, বাগে পেলে অপমানের শোধটা তুলবে তারই উপর। তা সে গ্রাহ্য করে না দেশের কাজের খাতিরে। তুখড় ছোকরা, পাড়াগাঁয়ে এমন দেখা যায় না। কথা না পড়তে বুঝে নেয়। বলল, জনমায় পাওয়া যাবে স্যর, যে রকমের যত মাল দরকার। বাইক পেলে আমিই চলে যেতে পারি।

সাইকেলে উঠতে যাচ্ছে বিজয়। ও-কামরা থেকে আর একজন হাত উঁচু করেন। কাছে এসে তার মুঠোয় দশ টাকার একখানা নোট গুঁজে দিয়ে বলেন, যাচ্ছেন যখন—গলাটা কাল থেকে খুস-খুস করছে, ঠাণ্ডা লেগেছে কিনা? আমার জন্যেও না হয়—

উঠানে হোগলার চালা থেকেও দু-তিনটে মাথা বেরিয়ে এল। ডেলিগেট ওঁরা, এই জেলারই নানা স্থান থেকে এসেছেন। সবাই থামতে বলছেন বিজয়কে।

বাইক রেখে বিজয় করুণ কণ্ঠে অনুপমকে গিয়ে বলে, সাইকেলে অত আসবে কি করে বলুন? কার্তিককে পাঠান, নীলমণি নিয়ে চলে যাক। পুরো এক ভরা লাগবে মনে হচ্ছে। কনফারেন্স দারুণ জমবে।

দাঁতে দাঁতে পিষে অনুপম বলে, শিক্ষা হচ্ছে বটে! এর পর যদি কিছু করতে হয় এই এদের সঙ্গে, লাইসেন্স নিয়ে আগেভাগে ভাঁটিখানা বসিয়ে তবে কাজে নামব।

জগদীশ আচার্যকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করে, আমার তো চেনা-জানা নেই তেমন। কোন্ পার্টি এঁদের বলুন তো—

পার্টি বলতে গেলে তো আপনাদেরই। উচিত-বক্তা জগদীশ কাউকে খাতির করেন না। বলতে লাগলেন, পরাধীনতা মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। স্বদেশিয়ানা করে আপনারা টাকা রোজগার করছেন, এরা রোজগার করছে নাম-যশ। একই ব্যবসার রকমফের আর কি।

একটু পরে দেখা গেল, ক্যাম্প ছেড়ে জগদীশ পায়চারি করতে করতে নির্জন প্যাণ্ডেলে যেখানে নারিকেল-পাতা বিছিয়ে চাষারা এসে বসেছিল, সেখানটায় একাকী গিয়ে বসে রইলেন।

সুপ্রিয়ার কানে এসব খবর কোনক্রমে না ওঠে, এই আশঙ্কা অনুপমের। ওদের নির্মল মন দেশ-সেবার নামে মেতে ওঠে। বাংলাদেশে শিক্ষিত ছেলে-মেয়ের শতকরা নিরানব্বইটি এই রকম। দেশের কাজে যে-কেউ জেলে গেছে, সে-ই দেবতা। জেল থেকে বেরিয়ে যে এই রকম এদের চেহারা খুলেছে, দেখতে পেলে মরমে মরে যাবে তারা। রক্ষা এই, কোটি কোটির মধ্যে নিতান্তই দশ-বিশ গণ্ডা এরা; গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে চরম অগ্নি-পরীক্ষার দিন।

শেষ দিন। রাত্রে গেরিলা-যুদ্ধের মহড়া। এক ছোকরা পাঞ্জাব না কোথা থেকে ওস্তাদ হয়ে এসেছে। রাতের অন্ধকারে যুদ্ধের অভিনয়। মনে হচ্ছে, সত্যিই বুঝি এসে পড়েছে কোন নির্মম নিদারুণ শত্রু। তাদের উৎখাত করতে হবে দেশ থেকে, বাঁচাতে হবে জাতির ইজ্জত। মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো ট্যাঙ্ক-এরোপ্লেন নেই, দেশপ্রেম আর প্রাণের প্রতি নিস্পৃহতা—এই হল আসল অস্ত্র গেরিলা-যুদ্ধের।

রায়দেরই সেকেলে বাগিচা। আম-কাঁঠাল গাছ, বাঁশঝাড়, বড় গাছের তলায় কালকাসুন্দে ভাঁট আর বিড়াল-আঁচড়ার জঙ্গল। সাদা কাপড়ে একজন দ্রুত চলেছে জঙ্গল ভেঙে। ভ্রূক্ষেপ নেই—কোথায় কাঁটা, কোথায় খানাখন্দ! কি দেখল সে—এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখল, তারপর সাঁ করে ফিরে এসে খবর দিল দলের মধ্যে। সকলে মিলে এবার চলল দুর্গম পথে। অতি-মৃদু এক সঙ্কেত—শুয়ে পড়ল সবাই। সাপের মতো সবাই বুকে হেঁটে নিঃশব্দে চলেছে। সবে রাস্তার উপর এসেছে—আবার সঙ্কেত। চুপচাপ—যে যে অবস্থায় আছে, পড়ে রইল মিনিট কতক। নিশ্বাসও বুঝি পড়ছে না।

বউডুবির হাটবার সেদিন, একদল হাট করে ফিরে যাচ্ছে। তাদের দেখেই নিঃসাড় হবার আদেশ হয়েছে বাহিনীর উপর। হাটুরে লোকেরা এই মহড়ার খবর রাখে না। অন্ধকারে দেখাও যাচ্ছে না, রাস্তার পাশে নির্জীবের মতো এরা পড়ে আছে। সামনে হাত মেলে এগোচ্ছিল, সঙ্কেত শুনে সেই হাত মেলানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। একজন জুতো মচমচ করে চলে গেল কার্তিকের আঙুলের উপর দিয়ে। আঙুল ফেটে রক্ত বেরিয়ে গেল, তবু এতটুকু শব্দ নেই। বুকে বুলেট বিঁধলেও কণ্ঠে আওয়াজ বেরুবে না, এই নিয়ম।

পরে হেরিকেনের আলোয় আঙুলের অবস্থা দেখে ওস্তাদ পিঠ ঠুকে বাহবা দিল কার্তিককে। এই রকম তো চাই। ধর, ঐ হাটুরে লোকগুলোই শত্রু। শব্দ করলে কি হত? শত্রু জানতে পারত, তখন বেয়নেট চার্জ করে নির্মূল করে ফেলত সমগ্র বাহিনী।

বাগিচার উত্তরধারে ভাঙা পাঁচিল, তার উপর দাঁড়িয়ে দেখছিল সুপ্রিয়া ও আর দু-তিনটি মেয়ে। মহড়া দেখবার আগে অত্যন্ত ভাসা-ভাসা এক রকম আন্দাজ ছিল সুপ্রিয়ার। এ-ও আসল রণবৈচিত্র্যের কাছাকাছি যায় না। তবু তার মনে এক নূতন উপলব্ধি জাগছে। শহুরে মানুষ—বড় লোকের মেয়ে। কিন্তু ভাল মেয়ে, হৃদয়বতী। মানুষের দুঃখে সে দুঃখ পায়, দশজনের কাজ করতে চায় প্রাণপাত করে। কিন্তু এ তো গরিবের মুখে ভাত তুলে দেওয়া নয়, মহামারীতে ওষুধের বাক্স নিয়ে ঘোরা নয়—নিজের প্রাণ ও সেই সঙ্গে ভাই-বন্ধু স্বদেশবাসী অপর দশজনের প্রাণ মৃত্যুর মুখে তুলে ধরা! এর মূলে সর্বমানুষে প্রীতি নয়—নিজের জাত ও নিজভূমির প্রতি দুর্বার ভালবাসা। মানুষকে ছাপিয়ে বড় এখানে মানুষের সম্মান-চেতনা অনেক শতাব্দী এমন সমস্যা আসে নি আমাদের সামনে। আর দশটা জাতির সম্বন্ধে খবরের কাগজ আর বইয়ে যা পড়ে এসেছি, এবার আমাদেরই ঠিক ঠিক তেমনি পথে চলতে হবে।

কার্তিক ঠাট্টা করেছিল, যাত্রার মতো সেজেগুজে লড়াই আবার দেখানো যায় না কি? কিন্তু চমৎকার লাগে তারও। শুধু ঘর-বাড়ি, আপনার জন, এই গ্রাম কখানা ছিল এদের দৃষ্টিসীমা ও জ্ঞানের পরিধি। খাওয়া-পরা এবং চাষবাসের বাইরে যে সব ব্যাপার তাতে কিছু করবার নেই, এই ছিল ধারণা, যুদ্ধের গল্প এই সেদিন মাত্র কার্তিকেরা শুনল হরিহর আর সুপ্রিয়ার কাছে তার পরে অবশ্য আরও অনেকের মুখে শুনেছে। বিদেশি আক্রমণ—যেন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। জাহাজি ব্যাপারে আদার ব্যাপারির মতন এদের শুধু চুপচাপ থাকবার কথা। কিন্তু আজকে নূতন উপলব্ধি হল। যুদ্ধের

এই অভিনয়ের মধ্যেই তার বীর-হৃদয় নেচে ওঠে। শত্রুকে নাস্তানাবুদ করব, এই দেশের মাটিতে পা রেখে স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলতে দেব না, তাদের। ন্যায়-অন্যায় মানব না, দয়াধর্ম নেই—আমার দেশকে যারা নিগড়ে বাঁধবে, তারা কোন রকম মানবিকতার প্রত্যাশা করতে পারে না আমাদের কাছ থেকে। এমনি এক ভয়ানক সঙ্কল্প কার্তিক এবং আর সকলের মনে মনে।

সর্বশেষে ওস্তাদ বলল দু-চারটি কথা। সম্বলহীন মহাচীন একক বহু বৎসর কেমনভাবে লড়ছে জাপানের সঙ্গে। যুদ্ধে কেমনভাবে ছারখার হচ্ছে দেশের পর দেশ, তৈমুর আর নাদির শার বর্বরতা নিতান্ত ছেলেখেলা যার তুলনায়। কিন্তু অত্যাচারে বীর-জাতির শিরদাঁড়া ভাঙে না। লড়ছে চীন ও অপর নির্যাতিতেরা ; আর, তারা জিতবেও। বিদ্বেষ মনে মনে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, শোধ তুলবে সময় এলে। হাঁ—আসছে সেই প্রতিহিংসার দিন।

জগদীশ তিন দিনের মধ্যে এই প্রথম একটু মন্তব্য করলেন, শোধ তুলব আমরাও—প্রতিজ্ঞা করে আছি। শত্রু-মানুষকে মেরে শেষ করে নয়, আদিকালের এই বিজীর্ণ হিংস্র মতবাদটাকেই নিঃশেষ করে মেরে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(১)

অনুপম ফিরে যাচ্ছে কলকাতায়। বিজয়কে সঙ্গে নিয়ে যাবে। খুব কাজের ছোকরা—এই কনফারেন্সের ব্যাপারে বোঝা গেছে। তা ছাড়া আত্মীয়-বন্ধু পরিত্যাগ করে তাদের মধ্যে এসে জুটেছে, তার ভবিষ্যতের জন্য একটা-কিছু করে দেওয়া দরকার। মনে মনে অনুপম এজন্য নৈতিক দায়িত্ব অনুভব করছে।

কার্তিককেও সে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু কার্তিক মাথা নাড়ে। ক্ষেত-খামার আর অত বড় সংসার বুড়ো বাপের উপর ফেলে সে যাবে কি করে?

সুপ্রিয়া কলকণ্ঠে বলে, আসল কথা ও নয়। আমি খবর রাখি। তোমার বিয়ে হবে কিনা সেই টুনটুনি পাখির মতো মেয়েটার সঙ্গে! তাই নড়বার জো নেই।

অনুপমকে বলে, অমন ছটফটে মেয়ে মোটে আপনি দেখেন নি। রাত্তিরবেলা তো ছিলাম সে বাড়ি—দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের গল্প শুনছিল। যে-ই তাকাই—ফুড়ুত করে অমনি কোথা উড়ে যায়, পাত্তা মেলে না। টিপি-টিপি আবার হাসে। বড্ড মিষ্টি চেহারা। কতক্ষণ বা দেখেছিলাম—হাসি-মুখখানা চোখের উপর জ্বলজ্বল করছে এখনো।

অনুপম কার্তিকের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি গো—সত্যি?

কার্তিক মুখ নিচু করল।

নেমন্তন্ন কোরো—চেনা-জানা তো হয়ে গেল, চলে আসব।

মৃদু হেসে অপ্রত্যয়ের সুরে কার্তিক বলে, হ্যাঁ—তাই আসবেন কখনো!

আচ্ছা, দেখোই না। হ্যাটকোট পরি আর যা ই করি, বামুনের ছেলে তো বটে! ফলারের নামে জ্ঞান থাকে না।

সুপ্রিয়াকে দেখিয়ে বলে, ওঁর সঙ্গে তো কাজে লাগছ এবার থেকে। ওঁর মারফতে খবর পেয়ে যাব, টের পাবে মজাটা।

বিজয় বলে, সুপ্রিয়া-দিও চলে যাবেন যেন শুনছিলাম।

খড়ের আগুন তা হলে নিভে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। তাই কিছু ছুটি মঞ্জুর করা গেল। গাঁয়ে বসে আগুনে কাঠ যোগাতে লাগুন এই কয়েকটা মাস—

বলে অনুপম কৌতুক-স্নিগ্ধ চোখে সুপ্রিয়ার দিকে চাইল।

হরিহর ও অনুপমের মধ্যে গোপন কথাবার্তা হয়ে তাই-ই সাব্যস্ত হয়েছে—দেখা যাক আরও দু-পাঁচ মাস। চারিদিকে আতঙ্ক, অনুপমেরও বিষম কাজের চাপ—কোথায় থাকে, কি করে, কিছু ঠিকঠাক নেই। আর গণ্ডগোল সত্যিই যদি ঘটে, শত্রু এসে পড়ে—কে কোথায় ছিটকে পড়বে, পাত্তা পাওয়া যাবে না। বিশেষত অনুপমের কিছু মিলিটারি-কণ্ট্রাক্ট আছে—বেনামিতে; বিপজ্জনক এলেকায় হামেশাই তাকে যাতায়াত করতে হয়। এ অবস্থায় শুভকর্ম আপাতত স্থগিত রাখাই স্থির হয়েছে।

কনফারেন্স চুকে যেতে মেয়ের প্রতিও হরিহরের মন নরম হয়েছে। বস্তুত এসব ছেলেখেলারই সামিল, এখন ভাবছেন তিনি। কেন যে এত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, চটেও ছিলেন মনে মনে, এমনকি নিরুপায় হয়ে অনুপমকে জরুরি চিঠি দিয়েছিলেন—ভেবে তিনি অবাক হয়ে যাচ্ছেন। হৈ-হল্লা করে বেড়ায় সুপ্রিয়া—আহা, করুকগে। এ বয়সের রীতিই এই। বিয়ে-থাওয়া হলে ঘর-গৃহস্থালি নিয়ে থাকত। গ্রামের এই সঙ্কীর্ণ পরিধিটুকু মাত্র—পাশের গ্রামেও সে যায় না, মান-ইজ্জতের খাতিরে হরিহর যেতে দেন না, ওদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি—বক্তৃতার তুবড়ি ছড়িয়ে কি-ই বা করতে পারে এইটুকু জায়গায়! চাষার ছেলেপেলে নাচিয়ে একটু আমোদ করছে, কটা মাস পরে ধান-কাটার মরশুম পড়লে কাউকে আর পাওয়া যাবে না। লম্বা লম্বা কাজের ফিরিস্তি বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে তখন, চিহ্ন মিলবে না।

বরঞ্চ হরিহরের মনে মতলব জাগছে, রাজনীতির সংস্পর্শহীন কিছু কিছু

সত্যিকার সংকাজ তিনি করে যাবেন এই অঞ্চলে। সুপ্রিয়ার জয়-জয়কার শুনে আর এই অল্পদিনের মধ্যে এখানে প্রতিপত্তি দেখেই হয়তো বাসনা জেগেছে। স্বর্গীয় মায়ের নামে একটা ইস্কুল ও একটা দাতব্য হাসপাতাল করে দেবেন তিনি, একটা টিউব-ওয়েল বসাবেন, একটা পাকারাস্তা বাঁধিয়ে দেবেন বাঁকাখড়শি থেকে বউডুবির হাট অবধি—বর্ষাকালে গ্রামের লোকের যাতে কাদা ভাঙতে না হয়। সুপ্রিয়ার উপরই ভার চাপিয়ে দেবেন। কাজ পেলে ফূর্তিতে থাকে, রাজনীতি ছেড়ে এই সমস্ত নিয়ে সে মশগুল হয়ে থাকুক। পরাধীনতা-মোচন সমাজ-সেবার মধ্যে সমাধি-প্রাপ্ত হোক।

(২)

গড়ভাঙার কেদার মোড়লের বাড়ি হয়ে কার্তিক মনের আনন্দে ফিরছে। আলগা হাতে বোঠে ধরেছে, নীলমণি দুলে দুলে চলছে। পথে শোনে আজব খবর। রতন সর্দার আ'লে দাঁড়িয়ে চেঁচোঘাস কাটছিল। বলে থানায় গিয়েছিলে নাকি দাদা? না—যাচ্ছ এখন?

কেন—থানায় কেন?

ম্লানমুখে রতন বলে, যেতেই হবে। আজ হোক আর দুদিন পরে হোক।

কার্তিক বলে, চোর না ডাকাত—থানায় যাবার গরজটা কি হল শুনি?

নৌকো-সাইকেল যার যা আছে, থানায় লিখিয়ে দিতে হবে। ঢোল পিটিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বলে গেল। নৌকো নাকি নিয়ে যাবে থানাওয়ালারা।

থানার বড়বাবুর মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছিল বটে! তাই হয়তো সাব্যস্ত হয়ে গেছে। হাটবাজার করতে দু-চারটে লাগতে পারে—কিন্তু সারা অঞ্চলের নৌকো কি করবে তারা? কি হবে অত সাইকেল?

লোকের মুখে মুখে নিত্য গুজব রটে। একগুণ খবর দশগুণ হয়ে ছড়িয়ে যায়। দুজন চাষী এক জায়গায় হলেই ঐ কথা। উপায় কি

আমাদের ? বাঁধের মাটি আনব কিসে ? যখন ধান পাকবে, ক্ষেতে তখনো এক বুক জল—নৌকোয় বসে পাকা শীষ কেটে আনি, এবার ধান কাটার হবে কি ? আর হাটবাজার, লোক-লৌকিতা ?

সত্ত গেরিলা-যুদ্ধের কায়দা শিখে হাত নিশপিশ করছে কার্তিকের। তারা ঠিক করছে, শত্রু এলে এই বউডুবির বিলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারবে। সমস্ত আয়োজন পণ্ড। এরা কিছু করবে—থানাওয়ালারা চায় না তা হলে ?

আরও শোনা যাচ্ছে, কোন অঞ্চলে নাকি উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে গ্রামকে গ্রাম। থালা-ঘটি-বাটি পোঁটলা বেঁধে বাচ্চা ছেলে-মেয়ে কাঁখে তুলে মেয়ে-পুরুষ কাঁদতে কাঁদতে রাস্তায় উঠেছে। কি কাণ্ড—কোন পুরুষে কেউ যা শোনে নি ! আজকে গল্পের মতো শোনাচ্ছে—কালই হয়তো ঢোল পিটিয়ে এদিকে দিয়ে যাবে ঐ হুকুম। দিলেই হল।

আরও কদিন কাটল। সেই স্ফূর্তিবাজ কার্তিক আধখানা হয়ে গেছে। মাছ মারে না, ভুলেও কেদারের বাড়ির দিকে যায় না, ভাল করে কথাই বলে না কারও সঙ্গে। নীলমণি নিয়ে ছপছপ করে খালে বিলে লক্ষ্যহীন ঘুরে বেড়ায়।

বিয়ের কথা নিয়ে রতন রসিকতা করতে গিয়েছিল, কার্তিক আগুন হয়ে ওঠে।

বিয়ে না হাতি ! না-না-না—হেঁটে যাব কি বিয়ে করতে ? সাত বছর বয়সে বোঠে ধরেছি, তারপর কি হেঁটেছি কখনো ? নীলমণি আমার পা। পা দুখানাই কেটে দিয়ে যাচ্ছে, তার বিয়ে !

বিলের উপর খালের পাশে তাদের বাড়ি। জোয়ার বেলা গুড়ের নৌকো, তামাকের নৌকো, পুবদেশি বালাম-চালের নৌকো খালে ঢোকে, হাল বেয়ে বেয়ে যায়—তার মচমচানি, খরস্রোতে নৌকোর চারিপাশে জলের কলহাস্য। ভাঁটার টানে জেলে-ডিঙি বড় গাঙে নেমে যায়, বৈঠার আঘাত লাগে জলে আর ডিঙির গায়ে—সে আওয়াজ আর এক রকম—একেবারে আলাদা।

রাত্রিবেলা ঘরে শুয়ে শুয়ে জানতে পারে কখন জোয়ার এল, কখন ভাঁটা সরছে। নৌকো কথা বলতে পারে; গাঙ আর নৌকোর মধ্যে কথাবার্তা হয়, গাঙ-কিনারে যাদের বাড়ি এ ভাষা বুঝতে পারে তারা।

নদী-খাল এখন নিরাভরণ বিধবার মতো। ঘাটে ঘাটে এত ঠেলাঠেলি, মোটে জায়গা হত না, এখন যেন ভেল্কিতে অদৃশ্য হয়েছে—নৌকো জমা দিয়েছে, কিম্বা সরিয়ে ফেলেছে। দু-একজনের থাকেও যদি, তারা নৌকো বায় না, মনমরা হয়ে ঘরে শুয়ে থাকে। ধরণীর স্নায়ু-শিরার মতো গাঙে-খালে ভরা এই অঞ্চল কদিন শ্মশানভূমি হয়েছে।

একদিন কার্তিক খুব গোপনে রতনকে জিজ্ঞাসা করল, এত যে নৌকো আটকেছে থানাওয়ালারা—নজর রাখে? যত্ন করে?

খুব, খু-উ-ব। দিন ভোর চান করাচ্ছে তোমার মতো। গর্জন তেল মাখিয়ে চাটাই মুড়ে রাখছে।

হো-হো করে রতন হেসে উঠল। হাসি অথবা কান্না।

কার্তিক বলে, জলে রাখছে না ডাঙায়?

ইস্কুলের যে মাঠটা আছে না—দেখগে রয়েছে সেখানে। যেন কুমির মেরে মেরে এনে ফেলছে।

কার্তিকের নীলমণি কিন্তু কুমির নয়—চঞ্চল কোমল একটি নীলপাখি। তাকেও হয়তো নিয়ে ফেলবে ওর মধ্যে। আলগোছে জল ছুঁয়ে উড়ে বেড়ায়, তার নিষ্প্রাণ কাষ্ঠদেহ শুকনো ডাঙায় পড়ে রইবে।

বাঁকাবড়শি থেকে দাসু এল একদিন। কার্তিককে সুপ্রিয়া ডেকে পাঠিয়েছে, বড্ড জরুরি।

কার্তিক গিয়ে দাঁড়াতে সুপ্রিয়া বলে, দেদার বক্তৃতা তো শুনলে কনফারেন্সে। আসল কাজের কতদূর কি হচ্ছে শুনি? তোমাদের গাঁয়ের খবর কি?

কার্তিক হাহাকার করে ওঠে, কিছু করছি নে দিদি। নৌকো বন্ধ করেছে, হাত দুখানাই কেটে নিয়েছে। কাজ আমরা করব কি দিয়ে?

সুপ্রিয়া চমকে উঠে কাতর চোখে তাকাল। বলেছে সত্যি, নৌকো এদের হাত-পা, নৌকো এদের পরিবারেরই একজন যেন। নৌকো হারানো যে কি ব্যাপার নৌকোর উপর যাদের দিন কাটে, তারাই বোঝে—অন্য মানুষের আন্দাজে আসে না। ওদের মর্মদাহী শোকে মামুলি সরকারি কৈফিয়ত শোনাতে লজ্জা বোধ হয় সুপ্রিয়ার। কথা তো মোটের উপর এই, পরাধীন অন্ত্যজ জাতি—আস্থা করা চলে না আমাদের উপর? জাপান এসে নৌকো যদি কেড়ে-কুড়ে নেয়, কিম্বা আমাদেরই কেউ কেউ নৌকো যদি দিয়ে দেয় তাদের? খেটেখুটে এত বাধা-বিপত্তির মধ্যে তারা কনফারেন্স করল, যুদ্ধের তালিম দিয়ে উদ্দীপনা জাগাল গ্রামের নর-নারীর মনে। সুপ্রিয়ার মনে হচ্ছে নেহাতই যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা করেছে লোকজন জড় করে। টাকার লোভে, ভাল খাওয়া ভাল পরা ও ভাল থাকবার লোভে গোলামের মতো নয়, মানুষের মতো মান ইজ্জত নিয়ে শত্রুকে প্রতিরোধ করতে চাই—কংগ্রেসের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বারম্বার। সারা পৃথিবীতে ভারে ভারে অস্ত্র তৈরি হচ্ছে, অস্ত্রের আঘাতে হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে-তোলা সভ্যতা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, অস্ত্র-বোঝাই জাহাজ ডুবতে ডুবতে অতল সমুদ্রে চড়া পড়ে এল, অস্ত্রর ঝঞ্চনা ডুবিয়ে দিল মানবতার বাণী, অস্ত্রের ভাঙা টুকরোয় পৃথিবীর পথ হল কঙ্করময়—আর কোটি কোটি আমরা কাস্তের অধিক অস্ত্র পাব না, নৌকো-সাইকেলও আমাদের হেপাজতে রেখে বিশ্বাস নেই। সকল জাতি মেতে উঠেছে—কেউ নিজের ঘর ঠেকাতে, কেউবা পরের ঘর ভাঙতে। এই বিচিত্র ভাঙাগড়ার মধ্যে এত বড় ভারতবর্ষ নিষ্কর্মা নিরাসক্ত দর্শকের মতো। যুদ্ধের কাজে যোগ দেবার যে আহ্বানপত্র বেরোয়, তাতে থাকে বিনামূল্যে আহার্য, বিনামূল্যে পরিচ্ছদ, পুরাবেতনে ছুটি, ভাল বেতন, বিনামূল্যে বাসস্থান—কতরকম লোভনীয় প্রতিশ্রুতি! দেশের জন্য এগিয়ে

এস, যুদ্ধান্তে স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ হবে—এমন কথা দেখতে পাই না কেন?

সুপ্রিয়া ভাবে, ভুলের পরে ভুলের পাহাড় জমে উঠেছে। ওদের তো স্বদেশ-রক্ষার ব্যাপার নয়, সাম্রাজ্য-রক্ষা। তফাত সেইখানে। জাপানকে চাই নে, চাই নে, চাই নে। মাঞ্চুরিয়া চীন আর আবিসিনিয়ার উপর আক্রমণের সময় তোমরা ছিলে দারুভূত-জগন্নাথের মতো; স্পেনের গৃহযুদ্ধে তামাসা দেখছিলে দর্শক হয়ে, আর মুসোলিনি-হিটলারের তোয়াজ করছিলে; —সমদুঃখী পরাধীন ভারত সর্বশক্তিতে সেদিন প্রতিবাদ করেছে, আলিঙ্গন করে এসেছে স্বাধীনতায় সর্বসমর্পিত মহাচীনকে, দেশবাসীর মুখের অন্ন জাহাজ বোঝাই করে পাঠিয়েছে বিপন্ন স্পেনের গণতন্ত্রীদের বাঁচাবার জন্য। শিকলের কালো দাগ দু-শ বছরে আমাদের হাড়-মাংস কেটে মর্মে গিয়ে পৌঁচেছে। হাজারে হাজারে আমরা আত্মদান করে আসছি, পুরাতনের বদলে আনকোরা এক নূতন বেড়ি পরবার জন্য নয়। জাপান মুক্তি দিতে আসবে না, আমরা জানি। তোমাদের ওয়াটস-ক্লাইবও তো একদিন মুক্তি দিচ্ছিল তরুণ নবাবের শাসন-বন্ধন থেকে। সে মুক্তির কি চেহারা ফুটেছে শেষ অবধি? কিন্তু মুক্তি নিয়ে এই ছলা-কলা তোমাদেরও আর চলবে না বেশিদিন।

দাসু খবরের কাগজ দিয়ে গেল। আজকের ডাকে এসেছে। সর্বনাশ, সর্বনাশ! আগুন ধরে গেছে নিখিল ভারতবর্ষে। কংগ্রেস বে আইনি। গান্ধী-আজাদ-নেহরু—সকলে বন্দী। দেশের স্বাধীনতাকামী হাজার হাজার নরনারীকে যেন ছেঁকে নিয়ে জেলে পুরেছে। কি সর্বনাশ! জার্মান আর জাপানির সারা পৃথিবীতে যাঁর চেয়ে বড় শত্রু নেই, সেই নেহরুকে আটকে রাখার চেয়ে বড় কাজ এই সঙ্কট সময়ে এরা পেল না। যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মুখে লম্বা লম্বা বাণী আওড়াচ্ছে, কিন্তু নিষ্ঠুর আর বিসদৃশ এই সব কাজকর্মের খবর যেদিন জগতের কানে পৌছবে, সেদিন মুখ দেখাবে ওরা কেমন করে?

পড়ছে, তবু নিজের দুচোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না সুপ্রিয়া। আর বীরপুরুষ কার্তিক তখন ছেলেমানুষের মতো দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে।

সন্ধ্যাবেলা মন্থর পায়ে কার্তিক মাদারডাঙায় ফিরল।

হেঁটে এলি যে? নৌকো জমা দিয়েছিস?

উঁহু—ডুবে গেছে।

কেউ বিশ্বাস করে না। সাত বছর বয়স থেকে নৌকো বাই। ঝড় নেই, বাতাস নেই, ডুবলেই হল! ডুবিয়ে দিয়েছে হয়তো। তার নীলমণি জলতৃষ্ণায় আকাশের দিকে হাঁ করে থাকবে—তার চেয়ে জলশয্যায় তাকে শুইয়ে রেখে এল। কাদা লাগবে এই ভয়ে কত সতর্কতা—সবাই ছি-ছি করেছে, বাপ ধরে মেরেছে পর্যন্ত—এখন কোন্‌খানে পাতালতলে নীলমণির নীল রং চটে যাচ্ছে, শুঁদি-কচ্ছপেরা বাসা করছে, শেওলা আর বালি জমছে খোলের মধ্যে···

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(১)

ঝড়ের লক্ষণ ভারতের আবহাওয়ায়, জেলে থাকতেই খবরের কাগজ আর নূতন নূতন বন্দীদের মুখে পান্নালাল আঁচ পেয়েছিল। বাইরে এসেও দেখল তাই—আসমুদ্র-হিমাচল স্তম্ভিত প্রতীক্ষায় আছে।

করব অথবা মরব

শহরে গ্রামে সর্বত্র যেন তারে তারে খবর হয়ে গেল। মানুষের মুখে মুখে, বাড়ির দেয়ালে, রেলগাড়ির কামরায়, রাস্তার বটগাছে, ইস্কুলের ছেলের পাঠ্য বইয়ের মলাটের উপর তিনটি কথা—অবমাননার নৈষ্কর্ম থেকে প্রবুদ্ধ ভারতবর্ষ তিনটি কথায় তার অমোঘ সঙ্কল্প ব্যক্ত করেছে—

ডু অর ডাই—করব অথবা মরব

মারব আর মরব, কিল অ্যাণ্ড ডাই—অতি-বড় উত্তেজনার মুখেও ভারত ভাবতে পারে না জিঘাংসু অন্যান্য জাতির মতো। তার শুদ্ধ প্রজ্ঞা এক সুস্থ শান্তিময় জগতের ছবি আঁকে, কারো সঙ্গে হানাহানি না করেও মানুষ বেঁচে থাকবে সেখানে, মরবে শুধু মানুষের দুর্বার লোভ। ভারত ছাড়ো—জরুরি দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। বিশাল ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি এক দাবি—ভারত ছাড়ো, ভারত ছাড়ো, ভারত ছাড়ো তোমরা। সেই বিদেশি ছোকরা নিজে থেকে যে কথা একদিন বলেছিল পান্নালালের কাছে। বিচিত্র এই ভাঙাগড়ার সংঘর্ষে পুতুল হয়ে থাকবে না কোটি কোটি নরনারী; কিছুতে থাকবে না। জাতির বোঝা বইবে জাতীয় গবর্নমেণ্ট। দর-কষাকষির দিন আর নেই। বধিরতা আর ভাঁওতাবাজি চলে যদি এখনো,

তার জবাবে অনিচ্ছার সঙ্গে কংগ্রেস তার অহিংস-শক্তি সংহৃত করবে। মহাত্মাজি বলবেন, বড়লাটের কাছে এই শেষ একবার আমি দূতিয়ালি করতে যাব।

কিন্তু সে পর্যন্ত সবুর সইল না। কারাগারে নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন তাঁরা।

পান্নালাল এখনো আছে অনুপমের তেতলায়। কণ্ট্রাক্টরি কাজে অনুপমকে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়, পান্নালালের উপর বাড়ি ফেলে নির্ভয়ে সে ঘোরাঘুরি করে। মার্কা-মারা স্বদেশি মানুষগুলার সরকারের সঙ্গে যে সম্পর্কই হোক—সর্বস্ব দিয়ে বিশ্বাস করা যায় তাদের!

ইদানীং পান্নালাল কেমন মুষড়ে যাচ্ছে। যেন কাণ্ডারীহীন ভেলায় ভেসে চলেছে। উমা আছে; সুপ্রিয়ারা চলে যাবার পর ইস্কুলের হস্টেলে গিয়ে উঠেছে। সুপ্রিয়া চিঠির পর চিঠি দিচ্ছে ছুটি নিয়ে অথবা কাজে ইস্তফা দিয়ে তার ওখানে গ্রামের কাজে যোগ দেবার জন্য। চিঠির সে জবাব দেয় না; সুপ্রিয়ার প্রস্তাব ভেবে দেখবারই সময় নেই যতদিন পান্নালাল রয়েছে এখানে। জেলে থাকলে তবু নিশ্চিন্ত থাকা যায়, বাইরে থাকতে শান্তি নেই। কখন কিসে মেতে ওঠে, সেই ভাবনা। বিকাল হলেই উমা অনুপমের বাড়ি চলে আসে, খানিকটা রাত অবধি থেকে পান্নালালকে সামনে বসে খাইয়ে তবে সে ফিরে যায় হস্টেলে।

মহেশের সন্ধান পাওয়া গেছে। মাংসের দোকান সেই বন্ধ করেছিল, আর খোলে নি। কি করছে কে জানে—রকম সকম-দেখে মনে হয় চলছে তার খারাপ নয়। ইদানীং খুব এখানে আসা-যাওয়া করছে। কিন্তু উমার কি হয়েছে—খাপ্পা হয়ে ওঠে মহেশকে দেখলে।

পান্নালাল উমাকে বলে, বেশ তো দিব্যি খাচ্ছি-দাচ্ছি, খবরের কাগজ পড়ছি, কথার তোড়ে রাজা-উজির মারছি লড়ায়ের ম্যাপ দেখে দেখে। তবু দেখি সোয়াস্তি নেই তোমার—

কিন্তু মুশকিল যে খবরের কাগজেও। সারা ভারতে গোলমাল, আর

আমেরি সাহেব সগৌরবে বলছেন চিরকেলে বজ্জাত বাংলা দেশ কেমন ঠাণ্ডা এবারে দেখ!

মহেশ আগুন হয়ে বলে, অসহ্য!

চা পরিবেশন করতে এসে উমা দুজনের মাঝখানে দাঁড়াল। মহেশ তবু বলতে লাগল, কি লজ্জার কথা ভাই। রয়্যাল-বেঙ্গল টাইগারের দেশ—বাঘেরা নির্বংশ হল নাকি?

পান্নালাল ঘাড় নেড়ে বলে, ঠিক তাই। সুন্দরবনে অতি-সুন্দর ধানের আবাদ হচ্ছে। যেখানে বাঘ ডাকত, চাষারা সেখানে লাঙল ঠেলে।

তাড়াতাড়ি উমা রেডিও খুলে দিল। গানের গোলমালে এই সব বেয়াড়া কথার অবসান হোক। কিন্তু কপাল মন্দ, গান সে সময়টা নেই। রেডিওরও ঐ এক খবর—সুশীল সুবাধ্য ভক্তিমান বাংলা দেশ। মিস্টার আমেরি টিটকারি দিয়ে বলছেন—

মহেশ উঠে এসে রেডিওর চাবি বন্ধ করল।

অসহ্য, পাগল হয়ে যাবার দাখিল।

পান্নালাল সায় দিল, ঠিক!

উমার প্রদীপ্ত চোখ দুটি মহেশের মুখের উপর পড়ল। পান্নালাল বলে, এমনিতেই মানুষ এত কথা বলে যে টেঁকা মুশকিল। তার ওপর আবার এক-একটা কথা এই রকম যদি লাখ বার ছড়ানোর বন্দোবস্ত হয়, উপায় কি পাগল না হয়ে?

মহেশ বলে, আর কথাটাও ভাবো দিকি! পরশুরাম একুশ বার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন তবু জড় মারতে পারেন নি। এরা এমন বাহাদুর যে, দু-চার মাস জেলে কি দু-দশ ঘা বেতের বাড়ি দিয়ে ঠাণ্ডা করবে চারদিক?

উমা টিপ্পনি কেটে বলে, বাহাদুর—সে কি মিছে কথা? পরশুরাম শুধু ডান-হাতেই কুড়ল চালিয়েছিলেন, তাই পেরে ওঠেন নি। সব্যসাচী এরা,

ডান-হাত বাঁ-হাত সমানে চালাচ্ছে। জেল, জরিমানা অথবা মিলিটারি-কণ্ট্রাক্ট, প্রকাশ্য ও গোপন চাকরি—

চারিদিকে নানা গুজব। ছাপানো ও সাইক্লোস্টাইল-করা নানারকম কাগজ হাতে আসছে। কোন্ আদালতে নাকি জজকে সরিয়ে খদ্দরধারী কর্মী বিচার করতে বসেছে; থানায় কোথায় তিনটে কনেস্টবল গায়েব; কোন্ ইস্পাতের কারখানায় নাকি মাকড়সার জাল ঝুলছে—জাতীয় গবর্নমেণ্ট না হওয়া পর্যন্ত হাপরে আর আগুন জলবে না। · উমা বিষম উদ্বিগ্ন হচ্ছে মনে মনে। ভিন্ন জাতের মানুষ এই পান্নালালেরা। এত যাতনা সয়েছে, তবু শান্ত হল না। চড়কের সময় ঢাকের বাজনা শুনলে সন্ন্যাসীর পিঠ চড়চড় করে ওঠে, এদেরও তেমনি। তার উপর সময় নেই অসময় নেই, মহেশ 'ভাই' ভাই' করে আসছে।

দুপুর বেলা একদিন মহেশ টিপিটিপি এসে উঠল তেতলায়। উমা নেই। সোয়াস্তির শ্বাস ফেলে সে দরজায় খিল এঁটে দিল। চোখে কালো গগ্‌লস, চিনতে পারা যায় না। পুঁটলি থেকে বের করল চকচকে ছোরা একখানা।

আর ও টিনের ভিতর কি দাদা—অত যত্নে কাপড়ে মুড়ে এনেছ?

মহেশ বলে, এখন খালি। যাবার মুখে পেট্রোল ভরতি করে দেবে।

একটা যন্ত্র বের করে বলে, দেখে নাও—তার কাটতে হবে এই রকম করে। টেলিগ্রাফ-লাইন সাবাড় করে তারপরে কাজের আরম্ভ কিনা!

আর শুনেছ? ম্লানমুখে পান্নালাল বলে, আজ দুপুরেই একটাকে মেরে ফেলেছে রাস্তার তার কাটছিল বলে।

মহেশ বলে কাটছিল না, মেরামত করছিল টেলিফোন-কোম্পানির লোক। কারও মাথার ঠিক নেই ভাই—না ওদের, না আমাদের।

আরও অনেক পরে বেলা পড়ে এলে উমা এল। ঝালর-দেওয়া একটা

বালিশ-ডাকা সে নিজের হাতে বুনে নিয়ে এসেছে পান্নালালের জন্য। এসে খিল-দেওয়া দরজা ঝাঁকাচ্ছে। খুলে দিতে মহেশের দিকে সে কটমট করে তাকাল।

পান্নালাল বলে, বিশ-পঁচিশটা টাকার দরকার পড়ে গেল যে!

কি হবে?

কলকাতায় থাকা যাচ্ছে না।

উমা অনুনয়-ভরা কণ্ঠে বলে, তাই চল পানু-দা, আমার সঙ্গে সুপ্রিয়াদের গাঁয়ে। তোমার বিশ্রামের দরকার।

পান্নালাল হেসে উঠে বলে, বিশ্রামের তো তোফা জায়গা রয়েছে। পাকা বাড়ি, পরের খরচ।

গান্ধীজির ছোট্ট একটা ছবি টেবিলে, ডাণ্ডির সত্যাগ্রহে চলেছেন সেই সময়কার। হিমালয়ের প্রত্যন্ত থেকে বঙ্গের সমুদ্র-বিস্তার অবধি নিখিল মানব-মানসের সত্য ও দুঃখের পথে বিজয়-যাত্রা চলেছে যেন। ছবির দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস পড়ল পান্নালালের। বলে, যেমন ওঁরা হাজারে হাজারে বিশ্রাম করছেন আজকে। জবরদস্তি করে বিশ্রাম করাচ্ছে।

উমা পাংশু হয়ে উঠে। বলে, শোন পানু-দা, দরজায় শত্রু—হুজুগের সময় নয়। গান্ধীজির শেষ কথাগুলো মনে রেখো।

পুণ্য বৈদিক মন্ত্রের মতো পান্নালাল গান্ধীবাণী আবৃত্তি করল—

অহিংসায় স্বাধীনতা যদি না আসে, আমি মরব। আমি মরলে দেশ যেন যে উপায়ে পারে স্বাধীনতার চেষ্টা করে।

মহেশ বলল, তা গান্ধী তো মারাই গেছেন।

উমা চমকে ওঠে। বলেন কি?

মরা নয় তো কি! যাকে বলে সিভিল ডেথ।

সহসা ভীষণ হৈ-চৈ উঠল রাস্তায়। অসংখ্য ভারী জুতোর সমবেত ধ্বনি। ছুটে তারা বারাণ্ডায় বেরিয়ে এল।

পান্নালাল উৎকট হাসি হেসে উঠল। বলে, দিব্যচক্ষে দেখছি জেলের দুয়োর খুলতে হল বলে। বিক্ষুব্ধ কোটি কোটি মানুষকে ঠেকাতে পারে গুর্খা বা গোরা সার্জেণ্ট নয়—বেঁটে ওই বুড়ো মানুষটি ও তাঁর দুঃখজয়ী দলবল।

উমা ওদিকে ঘরে গিয়ে নিঃশব্দে বিছানা করছে। বালিশ-ঢাকা চাপা দিল পান্নালালের আধময়লা বালিশের উপর।

(২)

হাজার হাজার ছেলেমেয়ের নিঃশব্দ শোভাযাত্রা। ইস্কুল কলেজ সব বন্ধ। দিনের পর দিন চলবে নাকি এই রকম? নানাপথ ঘুরে সবাই জমায়ত হচ্ছে পার্কের সামনের রাস্তায়! পার্কের দুয়োর আটকে আছে লাল-পাগড়ির দল। তারা পেরে ওঠে না, এ-পাশ ও-পাশ দিয়ে রেলিং টপকে টপাটপ ভিতরে লাফিয়ে পড়ছে। সার্জেণ্টগুলো মোটর-বাইকে বেপরোয়া ছুটোছুটি করছে জনতার মাঝখানে। পালাচ্ছে না কেউ, বড় জোর পাশ কাটায় একটু। এত মানুষ যেন অলক্ষ্য সূত্রে পায়ে পায়ে বাঁধা, মনে মনে বাঁধা।

ধুলোর ঝড় তুলে তীরবেগে লরির পর লরি আসছে। লরি থামতে না থামতে লাফিয়ে পড়ল গুর্খারা এবং আরও পুলিস। এদিক-ওদিক দৌড়চ্ছে, এলোপাথাড়ি পিটছে যাকে সামনে পায়, ছুঁড়ে মারছে হাতের লাঠি।

জনতাও ক্ষেপে গেল। রাস্তার খোয়া আর জুতো ছুঁড়তে লাগল। এক পানওয়ালা ডাব ছুঁড়ছে তার দোকানে যতগুলো আছে। তখন হুকুম হল, টিয়ার-গ্যাস রিভলভারে পুরে ছাড়তে হবে। গ্যাসে চারিদিক ধোঁয়া ধোঁয়া। কেউ দেখতে পাচ্ছে না, অন্ধ হয়ে গেছে যেন সবাই।

পিছন ফিরলে চলবে না, সামনা-সামনি তাকিয়ে জনতা আস্তে আস্তে হঠছে। প্রবল আক্রমণ হঠাৎ সেই সময়। নাঃ, যুদ্ধ জানে এরা—বর্মায় হেরে পালাক আর যাই করুক, বিপক্ষের হাতে অস্ত্র না থাকলে সত্যিই এরা

অপরাজেয়। বিশৃঙ্খল ভিড়ে ঘা-গুঁতো খেয়ে অনেকে পড়ে যাচ্ছে, ভারী বুটজুতো বীরদাপে পেষণ করে যাচ্ছে তাদের। শোনা গেল, নিদারুণ লাথি ঝেড়েছে নাকি একটা মেয়ের মুখে, ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে মেয়েটার নাক দিয়ে।

ট্রামে চলেছে পান্নালাল আর মহেশ। বড় রাস্তার মোড়ে থামতে জন আষ্টেক উঠল গাড়িতে। বলে, নামুন তো মশায়রা। শিগগির নেমে যান, শিগগির।

ট্রলির দড়ি কেটে দিল একজন।

দেশলায়ের কাঠি ফুরিয়েছে যে, ও সোনা-দা! কণ্ডাক্টরকে বলল, দাও তো ভাই তোমারটা, সিগারেট ধরাই।

কণ্ডাক্টর বুঝছে সব। বিনাবাক্যে তবু দেশলাই বের করে দিল। দাউ দাউ করে গাড়ির সামনেটা জলে উঠল দেখতে দেখতে। পিছনে সারি সারি আরও খান দশেক দাঁড়িয়ে গেছে। সমস্ত জ্বালিয়ে দেবে, লঙ্কাকাণ্ড চলবে নাকি শহরের রাস্তায় রাস্তায়?

রাত হয়েছে তখন। ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার বিদীর্ণ করে মাথার উপরে অকস্মাৎ আগুনের গোলা লোফালুফি শুরু হল। বর্মার পাহাড়ে জঙ্গলে যে কাণ্ড চলেছে, এই কলকাতার বুকের উপর এ-ও প্রায় তেমনি। বড়-বাড়ির দোতলার বারাণ্ডা—কংক্রিটের বেষ্টনী। তারই আড়াল থেকে অগ্নিপিণ্ড একের পর এক এসে পড়ছে অবিরল ধারায়। ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিসের দল গুলি ছুঁড়ছে—কিন্তু মানুষ দেখা যাচ্ছে না, দেয়ালের বালি খসিয়ে গুলি নিচে পড়ছে।

ফটক গলির মধ্যে, ভিতর থেকে বন্ধ। লাথির উপরে লাথি মারছে—সেকেলে ভারী দরজা একটু নড়ে না। রাস্তার ও-পারের পুরানো লোহার দোকান থেকে একটা জয়েস্ট নিয়ে আসে সাত-আট জনে। তারই আঘাত দিতে দিতে খিল ভেঙে পড়ল।

বারাণ্ডায় তখন কেউ নেই—কা কস্য পরিবেদনা। পড়ে রয়েছে অর্ধেক-ভরতি কেরোসিনের টিন আর অজস্র পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি। আর গোটা কুড়িক ন্যাকড়ার পুঁটলি একদিকে—এক-এক টুকরা দড়ি ঝোলানো তাতে। এই এক নূতন অস্ত্র বের করেছে। সরল সনাতন পন্থায় অগ্নিক্ষরণের ব্যবস্থা। একজন দড়ি ধরে পুঁটলি ভেজায় কেরোসিনে, পাশের মানুষ দেশলাই জ্বেলে দেয়, জ্বলন্ত গোলা অবিরাম নিচে পড়তে থাকে।

প্রহর দেড়েক রাত্রি। পান্নালাল আর মহেশ হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌছল শহরের বাইরে বটতলায়। সবশুদ্ধ বাইশজন হাজির ; ভোরের ট্রেনে রওনা হবে। নীরন্ধ্র আঁধার—মুখ দেখা যায় না। ফিসফিস করে তালিম দেওয়া হচ্ছে, কে কোথায় নামবে, আত্মগোপন করে কি ভাবে কাজ হাসিল করতে হবে। আঠারোই আগস্ট—মঙ্গলবার। নিশিরাত্রে চাঁদ ডুবে গেলে ছোট-লাইনের সমস্ত স্টেশন একসঙ্গে জ্বলে উঠবে। কাগজ-পত্র পুড়বে, লাইন তছনছ হয়ে যাবে, তোলপাড় হয়ে যাবে অঞ্চলটা জুড়ে। সকালবেলা লোকে দেখবে ছাইয়ের গাদা ; মাইলের পর মাইল পরিত্যক্ত রণক্ষেত্রের মতো।

খুব স্ফূর্তি পান্নালালের। আজকে এই রাত্রেই পৃথিবীর নানা প্রান্তে কত সৈন্য যুদ্ধে যাচ্ছে। এরাও যেন তেমনি একটা দল। কারও সঙ্গে কারও পরিচয় নেই, একযাত্রায় চলেছে মৃত্যু-আকীর্ণ রাস্তায়।

পান্নালালের হাতে ছোট সুটকেশ! তাতে নানারকম জিনিসপত্র—আর আছে গান্ধীজির ছবিখানা—ওখানা সঙ্গে থাকে তার। ভরসা পায়, সত্যের আগ্রহে দুঃখ ফুলের আঘাতের মতো লাগছে—এই অনুভূতি জাগে। মনে মনে জপমন্ত্রের মতো সে আবৃত্তি করছে, আঠারোই—রাত্রি যখন ঠিক একটা। কেন চলেছে, পান্নালাল তা জানে না। সে সৈনিক, জানবার গরজ নেই। শুধু এক দুরন্ত ক্ষোভ কালকূটের মতো দেহ-মন আচ্ছন্ন করে আছে। লক্ষ কোটি নর-নারীর চিত্তবিজয়ী ষাট বছরের ত্যাগ আর দুঃখ-বরণে মহিমান্বিত

কংগ্রেস রাজার আইনমতে আর জীবিত নেই। নির্লোভ নির্মোহ তার নেতৃবৃন্দ —শ্বেত শুদ্ধ খদ্দরে আবৃত দেহ, আলাপ করতে যাও—যা বলছ তাতেই হাসি, হাতজোড় করছেন কথায় কথায়, প্রবলের সঙ্গে শক্তি ও বুদ্ধির যখন মারপ্যাঁচ চলছে, তখনও প্রতি কথায় রসিকতা। বন্দী এঁরা চোরডাকাতের মতো। ভারতের নির্মল আত্মা কঠিন কারাগারে নিপীড়িত।

(৩)

কলকাতা থেকে অনেক—অনেক দূরে ছোট-লাইনের ছোট স্টেশনটি। দুখানা আপ আর দুখানা ডাউন—সাকুল্যে এই চারখানা গাড়ি দিনে রাত্রে চলাচল করে। বাকি সময় প্লাটফরমের প্রান্ত অবধি বিস্তৃত আশশ্যাওড়া ও ভাটের জঙ্গলে মশার গুঞ্জনটুকুও পরিষ্কার শোনা যায়। দিনেও কখন কখন শিয়াল ডেকে ওঠে।

স্টেশন-মাস্টার জয়চন্দ্র গাঙ্গুলির দশ বছর কাটল এখানে। অন্য লোক এসেই পালাই পালাই করে, তিনি কিন্তু দিব্যি আছেন। পেনশনের আর দুবছর সাত মাস বাকি, এর মধ্যে আর কোনখানে ঠেলে না দেয়—ভালয় ভালয় এই আড়াইটা বছর কেটে গেলে বাঁচেন।—স্ত্রী শহরের মেয়ে, অহরহ খিটমিট করছেন, সুবিধা পেলেই বাপের বাড়ি কিংবা মামার বাড়ি ঘুরতে যান, মেয়ে অণিমাও যায় সঙ্গে। জয়চন্দ্রকে নড়ানো যায় না, পয়েণ্টস্‌ম্যান পুরন্দর সিং ঘর-গৃহস্থালীর ভার নেয় সেই সময়টা। কোম্পানির পেনশন কিংবা যমরাজের পরোয়ানা ছাড়া কেউ তাঁকে নড়াতে পারবে না এ জায়গা থেকে।

দুপুরের গাড়িতে ধবধবে পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক নামলেন। দেখতে পেয়ে জয়চন্দ্র ছুটতে ছুটতে গিয়ে তাঁকে অফিস-ঘরে বসালেন। অণিমা জানলা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ির সাড়া পেলেই সে জানলায় এসে দাঁড়ায়। হাসিখুশি মেয়েটা, কিন্তু ভদ্রলোক এলেন দেখে মুখ অন্ধকার হল। সরে এল তাড়াতাড়ি জানলা থেকে।

এবং যা ভাবছিল—জয়চন্দ্র এসে স্ত্রীকে ডাকলেন, শুনছ ?

এর পরে যা যা ঘটবে, তা-ও মুখস্থ অণিমার। খবর যাবে ছোটবাবুর বাসায়। ছোটবাবুর বউ এসে পড়বেন। তারপর অণিমাকে নিয়ে প্রাণপণে ঘষামাজা লেগে যাবে। কালো রঙে একটু চিকণ আভা ধরানোর চেষ্টা।

কিন্তু গিন্নির আজ মেজাজ খারাপ। তিনি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, ভাত চাপাতে হবে তো ? পারব না, পারব না আমি। যা করবার কর। এত বলছি, রেণুপদ আসব আসব করছে, মচ্ছব থামাও এখন কয়েকটা দিন। বলেছে যখন, নিশ্চয় আসবে। মিথ্যে বলবার ছেলে সে নয়।

অনুচ্চ কণ্ঠে জয়চন্দ্র বলেন, যা ভেবেছ—ইনি তা নন গো।

আরও আগুন হয়ে গিন্নি বলেন, সকলে যা, উনিও তাই। বোকা পেয়ে গেছে তোমাকে। পথ-চলতি মানুষ স্টেশনে নামে, মেয়ে দেখবার ছুতো করে ভালমন্দ খেয়ে সরে পড়ে।

আর কথা না বাড়িয়ে জয়চন্দ্র সরে পড়লেন। গিন্নিও গজর গজর করতে করতে সরু চাল বের করলেন এ-হাঁড়ি ও-হাঁড়ি হাতড়ে। মুখে যা-ই বলুন—খুবড়ো মেয়ে যতক্ষণ ঘাড়ের উপরে, মেজাজ দেখিয়ে পরিত্রাণ নেই।

কুটুম্বটি কোয়ার্টারেই এলেন না। স্টেশনে ভাত গেল, পুরন্দর সিং দিয়ে এল। মেয়ের বাপ হয়ে জয়চন্দ্র যেন যুক্তকর গরুড়পক্ষী হয়ে আছেন। ছেলেওয়ালারা এসে যা বলবে, তাতেই রাজি। খবর শুনে কাজের ফাঁকে ছোট বাবুর বউও একবার এসেছেন। গালে হাত দিয়ে তিনি বলেন, মেয়েটাকেও সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে নাকি আফিস-ঘরে ? ওমা, কি ঘেন্না !

খাওয়াটা গুরুতর হল। কুটুম্ব এলে এইটে উপরি লাভ। জয়চন্দ্র গড়াচ্ছেন। অণিমা টিপি-টিপি এসে বাপের পাকাচুল তুলতে বসল।

সহসা অতি কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে, পারি না বাবা। তোমার দুটি পায়ে পড়ি—আর আমায় টানাটানি কোরো না।

চমকে ঘাড় তুলে তাকালেন জয়চন্দ্র। মেয়ের দু-চোখে জল টলটল করছে।

কি বলছিস ?

অণিমা বলে, গুরুঠাকুরের মতো এত খাতির-যত্ন কর, সবাই তো মুখ বেঁকিয়ে চলে যায়। রাস্তার লোক ডেকে ডেকে এত অপমান কেন সহ্য কর ? আমায় দুটো পেটে খেতে দিতে হয় বলে ?

জয়চন্দ্র চঞ্চল হয়ে উঠে বসলেন। এই দেখ কাণ্ড।

মেয়ের চোখ মুছে দিলেন কোঁচার কাপড়ে। তবু কাঁদে। বিব্রত হয়ে বলেন, সে সব কিছু নয়—তোকে দেখতে আসে নি। মানুষ এলেই মায়ে-বেটিতে তোরা আঁতকে উঠবি ? এই এক মহাবিপদ হয়েছে।

বিশ্বাস করছে না দেখে বললেন, শোন্, আজ রাত্রে বিষম কাণ্ড হবে এই স্টেশনে।

গলা খাটো করে বলতে লাগলেন, খবরদার, খবরদার ! কেউ জানতে না পারে, তা হলে চাকরি থাকবে না। স্টেশন জ্বালিয়ে দেবে স্বদেশিরা, লাইন ওপড়াবে।

চোখের জলের উপর রামধনু ঝিকমিক করে উঠল অণিমার মুখে। ছোটবাবু খবরের কাগজ রাখেন, তাঁদের পড়া হয়ে গেলে বিকেলবেলা সেটা নিয়ে এসে প্রতিটি ছত্র সে যেন গোগ্রাসে গেলে। আইন বাঁচিয়ে এবং নিজেদের ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা আখের বাঁচিয়ে যা লেখে কাগজওয়ালারা, তার ভিতর দিয়েও এতদূরে অণিমা দেশের দ্রুত হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে পায়। এল বুঝি এত দিনে ভাঁট-আশশ্যাওড়ার আচ্ছন্ন স্টেশনে, পানা-ভরা নিঃস্রোত ভৈরবের ধারে দুর্মদ সৈনিক-দল—স্বাধীনতার স্বপ্ন অনারোগ্য ব্যাধি হয়েছে যাদের ? লাইনের উপর দিয়ে গাড়ি চলার মতো নির্দিষ্ট বাঁধা-ধরা জীবন ! লাইন ওলটাতে আসছে—অণিমার মন কেমন নেচে ওঠে, লাইন-বাঁধা জীবনটাও উলটে যাবে বুঝি আজকে রাত্রির অন্ধকারে !

ছুটে সে জানলায় গেল। দেখবে একবার স্টেশনের ঐ মানুষটিকে। অনেকক্ষণ ধরে অনেক উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করে। ঈজি-চেয়ারে শুয়ে আছেন, ফরসা জামার হাতা আর মাথার খানিকটা মাত্র দেখা যাচ্ছে।

বড্ড রাগ হয় বাপের উপর। মেয়ে দেখার নাম করে যে আসে, তাকে তো স্বচ্ছন্দে বাসায় এনে তুলতে পারেন। এত আতঙ্ক এরই বেলা? বলে বেশ মানুষ তুমি বাবা। স্টেশনে ঐ রকম রেখে তোমার চলে আসা কি উচিত হয়েছে? বাড়ি নিয়ে এলে কি হত? আনবে তো বিকেলবেলা? আলো থাকতে থাকতে এনো, ভাল করে দেখব।

কাছে এসে দেখে, জবাব দেবেন কি—জয়চন্দ্র ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আকাশ মেঘে থমথম করছে। স্টেশন নির্জন। পুরন্দর সিং অবধি ওজন-কলের পাশে চট পেতে পড়ে আছে। কেউ দেখতে পাবে না, একটিবার সে দেখে আসবে তাঁকে। শুধু একটু চোখের দেখা। যাচ্ছে আর তাকাচ্ছে এদিকে-ওদিকে।

কিন্তু ভদ্রলোকই অণিমাকে দেখে ফেললেন।

এস, এস মা। খবর কি? ভাল আছ?

অপ্রতিভ অণিমা তাড়াতাড়ি বলল, ঘুম ভেঙেছে কি না দেখতে এলাম কাকাবাবু। ডাব কেটে আনিগে যাই।

আসতে আসতে ভাবে, এই রকম পোশাকে এসেছেন! বেল্টে আঁটা রিভলভারটা ধপধপে ওই আদ্দির পাঞ্জাবির নিচে?

(৪)

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। প্ল্যাটফরমে আলো মাত্র একটি। তিনটি জ্বালাবার কথা, মোটের উপর জ্বলছেও তাই। একটি এখানে, আর দুটো জয়চন্দ্র আর ছোটবাবুর কোয়ার্টারে। পুরন্দর সিং প্রতিদিনের মতো কেরোসিনের টিন নিয়ে হ্যারিকেন ভর্তি করতে এসেছে।

অণিমা জিজ্ঞাসা করল, কি করছেন রে এখন কাকাবাবু ?

পুরন্দর বলে, চুল বাগাচ্ছেন হাত-চিরুনি দিয়ে, দেখে এলাম।

ঘণ্টা বাজল। অনেক দূরে অস্পষ্ট গুমগুম আওয়াজ। পানের ডিবা হাতে অণিমা এসে অফিস-ঘরে ঢুকল।

কাকাবাবু, পান—

গাড়ি আসার সময়টায় এই ভিড়ের মধ্যে মেয়েকে দেখে জয়চন্দ্র বিরক্ত হলেন। বললেন, আঁধারে লাইন পার হয়ে এলি, পুরন্দর সিংকে দিয়ে পাঠালেই হত।

অণিমা বলে, রেণু-দা আসছেন যে এই গাড়িতে। তুমি বেরিয়ে আসার পর চিঠি-এল।

আসছে নাকি ? উল্লাসে প্রায় আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি ফুটল জয়চন্দ্রের মুখে। আগন্তুকের কাছে পরিচয় দিতে লাগলেন, এর ন-মাসীর ভাশুরের ছেলে রেণুপদ—এম. এ. পড়ে। মাসতুতো বোনের বিয়েয় গিয়ে আলাপ-পরিচয় হয়েছে। তা এসেছিস—ভাল হয়েছে অণি, আমি তো চিনি নে তাকে।

গাড়ি এল চারিদিক কাঁপিয়ে। আবছা অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না। অণিমা পাগলের মতো ইঞ্জিন থেকে শেষ গাড়ি অবধি ছুটছে। ছোট্ট স্টেশন—যারা ওঠা-নামা করে, তারা প্রায় সবাই আশপাশের দু-তিনখানা গ্রামের। সকলের মুখ চেনা। এই রাত্রে বর্ষার জল-জঙ্গলভরা গ্রামে কাদা জোঁক আর কেউটে-সাপের মধ্যে নূতন কেউ আসবে না, নিতান্ত যাদের কাঁধে ভূত চেপে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সেইরকম মানুষ ছাড়া।

পান্নালাল নামল। নেমে সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সাব্যস্ত করে ফেলল, কোন্ দিক দিয়ে বেরুনো সুবিধা।

পিছন থেকে হাতে টান, আর উচ্ছ্বসিত হাসি।

এই যে রেণুদা, হাঁ করে দেখছেন কি ?

স্মুটকেসের দিকে নজর পড়তে অণিমা সেটা ছিনিয়ে নেয়।

কি ওতে···কাপড়চোপড় ? দিন আমাকে, আমি নিয়ে যাচ্ছি। থাক থাক, আমার সঙ্গে ভদ্রতা করতে হবে না। থাকলই বা আমার হাতে। চলুন।

এক হাতে স্মুটকেস ঝোলানো, আর এক হাত দিয়ে যেন সে পান্নালালকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলল। এমন বিপাকে পান্নালাল কখনো পড়ে নি। গেটের দিকে গেল না, নিয়ে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে।

ঐ যে আমাদের বাসা। গুমটির ওখান থেকে গুঁড়ি মেরে তার পেরুতে হবে। সত্যি রেণু-দা, ভাবতেই পারি নি, আপনি আসবেন এই জংলি পাড়াগাঁয়ে।

নিতান্ত অন্তরঙ্গের মতো গা ঘেঁষে চলেছে। হঠাৎ সামনে অণিমার কাকাবাবুটি—দুপুরের গাড়িতে যিনি এসেছেন। যেন সমস্ত দৃষ্টি পুঞ্জিত করে তাদের দিকে তাকাচ্ছেন। অন্ধকারে উজ্জ্বল হিংস্র চোখ দুটি।

কাছাকাছি গিয়ে অণিমা বলল, আমাদের কাকাবাবু ইনি। বড্ড ভালমানুষ আর বড্ড ভালবাসেন সকলকে। দাঁড়াবেন না রেণু-দা, হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এসে তারপরে আলাপ-টালাপ করবেন।

পান্নালাল যুক্তকরে ভদ্রলোককে নমস্কার করে অণিমার সঙ্গে চলল।

প্ল্যাটফর্মের শেষে ঢালু জমি, এক-পেয়ে পথ। লাইনের তার ডিঙিয়ে শাপলা-ভরা ঝিলের কাছে অণিমা থমকে দাঁড়াল।

আপনার নাম রেণুপদ চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. পড়েন। বুঝলেন তো ?

মুগ্ধচোখে চেয়ে পান্নালাল বলল, বুঝেছি। হাওয়া খেতে এসেছি আপনাদের এখানে, কেমন ?

এমন অবস্থায়ও মৃদু হাসির আভা খেলে গেল অণিমার মুখে। বলে, শুধুই হাওয়া খেতে নয় অবিশ্যি।···সে যাকগে। এখনই তো বিদায় নিচ্ছেন—

পান্নালাল বলে, রাতটুকু থাকতে পারা যায় না ?

না। ঐ যাকে কাকাবাবু আর ভালমানুষ বললাম, ভালমানুষ উনি মোটেই

নন। পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর—পীরনগরের পথে খুব আসা-যাওয়া আছে এখানে। সকাল থেকে জাল পেতে বসে আছেন আপনাদের জন্য।

নজর পড়ল, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যাচ্ছে পান্নালাল। জিজ্ঞাসা করে, পায়ে ব্যথা নাকি?

পান্নালাল বলে, রাত্রে কাল আছাড় খেয়েছিলাম খেয়া-ষ্টিমার থেকে নামতে গিয়ে। হাঁটা যাচ্ছে না।

অণিমা বলে, কিন্তু হাঁটতেই যে হবে! ছুটতে হবে। মা রেণু-দাকে চেনেন; কি বলে নিয়ে যাই বাসায়?

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, খাওয়া হয় নি নিশ্চয়? একটু দাঁড়ান। দৌড়ে কিছু এনে দি।

পান্নালাল বলল, না থাক—

কেন?

পান্নালাল বলে, দেরি করলে ফ্যাসাদ বাধতে পারে। রসদ কিছু আছে আমার স্যুটকেসে। ওতেই চলবে। দুঃখিত হলেন?

অণিমা স্যুটকেসটা নিঃশব্দে তার হাতে তুলে দিল।

পালান। ঐদিক দিয়ে অমনি মাঠ ভেঙে জোর-পায়ে ছুটে যান যতটা পারেন।

মেয়েটিকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে পান্নালাল দ্রুতপদে চলল। আর কোনদিন জীবনে দেখা হবে না। মুখ ফিরিয়ে একবার বলল, নমস্কার!

পগার পেরিয়ে দূরবিস্তৃত খেজুরবনের আড়ালে ছায়ার মতো মিলিয়ে গেল।

এতক্ষণে গা কাঁপছে অণিমার। পুলিশ-লোকটার সন্দেহ হয়ে থাকে যদি। রেণুপদর সম্পর্কে যদি তদন্ত করতে আসে কোয়ার্টারে? তাকে ধরবে, বাপের চাকরিসুদ্ধ টান পড়ে যাবে, 'কাকাবাবু' বলে ত্রাণ পাওয়া যাবে না। আহা, নিপাট ভালমানুষ তার বাবা, বাংলা দেশের ছা-পোষা ভদ্রলোকেরা যেমন হয়।

কি হচ্ছে ওদিকে, আশাভঙ্গ ইন্‌স্পেক্টর কি করছে—একটু না দেখে বাসায় ফিরতে পারে না। গাড়ি চলে গেছে; স্টেশন আবার চুপচাপ। বৃষ্টি এসেছে। ওয়েটিং-রুমের পিছনে বকুলগাছের নিচে ভিজতে ভিজতে অণিমা দেখতে লাগল। না, খাঁচা ভর্তি ওদের। একটা কোথায় সরে পড়েছে, অতি-আনন্দে সে খেয়াল নেই। তারার মেলা ওয়েটিং-রুমে। স্বাস্থ্যবান হাসিমুখ ছেলেগুলি কোমরে মোটা মোটা দড়ি। অনাহারে শুকনো মুখ, রুক্ষ চুল উড়ছে, চোখের দৃষ্টিতে তবু বিদ্যুতের আলো। খবরের কাগজে যুদ্ধবন্দীদের ছবি দেখে থাকে, এরা যেন তাই! অব্যর্থসন্ধানী পুলিশ! এক-একটা স্টেশনে যেই-এক জন করে নেমেছে, যন্ত্রপাতি সমেত হাতে হাতে ধরে ফেলেছে অমনি। এবার এখান থেকে পীরনগর থানায় চলল। তারপর? এই তারপরের খবর আজকের দিনে একটা অপোগণ্ড শিশুও জানে। পরবর্তী কালে কোনদিন হয়তো খবর বেরিয়ে পড়বে, কি ঘটে থাকে এইসব জেলের অন্তরালে।

মহেশও এদের মধ্যে। অণিমা তাকে চেনে না, কাউকেই সে চেনে না। বয়স্ক এই দাদা-স্থানীয়টি দলের মধ্যে থেকেও দলছাড়া। পোষ-মানা হাতী জঙ্গলে ঢুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে দলশুদ্ধ এনে খেদায় ঢোকায়। এ মানুষটাও তেমনি যেন। কিন্তু পোষ মেনেছে এ কবে থেকে? লোভনীয় কোন্ খাদ্য খেয়ে?

দিন তো আর একটা সিগারেট—

ইন্‌স্পেক্টর তাড়াতাড়ি সিগারেট-কেস এগিয়ে ধরে। একটা তুলে নিয়ে বিজয়ীর মতো মহেশ ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

হঠাৎ এক বিচিত্র স্বপ্ন ঘনিয়ে আসে অণিমার মনে। রেণুপদ সত্যিই যদি আসে, বিয়ে হয়ে যায়—স্বর্গ হাতে পাবেন তার গরিব বাবা-মা। সুন্দর পাত্র, ভাল অবস্থা, এম. এ. পড়ছে কলকাতার হস্টেলে থেকে। বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ মেয়ে তপস্যা করছে এমন বরের জন্য। কালো মেয়েটা কিন্তু আর একরকম চায়। যাকে রেণুপদ বলে ডাকল, সত্যি সত্যি যদি এই-ই হত তার

রেণু-দা! কপালের ঘামের মতো জীবন থেকে সুখ-দুঃখ যারা মুছে ফেলেছে, দুটো দিন শান্তিতে ঘরে থাকবার জো নেই, যুদ্ধের সৈনিক—প্রিয়তমার সঙ্গে হেসে কথা বলার সময় কখন?

পান্নালাল ছুটছে, ছুটে পালাচ্ছে। বার বার মনে হচ্ছে অণিমার কথা। দেখতে সুন্দর নয়, কিন্তু চোখ দুটো ভারি উজ্জ্বল। খনির মধ্যে হঠাৎ-দেখা একজোড়া দামি হীরের মতো। অন্ধকারের মধ্যে চোখের আলো ছড়িয়ে সাবধান করে দিচ্ছে—

পালান—চলে যান জোর পায়ে—

ক্লান্ত পান্নালাল এক পুকুর-ঘাটে জিরিয়ে নিচ্ছে। শান্তিতে বসা যায় না, কানের কাছে সমুদ্যত চাবুকের মতো কালো মেয়েটার কণ্ঠ, পালান—পালান—

সুটকেসটা খুলল। রুটিখানা চিবিয়ে নেওয়া যাক। খেতে খেতে সে গান্ধীজির ছবিখানা দেখে। তপঃক্লিশ একখানি শান্ত মুখ—দূর-দুরান্তর পুণ্যনগরে আগাখাঁর প্রাসাদ-কারা থেকে মমতা-মাখা চোখে যেন চেয়ে আছেন। পান্নালালের দুচোখ অকস্মাৎ জলে ভরে যায়। মনে মনে বলতে থাকে, পথ আমাদের অন্ধকার, আলো দেখতে পাচ্ছি নে। কিছু বুঝতে পারছি নে। কি করব আমরা? কোন পথে চলব?

যখন বছর আঠারো বয়স, লাঠির বাড়ি আর কারাগারে সে জীবন শুরু করেছে। সামনে অনির্বাণ স্বাধীনতার শিখা, পথের দিকে দেখে নি তাকিয়ে। যখন জেলে থেকেছে, দু-চার মাস তখনই যা একটু অবসর। তখন পড়াশুনা করেছে, খোঁজখবর নিয়েছে অপরাপর দেশের, জনগণের অভ্যুত্থানের বিচিত্র কাহিনী পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রীতি গভীরতর হয়েছে কংগ্রেসের প্রতি। কালের সঙ্গে সমান পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছে কংগ্রেস; শুধু ভারতের নয়—বিশ্ব-মুক্তিরও দায় চেপেছে আজ তার কাঁধে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(১)

পান্নালাল পালিয়ে বেড়াচ্ছে জানা-অজানা নানা জায়গায়। ধ্বংসের তাণ্ডব চলছে, তার চিহ্ন সর্বত্র। বিক্ষুব্ধ জনগণ আর সরকারি লোকের মধ্যে পাল্লা চলেছে যেন। পান্নালালও যে নিরপরাধ, তা নয়। শান্ত মুহূর্তে বারম্বার তার মনে হচ্ছে, মহাবীরত্বশালী ঐ সৈন্যদের সত্যিকার কামান-বন্দুকের সামনা-সামনি পাঠিয়ে দিয়ে জেলের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হত যদি! এত পায়তারা ভাঁজবার কোনই আবশ্যক হত না তা হলে।

মাস দুই পরে উত্তজনা কিছু ঠাণ্ডা হয়ে এল। পান্নালালের দেহ যেন ভেঙে পড়ছে। সন্দেহ হয়, রাত্রিবেলা জ্বর হচ্ছে একটু একটু। এতদিন সময় ও সুযোগ হয় নি এদিকে মনোযোগ দেবার। কিন্তু আর চলে না। এক মাইল না চলতে হাঁপ ধরে; বসে পড়তে হয়। বসলেই ঝিমুনি আসে। বিশ্রাম দরকার। বিশ বছরের উপর নিষ্ঠুর খাটনি খাটিয়েছে—শরীর এবার বিদ্রোহের লক্ষণ দেখাচ্ছে।

রঞ্জনলাল দাসের বাড়ি গেলে কিছুকাল নিশ্চিন্তে থাকা যায়। অতি দুর্গম জায়গা—যেতে হলে এমন যান নেই, যা চড়তে না হয়। আর পায়ে-হাঁটা তো আছেই। ট্রেন-সালতিডোঙা-গরুরগাড়ি-মোটরবাস—পথের এত টানা-পোড়েনের ভিতর কোন পুলিশ তার পিছু নেবে না নিঃসন্দেহ। এর চেয়ে অনেক কম হাঙ্গামেই বহু জনকে পাকড়ে প্রোমোশন আদায় করতে পারবে। রঞ্জনলাল পাড়াগেঁয়ে লোক, এক কাজের কাজি, সুদীর্ঘ কালের বন্ধু—আন্তরিক যত্ন মিলবে তার বাড়িতে।

বৃষ্টি, বাতাস আর অন্ধকার। মোটরবাস গর্জন করে ছুটছে। লক্কড়

ইঞ্জিন—এখানে দড়ি-বাঁধা, ওখানে রাং-ঝালাই করা। অনেক বছর কাজ দিয়েছে, গতির চেয়ে আওয়াজ বেশি হয় এখন। আরোহীর কানে তালা ধরে, মনে হয় পৃথিবীতে মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেছে।

আজকের পক্ষে অবশ্য মিথ্যা নয় সেটা। সমস্তটা দিন বৃষ্টি হচ্ছে, সন্ধ্যা থেকে বাতাস যোগ দিয়েছে সেই সঙ্গে। বাসে তাই ভিড় নেই, সাধ করে কে বেরুচ্ছে বল এমন ছুদিনে ?

তেমাথার ধারে পান্নালালকে নামিয়ে দিয়ে বাস চলে গেল। রঞ্জন নাম-করা লোক, তার বাড়ি যাবে শুনে তটস্থ কণ্ডাক্টর জলের মতো করে পথ বুঝিয়ে দিয়েছে। চোখ বুঁজে যাওয়া চলবে, এই রকম ভাবে। এই তেমাথা থেকে সোজা উত্তরে রশিখানেক গিয়ে ডাইনে মোড় নাও। তারপর আমবাগানের ভিতর দিয়ে সরু একপেয়ে পথ চলতে চলতে চলতে—রঞ্জনের মাটির দেয়াল দেওয়া ঘর।

কিন্তু নেমে দাঁড়িয়ে মনে হল, অসীম সমুদ্রে পড়েছে। অন্ধকার—সে যে কি অন্ধকার, গাড়ির খোপে বসে কল্পনা করা যায় না। সোঁ সোঁ করে বাতাস বইছে, বৃষ্টি পড়ছে তীরের ফলার মতো। গাছপালা—বিশেষ করে, সুপারি-গাছগুলো নুয়ে মাটিতে মাথা ঠোকাচ্ছে যেন। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তাতেই সে এ সমস্ত দেখতে পাচ্ছে। আর খানিকটা করে পথও দেখে নিচ্ছে সেই আলোয়। যতটা দেখে, দ্রুতবেগে চলে যায়—তারপর গতি ধীর হয়ে আসে, আন্দাজে পায়ে পায়ে এগোয়। খানিকটা গিয়ে আর সাহস হয় না, পায়ের পাতা ডুবে গেছে জলে। ক্রমেই বেশি জল—সন্দেহ হয়, বিল কি গাঙের মধ্যে হয়তো পড়বে ঝপ্ পাস করে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, আবার বিদ্যুৎ চমকাবে কখন।

এ কি ! জল যে একহাঁটুর উপর। পান্নালাল দাঁড়িয়ে রইল স্তম্ভিত হয়ে। আগু-পিছু যেতে ভরসা হয় না, অতল জলে পড়ে যায় যদি। খরধারে জল চলেছে, ভয়াল কলকল আওয়াজ। অসম্ভব দাঁড়িয়ে থাকা—পায়ে যেন দড়ি

বেঁধে টানছে। একবার পড়ে গেলে একটুকরা কুটার মতো আবর্তিত জলের সঙ্গে সে-ও নিখোঁজ হয়ে যাবে।

বিদ্যুৎ চমকালে দেখল, খালের গর্ভে নেমে পড়েছে। কূলপ্লাবী জল। বাঁশের সাঁকো ছিল, সাঁকোটা অদৃশ্য—হাতে ধরে চলবার জন্য উপরে যে বাঁশ বাঁধা, সেইটে মাত্র জেগে আছে কোন গতিকে।

খাল পার হবার কথা কিছু বলল না তো কণ্ডাক্টর। তা ছাড়া ঐ মগ্ন-সাঁকোয় নির্ভর করে পার হওয়া চলবে না। পায়ের বাঁশটাই হয়তো ভেসে গেছে স্রোতে। চুলোয় যাক রঞ্জনের বাড়ি, আপাতত যে-কোনখানে মাথা গোঁজার দরকার। কোথায় যায় সে? নীরন্ধ্র আঁধারে অজানা জায়গায় কোথায় সে এখন আশ্রয় খুঁজে বেড়াবে?

অতি অস্পষ্ট—ঢাকের আওয়াজের মতো শুনে একটু ভরসা হল। আশ্বিন মাস, পূজোর সময়—পূজো-বাড়ির ঢাক। অনেক দূর থেকে আসছে, ক্রোশ খানেক তো হবেই। চলল আওয়াজ আন্দাজ করে।

ঝড় বইছে এখন দস্তুরমতো। বাঁশ-ঝাড় আলোড়িত হচ্ছে, নুয়ে আসছে বাঁশের মাথা। মনে হচ্ছে, দুরন্ত দৈত্যদল ঝুটোপুটি লাগিয়েছে এ-ঝাড়ে ও-ঝাড়ে। আক্রোশটা যেন তারই উপর—বাঁশ নুইয়ে তার মাথার উপরে চেপে ধরবে এই মতলব।

রক্ষা এই, ঘন ঘন এখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এক সরু পথ সামনে। সেই দিকটা উঁচু, কলকল করে জল নেমে আসছে। খানিকটা দূরে ঝুপসি-ঝুপসি ঘরের মতো দেখা গেল। দৌড় দিল এবার। লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল। বিদ্যুতের আলোয় দেখে নেবে, কোন দিকে দরজা, বাড়ির উঠানে ঢুকবার পথ কোনটা।

বাড়ি নয় তো, পানের বরজ। সর্বনাশ, পথঘাট নিশ্চিহ্ন, দুর্গম জঙ্গল। মড়মড় করে কাছেই কোথায় গাছ ভেঙে পড়ল, শেয়াল একটা ছুটে পালাল সামনে দিয়ে।

দাঁড়িয়ে ভাববার সময় নেই। গাছ আরও পড়বে না এবং ঘাড়ের উপরেই পড়বে না—তার নিশ্চয়তা কি? জঙ্গল ভেঙে ছুটল। বরজ রয়েছে যখন খুব সম্ভব মানুষের বসতি নিকটেই।

তাই-ই। খোড়োঘর, ছিটের বেড়া, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। আর পরমাশ্চর্য ব্যাপার—যুদ্ধের বাজারে অতি-দুর্লভ কেরোসিন, তা সত্ত্বেও ভিতরে আলো জলছে, আলোর রেশ বেরিয়ে আসছে বেড়ার ফাঁক দিয়ে।

পান্নালাল কাতর হয়ে ডাকাডাকি করে, কে আছেন, দুয়োর খুলুন।

সাড়া না পেয়ে দুয়োর ঝাঁকায়। ভিজে ভিজে অসহ্য হওয়ায় দুয়োরে লাথি দিতে লাগল শেষটা।

ধাক্কাধাক্কিতে হাঁসকল খুলে কবাট ঝুলে পড়ে। ভিতরে হ্যারিকেনের আলো দপ করে উঠল বাতাসের ঝাপটা লেগে। পাকা-চুল প্রবীণ মানুষ একটি—চোখে পিচুটি, একেবারে জংলি চেহারা। কিন্তু নবাবি আছে লোকটার—তক্তাপোষের উপর গোটা তিনেক তোষক ও তার উপর সদ্য পাটভাঙা চাদর পেতে তাকিয়া ঠেশ দিয়ে দিব্যি গদিয়ান ভাবে পিট-পিট করে চোখ তাকাচ্ছে।

পান্নালালের এমন রাগ হয়েছে, নিতান্ত অজানা জায়গা না হলে দিত এই লোকটাকে থাপ্পড় কষিয়ে। বলে, আচ্ছা মানুষ মশায়! মারা পড়ছিলাম, আর উঠে দুয়োরটা খুলতে পারলেন না?

লোকটা লজ্জিত হল না। বরঞ্চ ঝাঁঝাল সুরে জবাব দেয়, শুনতে পাই নি কি করব?

কালা নাকি? এখন তো খাসা শুনতে পাচ্ছেন।

খোলা কবাটে জলের ছাট আসছিল। তক্তাপোষের বিছানাতেও দু-এক ফোঁটা পড়ে থাকবে। আদেশের সুরে লোকটা বলে, হুড়কো ভেঙেছ, দুয়োর চেপে দাঁড়াও গিয়ে। দাঁড়াও বলছি। ভিজে গেলাম, দেখতে পাচ্ছ না?

পান্নালাল বলল, আচ্ছা দাঁড়াচ্ছি। আমার অবস্থাটা দেখুন। একখানা শুকনো কাপড় এনে দিন তো অনুগ্রহ করে। কাপড়টা ছেড়ে ফেলি।

নিরুত্তর লোকটি।

শুনছেন? আবার কালা হয়ে গেলেন নাকি? কানে ঢুকছে না, ও মশায়?

রাগে রাগে কাছে এসে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে পান্নালাল চিৎকার করে বলে, একখানা শুকনো কাপড় আর গামছা। শুনতে পাচ্ছ না?

সম্ভ্রম করে কথা বলা চলে না এ রকম মানুষের সঙ্গে। বলতে লাগল, ছিটে-ফোঁটা গায়ে লেগেছে না লেগেছে—অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছ, আর জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে আমার সর্বাঙ্গে। কাপড় এনে না দাও তো ওঠ। ওঠ এখনি, তোমার ঐ বিছানার চাদর তুলে নিয়ে পরব।

ঝনাত করে পিছন-দরজার শিকল খুলে মাঝ-বয়সি বধূ একজন ঘরে ঢুকলেন। পান্নালালকে দেখে সরে গেলেন না, মাথার কাপড়টা ঠিক করে দিলেন বাঁ-হাতে।

পান্নালাল বলল, অতিথি আমি মা, এই রাতটুকুর জন্যে। একেবারে ভিজে গেছি। শুকনো কাপড়—

দিচ্ছি, দাঁড়ান।

মুখে বললেন, কিন্তু মনোযোগ বুড়োর দিকে। তার পাশে বসে ফর্সা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে দিলেন।

খাবার নিয়ে আসি দাদু?

কুইনাইন-গেলার মতো মুখ করে লোকটা বলে, কি করেছ? রুটি না লুচি?

বধূ হেসে বললেন, কাল যা হেনস্থা করলেন—ও বাবা, আবার রুটি! এই এতক্ষণ ধরে লুচি ভাজলাম বেশি করে ময়ান দিয়ে—

আন—

পান্নালাল সকাতরে বলে, কাঁপছি এই দেখুন। একটু যদি তাড়াতাড়ি—

আনছি। খোলা দরজার দিকে নজর পড়ে বধূ ব্যস্ত হয়ে বললেন, দিচ্ছি এনে আপনার কাপড়। দুয়োরটা বন্ধ করুন, দাদুর ঠাণ্ডা লাগবে।

পরনে মোটা খদ্দরের শাড়ি, অলঙ্কারের মধ্যে একজোড়া মাত্র শাঁখা আর কপালে টকটকে সিঁদুরের ফোঁটা—দ্রুত পায়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন তখনই। এক হাতে জলের গেলাস, অপর হাতে বড় থালা; থালার উপর থরে থরে বাটি সাজানো। তক্তাপোষের লাগোয়া তারই চেয়ে অল্প উঁচু এক ছাপ-বাক্স। থালাটা সেখানে নামিয়ে রেখে বাটিগুলো পাশে পাশে সাজিয়ে বধূ ডাকলেন, দাদু—

বুড়ো আড়চোখে এক-নজর দেখে যেমন ছিল তেমনি রইল মুখ বেজার করে।

পান্নালাল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, আমার কাপড় হল না বুঝি?

বধূ লজ্জা পেয়ে বললেন, এক্ষুনি আসছে, বলে এসেছি।

বলে যেন দায় সেরে আবার মিনতি করতে লাগলেন, ঘুরে বসুন, ও দাদু।

বুড়ো ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, কি হবে ঘুরে? শুধু ডাল দিয়ে খাওয়া যায়? মাছ কই?

শুধু ডাল কেন, ধোকার ডালনা রেঁধেছি। আপনি যা বড্ড ভালবাসেন। মাছ আনা যায় নি, এই অভদ্রায় কে যায় বলুন? কোথায় বা মিলবে?

বাটি থেকে তরকারির একটুখানি বধূ পাতে ঢেলে দিলেন। আর অনুনয় করছেন, মুখে দিয়েই দেখুন না—খারাপ লাগবে না। কত যত্ন করে রেঁধেছি।

লোকটা করল কি—হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বাটিসুদ্ধ সমস্ত তরকারি ছুঁড়ে দিল তাঁর মুখে। কাপড়-চোপড়ে মাথার চুলে লেপটে গেল। চোখ মেলে চাইতে পারেন না, এমনি অবস্থা।

এমন সময় শুকনো কাপড় হাতে এসে ঢুকল—ও হরি, রঞ্জনলাল যে! ঠিকই এসেছে তবে, রঞ্জনের বাড়ি এটা।

পান্নালালকে দেখে সোল্লাসে রঞ্জন চেঁচিয়ে ওঠে, তুই ?

সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়। হয়েছে কি লীলা ?

বৃত্তান্ত শুনে স্ত্রীর উপরই সে রাগ করে উঠল।

মাছ নেই তা চুপ করে ছিলে কেন শুনি ? ঝড়-বৃষ্টি—তাতে কি হয়েছে ? যেমন করে পারি আমি যোগাড় করতাম। কি করি এখন ? তোমার কি একটু কাণ্ডজ্ঞান হল না এতটা বয়সে ?

অপরাধী লীলা শুকনো মুখে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। পান্নালাল লীলার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে। সর্বনাশ, কি রকম বড়মানুষের মেয়ে—তাঁর এই দশা করেছে রঞ্জনটা !

(২)

মাটির দেয়ালে ভীমবেগে ঝড় প্রহত হচ্ছে। ঘুম যেন রঞ্জন সাধনা করে অভ্যাস করেছে, শুতে পারলেই অমনি সঙ্গে সঙ্গে বেহুঁশ। পান্নালাল পাশে পড়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে। ভাবছে, সেই লীলা এই ? আহা, আজকে বোধ হয় উপোস করতে হল ওঁর। আবার কি রান্না করতে গেছেন তার জন্য এই দুর্যোগের মধ্যে ?

ছড়-ছড় করে গায়ে বৃষ্টির জল পড়তে লাগল।

রঞ্জন, ওরে রঞ্জন !

ধড়মড়িয়ে রঞ্জন উঠে বসল। চক্ষু বোঁজাই আছে।

চাল দিয়ে যে বিষম জল পড়ছে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রঞ্জন বলে, হচ্ছে বৃষ্টি—তা পড়বে কি সোডা-লেমনেড ?

ঘরের ভিতর সমুদ্দুর হয়ে গেল। চোখ মেল।

চোখ মেলতেই হল, যেহেতু জল গড়িয়ে তারও দিকে ধাওয়া করেছে। উপর দিকে চেয়ে বলল, ছাউনি একদম উড়িয়ে নিয়ে গেছে। গেল আয়েশের ঘুমটুকু—দুত্তোর !

বিছানা গুটিয়ে দেয়ালের ধারে তারা সরে গিয়ে বসল। রঞ্জন আপন মনে বলল, এক ছিলিম তামাক পেলে বড্ড জুত হত এই সময়। কোথায় বা টিকে-আগুন, কে-ই বা ধরিয়ে দেয়? তুই এসেছিস, ঘর কম বলে লীলা দিদির সঙ্গে শুয়েছে।

পান্নালাল বলে, সত্যি কথা বল তো রঞ্জন, পুলিশের অনেক মার খেয়েছিস —তারই বুঝি শোধ তুলছিস বাড়িতে?

কেন, কি করলাম পুলিশের?

এখনো তাদের রাজত্ব—তাই পুলিশকে না পেয়ে পুলিশের এক যে অবোলা মেয়ে পেয়েছিস মুঠোর মধ্যে—তার উপরে যত জুলুম।

লীলা? রঞ্জন হো-হো করে হেসে উঠল। বলে, বিশ্বাস কর ভাই, কিচ্ছু হুকুম করি নি তাকে। সমস্ত সে নিজের ইচ্ছেয় করে।

তোর করে, তোর গুরুদেবটিরও করে?

গুরুদেব? রঞ্জন বুঝে উঠতে পারে না। কার কথা বলছিস?

চোখে পিচুটি-পড়া মৎস্যবিলাসী ঐ যে মহাপ্রভুটি জুটিয়েছিস। যে রকম নিষ্ঠা তোদের, ও-লোক গুরুঠাকুর না হয়ে যায় না।

হেসে বলে, দেশোদ্ধার ছেড়ে এখন প্রাণায়াম ধরেছিস ঠেকছে। অতঃপর আশ্রমে পালাবার পালা। দেখছি কি না, এ পোড়া দেশে শেষ অবধি সকল উৎসাহ নির্বিকল্প সমাধিতে উপে যায়।

রঞ্জন জবাব দেয় না, ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর বলল, পরিচয় জানলে এসব বলতিস না তুই।

গলা অত্যন্ত খাটো করে বলল, কাউকে বলিস না—উনি সূর্যকান্ত।

সূর্যকান্ত মানে—

রঞ্জন গভীর কণ্ঠে বলে, হাঁ—তিনিই। বাবার সাজানো সংসারে যিনি ফাটল ধরালেন। গতিক দেখে তাড়াতাড়ি তাই আমার বিয়ে দিলেন বিশেষ করে খুঁজে পেতে ঐ পুলিশের মেয়ের সঙ্গে। অর্থাৎ কাঠে ঘুন ধরবার মতো

হলে সাবধানী সংসারী মানুষ যেমন আলকাতরা মাখিয়ে দেয়। ঠেকাতে পারলেন না অবশ্য, শ্বশুরের সঙ্গেই একদিন মুখোমুখি ঝগড়া করে বেরিয়ে পড়লাম সূর্যকান্তর পিছু পিছু।

পান্নালাল এত সব শুনছে না। তার মনে বিদ্যুতের মতো খেলে গেল এক রাত্রির চকিত স্মৃতি। জীবনে একটিবার সূর্যকান্তকে নয়—তাঁর ছায়া সে দেখেছে। হস্টেলে থাকত সে আর রঞ্জন। এক ঘরে পাশাপাশি। গভীর রাত্রে রঞ্জনের ঘুসি খেয়ে সে লাফিয়ে উঠল। কানের কাছে মুখ এনে রঞ্জন বলল, সূর্যকান্ত—

উঠানে তাকিয়ে দেখল, জমাট অন্ধকারে তৈরি দীর্ঘ-মূর্তি, একখানা হাত ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন।

কি বলতে যাচ্ছিল পান্নালাল। রঞ্জন তর্জন করে উঠল, চুপ!

এক গ্লাস গরম জলের দরকার।

চোরের মতো টিপিটিপি রান্নাঘরে গিয়ে নারিকেল-পাতা জ্বেলে পান্নালাল অনেক কষ্টে জল গরম করে আনল। বাহান্ন মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছেন, ঘোড়া আর পেরে উঠছে না—কিন্তু সূর্যকান্ত পারবেন। গরম জল খেয়ে তখনই সেই মাঘমাসের শীতে অন্ধকারে এবার তিনি পায়ে হেঁটে চললেন। আর মাত্র মাইল কুড়িক বাকি আছে। চলা নয়—দৌড়চ্ছেন সূর্যকান্ত। ঘোড়া আর কত বেগে ছুটতে পারে?

পান্নালাল বলল, সূর্যকান্ত মরে গেছেন শুনেছিলাম।

রঞ্জন সায় দিল। তা মরেছেন বই কি! দেখলি তো, মরা মানুষ নন উনি? একটু থেমে বলে, তবু আলো খুঁজে পাই মৃতদেহ যত্ন করে আগলে রেখে। কিন্তু চোখ ধাঁধানোর আলো যে ওঁদের! ভুল-পথে নিয়ে চলছিলেন।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে রঞ্জন বলে, ছি-ছি—কি বলিস তুই পান্নালাল?

তা ছাড়া কি? সূর্যকান্ত—যিনি ডাকাতি করেছেন, গুপ্ত-সমিতিতে নিয়ে

এসে ছেলেদের মাথা গুলিয়ে দিতেন, মনিহারি দোকানের আড়ালে অস্ত্র যোগাতেন দলের মধ্যে—

রঞ্জন বলল, ওঁদেরই পথে আজও চলেছি সকলে।

অহিংসা-বাদী নৈষ্ঠিক গান্ধীভক্ত এই রঞ্জনেরা—নির্মম নির্যাতনের মধ্যে কি প্রশান্তি পান্নালাল কতদিন স্বচক্ষে দেখেছে! অবাক হয়ে সে রঞ্জনের কথার পুনরাবৃত্তি করে, ওঁদেরই পথে চলেছ—ওঁদেরই রক্তাক্ত পথে?

রঞ্জন বলল, স্বাধীনতা অস্ত গেছে রক্তের সমুদ্রে। উদয়-পথও তার রক্ত-সমুদ্রে ভাই।

তোরাও চাস, দেশের লক্ষ লক্ষ ঘর-গৃহস্থালি রক্ত-বন্যায় ভেসে যাবে?

শান্ত কণ্ঠে রঞ্জন বলল, আমরা চাই, লক্ষ লক্ষ মরা গৃহস্থালি রক্তস্পন্দনে নেচে উঠবে।

একটু স্তব্ধ থেকে বলে, সেই রক্ত-ধারার ভগীরথ হলেন সে যুগের সূর্যকান্ত থেকে আজকের গান্ধীজি এবং যাঁরা যাঁরা আত্মবলি দিচ্ছেন সকলে। হিংসা থেকে অহিংস নীতিতে পৌঁচেছি, কিন্তু পথ একটাই—সাহস ও বীরত্বের পথ, দুঃখ ও লাঞ্ছনার পথ, নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার পথ।

বাতাসের দাপটে বিষম জোরে জানলা খুলে গেল।

লীলা ডাকছেন, ত্রস্তকণ্ঠে প্রাণপণ চেঁচাচ্ছেন, সর্বনাশ—বাইরে এস গো। বান ডেকেছে—

বেরিয়ে দেখে, সে কি প্রলয়-দৃশ্য! বাঁধ ভেঙেছে। রাত্রির অন্ধকার বিচলিত করে প্রমত্ত বেগে স্রোতের পর স্রোত আসছে। হাহাকার শোনা যাচ্ছে নিকটে দূরে।

রঞ্জন হতভম্ব হয়ে ছিল মিনিটখানেক। লীলার আর্তনাদে তার সংবিৎ ফিরল।

দাদুর কি করবে কর শিগগির। সময় নেই।

রঞ্জন বলে, চলে আয় রে পান্নু। আমার কাঁধে ওঁকে তুলে দিবি। রাহাদের দোতলা বাড়ি—সেখানে নিয়ে তুলব ?

আর জিনিসপত্তোর, গোরু-বাছুর ?

লীলা আর দিদি যা পারেন করবেন। আয়—আয় তুই—

সজোরে সে হাত ধরে টানল পান্নালালের।

উঠোন দিয়ে দ্রুত ছুটেছে। হাঁটুজল এরই মধ্যে। বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে ভাল ঘরখানিতে সূর্যকান্ত নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছেন, এত তোলপাড়েও চেতনা নেই। ছাপ-বাক্স টেনে এনে হুড়কো-ভাঙা দরজাটা কায়েমি ভাবে বন্ধ করা হয়েছে, আর এখন ছাট আসছে না। শিয়রে আলো জ্বলছে। সেই আলোয় দেখা গেল লীলার অবস্থা। জলে কাদায় মাখামাখি—সে কি শঙ্কিত চেহারা ! সূর্যকান্তকে ব্যাকুল হয়ে ডাকছেন, দাদু, জাগুন। ভাল জায়গায় যেতে হবে। ও দাদু—

চোখ মেলে উঠে বসলেন সূর্যকান্ত।

রঞ্জন বলে, কাঁধে আসুন আমার। এ পাশে আয় দিকি পান্নু, বেশ জুত করে তুলে দিবি। সামাল, খুব সামাল—

রুক্ষদৃষ্টিতে সূর্যকান্ত এক নজর পান্নালালের দিকে চেয়ে চাদর-ঢাকা যেমন ছিলেন, স্থির হয়ে বসে রইলেন তেমনি।

লীলা ব্যাকুল হয়ে বললেন, হল কি দাদু ? জল যে ঘরে এসে পড়ল।

হুঁ ! গাঙের জল কখনো ঘরে ঢোকে ?

বলে সূর্যকান্ত আরাম করে আবার শোবার উদ্যোগ করলেন।

তাঁর চোখে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন লীলা। পান্নালালকে বললেন, আপনি যান তো। একা একা দিদি কি করছেন, তাঁকে সাহায্য করুন গে।

পান্নালাল কান দিল না। রঞ্জনকে বলে, একা তুই পেরে উঠবি নে রঞ্জন। বড্ড জলের টান, দু-জনে থাকি। আমি নিয়ে যাই যতদূর পারি, তারপর তুই। কি বলিস ?

রঞ্জনের অতি নিকটে এসে কানে কানে অনুনয় করে, তুলে দে ভাই আমার কাঁধে। কোন্ দেশান্তরে চলে যাব, এ ভাগ্য হয়তো হবে না কোনদিন—

কঠোর কণ্ঠে লীলা বললেন, না-না, আপনি যান—বাইরে যান। যান—

পান্নালালের রাগ হয়ে গেল।

যাব না। কক্ষনো না। অজানা জায়গা, পথঘাট চিনি নে, বানের মুখে পড়ে মারা পড়ব নাকি?

দৃষ্টিতে আগুন ছড়াচ্ছে সে লীলার দিকে। রঞ্জন তাড়াতাড়ি তার হাত জড়িয়ে ধরে।

এস ভাই, চল—

বাইরে এসে রঞ্জন বলে, তুই থাকলে যে মারা পড়বেন এই জায়গায়। কারো ক্ষমতা নেই, সূর্যকান্তকে নড়াতে পারে।

পান্নালাল বলে, আমার অপরাধ?

মাথা খারাপ, কিন্তু ওঁর লজ্জাবোধ টনটনে রয়েছে। পা নেই, বাইরে এ খবর জানতে দেবেন না। মরে গেলেও নয়।

পান্নালাল স্তম্ভিত হয়ে যায়। পা নেই?

শীতার্ত অন্ধকারে দৃঢ় দুটি পা ফেলে ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, অনেক-কাল আগেকার সেই ছবি সে স্পষ্ট চোখে দেখছে।

রঞ্জন বলছিল, গুলি খেয়েছিলেন। পা কাটতে হল। মাথাও খারাপ হয়ে ছেলেমানুষের মতো হয়ে গেছেন সেই থেকে। দেখছিস না—লীলা প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে। হয় তো বা ওরই বাপের কীর্তি। সূর্যকান্ত গেলে জামাই ঘর লাগবে, মেয়ের জীবনে সুখশান্তি আসবে, এই আশায়।

রাহাদের দোতলায় সূর্যকান্তকে মোড়ার উপর বসিয়ে দিয়েছে। লোকারণ্য। পৃথিবীতে মহাপ্রলয় এসেছে যেন। রঞ্জনের সর্বস্ব ভেসে গেছে, দিদি এখন আর আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছেন না, বাইরের দিকে চেয়ে বারম্বার চোখ

মুছছেন। করাল স্রোত ঝিলিক দিচ্ছে অন্ধকারে। রঞ্জন আর লীলার ওদিকে খেয়াল নেই—সূর্যকান্তর শীত না লাগে, তিনি যেন আতঙ্কিত না হন কোন রকমে—এই নিয়ে ব্যস্ত। লীলা তাঁর চুলের ভিতরে আঙুল চালাচ্ছে, হেসে হেসে মৃদু কণ্ঠে কি বলছে যেন। আশ্রয়চ্যুত নিঃস্ব নরনারীর হাহাকারের মধ্যে মোড়ার উপর বসে নিশ্চিত নির্লিপ্ত সূর্যকান্ত—যেন পাষাণীভূত। চাদর ঢেকে বসে আছেন, ঠিক যেন একজোড়া পা রয়েছে চাদরের নিচে। পান্নালাল উপুড় হয়ে সেই পায়ের কাছে প্রণাম করল।

(৩)

সকালের আলোয় যে দৃশ্য দেখল, তাতে পান্নালালের আর তিলার্ধ থাকতে ইচ্ছা করে না এ অঞ্চলে। কিন্তু পালাবে কি করে? সাঁকো-পুল সমস্ত ভেসে গেছে, এত গাছ উপড়ে পড়েছে যে অসম্ভব রাস্তায় চলাচল করা। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক-বন্ধন ছিঁড়ে গেছে এই অঞ্চলের। আশ্রয় নিতে এসেছিল রঞ্জনলালের বাড়ি, সে বাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। দুদিন পরে দিদি গিয়ে গলা-কাটা কবুতরের মতো গড়াতে লাগলেন শূন্য ভিটেয় মুখ থুবড়ে পড়ে। নিঃসম্বল রঞ্জনলাল—সপরিবারে আছে রাহাদের বাড়ি। আরও কদিন পরে রাহারা যখন বিদায় দেবেন, তখন গাছতলাও নেই—পঙ্কিল মাঠের উপর ফাঁকা আকাশের তলায় সংসার পাততে হবে। এই এক বিচিত্র ব্যাপার পান্নালাল ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে, আশ্রয়ের লোভে যখনই সে কোন দিকে হাত বাড়ায়, একটা বিপর্যয় ঘটে যায় সঙ্গে সঙ্গে। উমার সঙ্গে যেবার বিয়ের পাকাপাকি হচ্ছে, সেবারই তাকে নির্বাসনে নিয়ে রাখল রাজসাহীর এক গ্রামে। বিশ্রাম তার কোনদিন কি ভাগ্যে হবে না—এক যখন জেলে থাকে, সেই সময়টা ছাড়া? কিন্তু জেলও বড় একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, ভাল লাগে না। এত বড় পৃথিবীর কোনখানে কারাগারের বাইরে একটু শান্তির জায়গা হবে না তার জন্যে?

দিন পাঁচ-সাত পরে কানে আসতে লাগল নানা ভয়ানক খবর। সাইক্লোনে উজাড় হয়ে গেছে দেশ-দেশান্তর—বিশেষ করে মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগনার বহু অঞ্চল। ঘর-বাড়ি খাদ্য-বস্ত্র খাবার জল পর্যন্ত নেই। অথচ খবরের কাগজে না রাম না গঙ্গা—টুঁ শব্দটি হচ্ছে না এত বড় সর্বনাশের; দুসপ্তাহ পরে একটু-আধটু বেরুল। এ নাকি সামরিক সতর্কতা। শোনা গেল, একদল সেবাব্রতী গিয়ে নাজেহাল হয়ে ফিরে এসেছেন; থানায় আটকে রেখেছিল—'বাপ' 'বাপ' বলে ফিরতি-টিকিট কিনে বাঁচেন তাঁরা। গোরু, ছাগল আর মানুষের মৃতদেহ পচে দুর্গন্ধ হয়েছে, শিয়াল-শকুনে খেয়ে শেষ করতে পারছে না। নৌকাগুলোও থাকত যদি এ সময় কত লোক ভেসে বেড়াতে পারত, কত পরিবার বাঁচত!

পান্নালাল পালাচ্ছে। স্টেশনের সেই মেয়েটির মুখ মনে পড়ে, পালান—ছুটে পালান জোর-পায়ে—

এখন সে পালাচ্ছে পুলিশের ভয়ে নয়। শ্মশানের বিভীষিকা চোখের উপর। রাতে ঘুম নেই, আকাশ-বিদারী আর্তনাদ ঘুমুতে দেয় না। সেই রাত্রে যা শুনেছিল, কানের কাছে তাই যেন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় রাত্রি হলেই! ভাতের থালার সামনে বসে মনে পড়ে যায়, অর্ধেক শিয়ালে-খাওয়া উলঙ্গ-দাঁত শবগুলি—মাঠে-ঘাটে খানাখন্দে যা পড়ে থাকতে দেখেছে। মুখে আর ভাত তুলতে পারে না।

পালিয়ে যাবে সে দূরে, অনেক দূরে—যেখানে এই অঘ্রাণে পচা ধানগাছে পঙ্কিল নিঃসীম শূন্য মাঠ দেখতে হবে না। সোনালি ধানে যে অঞ্চলে ক্ষেত ভরতি, ঘরে ঘরে মাচার উপরে ডোল ভরতি, পূজো-পার্বণ বিয়ে-থাওয়ার ঢোল বাজছে এপাড়া-ওপাড়ায়।

আছে কি এমন কোন জায়গা দুর্যোগের ছোঁয়া লাগে নি—আগস্টের ভারতব্যাপ্ত তাণ্ডব আর এই সাইক্লোনের আক্রোশ পৌঁছয় নি যেখানে? বাংলাদেশের সন্তুষ্ট শান্ত পল্লী যা ঝলমল করছে পান্নালালের ছেলেবয়সের স্মৃতিতে—বেঁচে আছে কোথাও আজো?…

ঘুরতে ঘুরতে পান্নালাল জলমার বহু-বিখ্যাত হাটখোলায় এসে পৌছল। হাটবার, হাট জমেছে। এমন আশ্চর্য কাণ্ড কেউ শুনেছ, মানুষ বিক্রি হয় এই তেরো শ উনপঞ্চাশ সনেও? মাছ-শাক-তরকারির মতোই দস্তুরমতো মানুষ বিক্রি।

কালীবাড়ির পিছনে বিস্তীর্ণ হাট। লম্বা চাটাই পাতা, তার উপর জোয়ানগুলো সারবন্দি বসে আছে। এদেরই জন্য খদ্দের আসছে দূর-দূরান্তর থেকে। ঘাটে নৌকো রেখে ঘুরে ঘুরে তারা মানুষ পছন্দ করে বেড়ায়।

উঠে দাঁড়াও গো ভালমানুষের ছেলে। একটুখানি হাঁটো দিকি।

ভদ্রলোকের ঘরে মেয়ে দেখানো আর কি!

দর কত? ঠিকঠাক বলে দাও বাপু, ফাঁকাফুকো বোলো না।

যে লোকটা বিক্রি হতে এসেছে, ভেবেচিন্তে সে বলল, দেড় কুড়ি টাকা আর তিন শলি ধান—

দেড় কুড়ি? এই মাথা বাড়িয়ে দিচ্ছি, মাথায় একটা বাড়ি মার না বাপু। আমি বলি শোন। ধানের কথা যা বললে—তিন শলিই থাকল, আর টাকা না হয়—

হাত তুলে আঙুল বিস্তার করে বলে, এই পাঁচটা—নগদ—

দরদস্তুর করে যা হোক একটা রফা হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। কিষান তুলে নিয়ে একের পর এক চাষীরা নৌকো ভাসায়।

ধান পেকেছে, ধান কেটে ঝেড়ে তোলার মরশুম এখন। পনের-বিশ দিনের মধ্যে সব সারা না হলে ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। চাষীরা তাই কিষাণের চেষ্টায় বেরিয়েছে দলে দলে। ডাঙা-অঞ্চলের মানুষ ভূমিহীন কৃষক এরা— ধান কাটায় মজুরগিরি করবে বলে বছর বছর আসে এই সব অঞ্চলে। এসে এই রকম হাটে এসে বসে। এ কাজে পাওনাগণ্ডা ভাল। সকালে দুপুরে রাত্রে ভরপেট তিনটে খাওয়া আছেই, তা ছাড়া কাজ চুকিয়ে দেশে ফিরবার সময় ধান ও নগদ পাবে যার সঙ্গে যে রকম চুক্তি হল সেই অনুযায়ী। ধান

সম্বন্ধে চাষীদের কড়াকড়ি নেই। উঠোনের ইঁদুরগুলো অবধি মুটিয়ে যাচ্ছে ধান খেয়ে। ধানও যে টাকা—কার্তিক-অঘ্রানে কোন চাষীর মনে থাকে, বল? আহা, জলে কাদায় দাঁড়িয়ে ধান কাটবে, জোঁক রক্ত খাবে, হাত-পা হেজে যাবে,—বাড়ির জন্য চারটি খোরাকি ধান চাচ্ছে—তার উপরে কথা বলতে সরমে বাধে চাষীদের।

কুতূহলী পান্নালালও গিয়ে বসেছে চাটায়ের উপর ওদের মধ্যে। খরিদ্দারে সন্দিগ্ধ চোখে তার দিকে তাকায়। চেহারাতেই মালুম হচ্ছে, সে ভিন্ন দলের মানুষ। কেউ দরদস্তুর করতে আসে না তার কাছে। তখন পান্নালাল নিজেই খদ্দের ডাকে, এই যে, ইদিকে, ও মোড়ল মশাই—

শেষে একজনের হাতই ধরে ফেলল। বলে, আমায় নিয়ে যাও না কেউ।

যাকে ধরেছে সসম্ভ্রমে সে জবাব দিল, পণ্ডিত গিয়েছেন আজ্ঞে আমাদের গাঁয়ে। পাঠশালা তো বসে গেছে।

এ কাজও তো মন্দ নয়—গ্রাম্য পাঠশালার চাকর। বেমালুম মিশে থাকা যাবে চাষীদের সঙ্গে। বিশ্রাম হবে, আর দেখতে পাবে বাংলাদেশের নির্ভেজাল চেহারা। বাংলার সত্যরূপের পরিচয় নেওয়া যাবে।

তখন নিজেই সে এর তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, পণ্ডিত চাই নাকি তোমাদের? ভালো পণ্ডিত আমি—চাই?

পণ্ডিতেরা হাটে আসেন না, তাঁদের সম্ভ্রম বেশি, সোজাসুজি গ্রামে গিয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে পাঠশালা শুরু হয়ে গেছে প্রায় সর্বত্র। এই সব পাঠশালা আরও জমে উঠবে ধান কাটা শেষ হবার পর। গোলায় আউড়িতে ধান তুলে চাষীদের গায়ে তখন ষোল আনা জুত, আর অবসরও প্রচুর। বিদ্যাতৃষ্ণা অকস্মাৎ বিষম বেড়ে যায়, ছেলেগুলোকে টানতে টানতে নিয়ে তারা পাঠশালায় হাজির করে।

বিদ্যে না শিখলে চক্ষু থেকেও অন্ধ। বাড়ি বসে থেকে করবি কিরে হারামজাদারা? পড়্—লেখ্।

নিষ্কর্মা বুড়োদেরও কেউ বা পাঠশালায় এসে বলে, কয়ে র-ফলা দেখিয়ে দাও তো পণ্ডিত। আঁকড় উপরমুখো না নিচেমুখো ?

কিষাণেরা ঘরে ফিরে যায় ধানকাটার মরশুম কাটিয়ে। আর পণ্ডিতেরা ফেরেন বৈশাখের শেষে ধান যখন গোলা-আউড়ির তলায় এসে ঠেকে। নূতন চাষের জন্য ছেলে-বুড়ো-জোয়ান সকলের মধ্যে তাড়াহুড়ো পড়ে যায়। বিদ্যাচর্চা মুলতুবি থাকে আবার আগামী মরশুম অবধি। ধান খেয়ে যে ইঁদুরগুলো ঘরে উঠোনে ছুটোছুটি করত, তারাও গর্তে ঢুকে পড়ে—আর কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

চাকরি জুটল পান্নালালের, যা চেয়েছিল—পাঠশালার পণ্ডিতি! কথাবার্তা পাকা করে সে এক নৌকোয় উঠে বসল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(১)

বাংলা উনপঞ্চাশ সন শেষ হয়ে এল। ঘরে ঘরে অসুখ-বিসুখ। শোনা যাচ্ছে, খুব বসন্ত হচ্ছে ওদিককার কখানা গ্রামে। হরিহর রায় সর্বদা টিকটিক করেন, কিন্তু আদুরে মেয়েকে সামলাতে পারেন না। এই যেমন আজ কদিন ধরে পড়েছে—মাদারডাঙায় গাজনের মেলা হয়, খুব নামডাক, তিন দিন ধরে হৈ-হল্লা চলে—সুপ্রিয়া যাবে সেই মেলা দেখতে।

মেয়েছেলে যাবে ভিন্ন গ্রামে ছোটলোকের ভিড়ের মধ্যে—ছি-ছি! এ অঞ্চলে ও-সব রেওয়াজ নেই, নিন্দে রটে যাবে। হরিহর কড়া স্বরে মানা করলেন।

সুপ্রিয়া মুখ ঘুরিয়ে নেয়, ঠোঁট দুটো চেপে অশ্রু সামলাবার চেষ্টা করে।

মা-মরা মেয়ে—মনটা অমনি নরম হয়ে গেল হরিহরের। বলেন, শুনেছ তো—মা শীতলার অনুগ্রহে চারিদিক উজাড় হয়ে যাচ্ছে। সেই সব জন্যে বলি। নইলে লোকে কি বলল আর না বলল, কি যায় আসে? এখানকার মানুষ নই তো আমরা!

ইদানীং ভারি একটা সুবিধা, পান্নালালের সঙ্গ পাওয়া যাচ্ছে। সেই দুর্বাসা মুনিটি এখন পাঠশালার নিরীহ পণ্ডিত। পাঠশালা মাদারডাঙায়। গোড়ায় সেখানকার বারোয়ারী বটতলায় বসত; দৈবাৎ যদি বৃষ্টি হত, সেদিন পাঠশালার ছুটি। এদিককার মরশুমি পাঠশালাগুলোর রীতিই এই। কিন্তু তালুকের মালিক স্বয়ং গ্রামে এসে রয়েছেন, ইস্কুলের কোন ভাল ব্যবস্থা করা যায় কিনা—এই দরবারে একদিন পান্নালাল ও কয়েকটি ছোকরা এসেছিল

বাঁকাবড়শিতে। হরিহর রায়কে চিনতে পারল তখন, সুপ্রিয়াকেও দেখল।

দরবার করতে এসে আশাতীত ফল ফলেছে। হরিহর খুব আগ্রহ দেখাচ্ছেন এই সম্পর্কে। বড় রাস্তার ধারে ইতিমধ্যেই ইটের দেয়াল-দেওয়া এক খোড়ো দোতালা তৈরি করে দিয়েছেন। এক পাঁজা ইট পুড়িয়ে ওরই পাশে গোটা তিনেক পাকাকুঠুরি করে দেবেন, খেলার মাঠ হবে, এই পাঠশালাই মাইনর ইস্কুলে উন্নীত হবে, ইস্কুলটা হবে তাঁর স্বর্গীয় মায়ের নামে—কিছুকাল থেকে গ্রামোন্নতির যে সব পন্থা হরিহর ভাবছেন, সমস্ত ব্যক্ত করেছেন, পান্নালালের কাছে। চাষার ঘরের ধান ফুরোবার সঙ্গে সঙ্গে মাদারডাঙার পাঠশালা উঠে যাবে না এবার—বারো মাস চলবে। এতকাল ছেলেদের মাইনে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল টাকা-পয়সায় নয়—ধান-চাল দিয়ে; সে নিয়ম হরিহর রায় রদ করে দিয়েছেন। কোন ছাত্রের মাইনে দিতে হবে না, তিনিই খরচ চালাবেন। লোকে শুনে ধন্য-ধন্য করছে। বড়লোকেরা গ্রামে এলে কত সুবিধা পাওয়া যায় এই রকম!

স্বদেশি বলে হরিহরের আর শঙ্কা নেই পান্নালালের সম্বন্ধে। জেলের ঘানি ঘুরিয়ে মনের গরম জুড়িয়ে গেছে, দজ্জাল কালকেউটে নির্বিষ ঢোড়া হয়ে ফিরেছে। নইলে পণ্ডিতি করতে আসবে কেন এত রকমের কাজ থাকতে? এই পণ্ডিত-মাস্টারের কাজ যাদের, আগে ভাগে তাদের বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকে তো ভাল—, নইলে টের পেলে কেউ মেয়ে দিতে চায় না—তা মেয়ে যত সুলভই হোক না কেন বাংলাদেশে।

পান্নালালের প্রায়ই নিমন্ত্রণ হয় হরিহরের বাড়িতে। পাঠশালা-ঘরে সে শোয়, ঘরের দাওয়ায় হাত পুড়িয়ে দুবেলা রান্না করে। নিমন্ত্রণ পেলে তার আনন্দ হয়। জনতার দাবি থেকে বহু দূরে বিশ্রামের জন্য পালিয়ে আছে, আরাম চাই—খুঁটিনাটি বাছবিচার করবে না দীর্ঘ কুড়ি বছরের মধ্যে ছুটির এই কটা দিন। হরিহর তার সঙ্গে ডাক্তারখানা, টিউব-ওয়েল, পাকারাস্তা

আর ইস্কুল সম্বন্ধে পরামর্শ করেন। খুশী হয়ে মনে মনে তিনি আঁচ করে রেখেছেন, বিদ্যা-দানে একমুখী নিষ্ঠার জন্য পান্নালালের পাঁচটাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবেন আগামী মাস থেকে।

খুশী হবার কারণ আছে আরও। অনুপমের চিঠিতে বড় ভাল খবর রয়েছে। বাইশে ডিসেম্বর সেই যে বোমা পড়েছিল কলকাতায়, তারপর থেকে সমস্ত ঠাণ্ডা। এত আন্দোলন-আলোচনা হচ্ছিল বোমা নিয়ে, কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটা বড় রকমের পটকা-ফাটার চেয়ে হয়তো কিছু বেশি। পর্বতের মূষিক-প্রসব। গ্যাসপোস্ট দু-একটা ছেঁদা হয়েছে, প্রচুর কাচ ভেঙেছে, মহিষ ও মানুষ মরেছে গুটিকয়েক, পার্কে আর রাস্তায় গর্তও হয়েছে দু-দশটা। ব্যস—এদের তাড়া খেয়ে সেই যে বোমাওয়ালারা পালিয়েছে, আর কোনদিন হয় নি এমুখো। শহরে মানুষ-জন ফিরে আসছে, লোক-চলাচল বেড়েছে রাস্তায়। হরিহরের পাঁচটা বাড়ির মধ্যে দুটোর ভাড়াটে জুটে গেছে ইতিমধ্যে। কম ভাড়া অবশ্য—তা হলেও জুটছে তো!

অনুপমকে হরিহর লিখেছেন, পত্রপাঠ মাত্র চলে আসবার জন্য। তার মুখে সবিস্তারে শুনে এবং আলোচনা করে সম্ভব হয়তো এবার এক সঙ্গেই সকলে কলকাতা ফিরবেন। আতঙ্ক গা-সহা হয়ে গেছে। তার উপর এইসব খবরে অনেকটা স্বস্তি পেয়েছেন হরিহর। আর কি—ইংরেজ ধাক্কা সামলে নিয়েছে। অর্ধেক-পৃথিবী জুড়ে যাদের রাজ্য, জাপানিরা এইবার টের পাবে তাদের প্রতাপ। সম্ভব হয় যদি, সুপ্রিয়ার বিয়েটা হয়ে যাক সামনের বৈশাখে। বুড়ো হয়েছেন, কবে মারা যাবেন—মেয়েটার একটা গতি না করা পর্যন্ত মনে শান্তি নেই। অনুপমকে চেপে ধরতে হবে, কোন অজুহাত শোনা হবে না এবার। আর ওদিকে বর্মার কারবার তো একেবারে গেছে, কলকাতারটা ঝিমিয়ে আছে, ফিরে গিয়ে জাঁকিয়ে তুলতে হবে কলকাতার ব্যবসা। যত দেরি হবে, ততই লোকসান।

তা বলে গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক তিনি ছাড়বেন না কোনদিনই। আজকেও

পান্নালালের নিমন্ত্রণ। চড়কের জন্য পাঠশালার ছুটি, তাই সে বেলাবেলি এসে গেছে। নানারকম যুক্তি-পরামর্শ হচ্ছে। তিনি চলে যাবেন, সুপ্রিয়াও যাবে। ভরসা আছে, তাঁদের অনুপস্থিতিতে পান্নালাল এ সমস্তর ভার নিতে পারবে। ইংরেজ তাড়ানোর বেয়াড়া কথাবার্তা এবং জেল-পুলিশ ইত্যাকার হাঙ্গামাগুলো যদি বাদ দিয়ে চলে, তা হলে স্বদেশি লোকগুলোকে দিয়ে সত্যি কাজ পাওয়া যায়।

চঞ্চল পায়ে সুপ্রিয়া এসে ডাকল, বাবা—ও বাবা—

হরিহর বলেন, আর দেখ বাপু, এই এক মুশকিল। তোমাদের ঐ গাঁয়ে গাজনের মেলা হচ্ছে, পাগলী মা ক্ষেপে উঠেছে—মেলা দেখতে যাবে।

সুপ্রিয়া আবদারের সুরে বলে, আজকেই—

বিব্রত ভাবে হরিহর বললেন, সে কি! বেলা পড়ে এসেছে—

হাসির হিল্লোলে সুপ্রিয়া বাপের আপত্তি উড়িয়ে দিল।

তুমি বাবা কি রকম যেন! দিল্লি-লাহোর যাচ্ছি নাকি? যেতে আসতে কতক্ষণ লাগবে!

কাছে এসে আহ্লাদি মেয়ে বাপের গলা জড়িয়ে ধরে। বলে, তিন দিনের মধ্যে আজকেই জমজমাট সব চেয়ে। যাই বাবা, কি বল?

হরিহর তবু বলেন, গাড়ি-পাল্কি কিছু ঠিক হয় নি। যাবি কিসে?

সুপ্রিয়া হেসে বলে, রক্ষে কর। যা এখানকার পাল্কি আর গোরুর গাড়ি—গোলাকার হয়ে বসতে হয়।

দাসুকে জিজ্ঞাসা করে, ও দাসু, কদ্দূর রে? মাঝ-ঝিলে ঐ যে সব খেজুরগাছ দেখা যাচ্ছে—ঐ তো?

দাসুকে হামেশাই মাদারডাঙায় যেতে হয়। কতবার পান্নালালকে ডাকতে গিয়েছে। সে বলল, গাছ ছাড়িয়ে আরো যেতে হবে দিদিমণি!

হোকগে। হেঁটে যাব—হাঁটতে আমি খুব পারি। উড়ে চলে যাব দেখিস।

শেষ পর্যন্ত হরিহরকে মত দিতে হয়। পান্নালালকে বলেন, তুমিও যাও বাবা, একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এস। তোমার সঙ্গে গেলে নির্ভাবনায় থাকব। আসানসোলে যা করেছিলে—

সুপ্রিয়া বলে, ওঁকে পাচ্ছি বলেই তো যেতে চাচ্ছি আজকে অত করে। ওখানে থাকেন, ভাল করে সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারবেন।

যাবার মুখে হরিহর আবার সতর্ক করে দেন, বেলাবেলি ফিরবি কিন্তু খুকি।

পান্নালালকে বললেন, মেঘ-মেঘ করছে আকাশে। যে জন্য ডেকেছিলাম, কিস্সু তো হল না। বিস্তর কথাবার্তা আছে—দেরি কোরো না তোমরা।

যাব আর আসব বাবা—

বাপকে নিশ্চিন্ত করে সুপ্রিয়া রওনা হল পান্নালালের সঙ্গে। দাসুও টেরি কাটছিল। কিন্তু না—দরকার কি? গেলে অসুবিধা হবে, কর্তার চা করে দেবে কে?

পান্নালাল দেখাচ্ছে, জেলেপাড়া এটা—আর ওদিকে উ-ই আমার অট্টালিকা। ছুটির দিন বলে দেখাতে পারলাম না, একেশ্বর সম্রাট্ আমি এই সাম্রাজ্যে।

চালে-চালে বসত জেলেদের। তারই প্রান্তে নূতন চুনকাম-করা পাঠশালা-ঘর বিকালের পড়ন্ত আলোয় ঝকমক করছে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে সুপ্রিয়া বলে, বাঃ বাঃ—চমৎকার তো! ছবি যেন একখানা।

পান্নালাল বলে, তা সত্যি। বিশ্রামের জায়গা এতকাল ছিল এক জেলখানা। নতুন বলে আমারও চমৎকার লাগছে; মুখ বদল করে দেখা যাচ্ছে, এ-বিশ্রামই বা কি রকম!

কালীতলায় মেলা বসেছে। বট অশ্বত্থ নিম ও কয়েকটা আমগাছ জায়গাটাকে ছায়াচ্ছন্ন করেছে। সুপ্রিয়া মশগুল হয়ে গেল। মাটির পুতুল, রকমারি বাঁশী, লোহার হাতা-খুন্তি-বঁটি, চিত্র-বিচিত্র হাঁড়ি-সরা, কদমা-বীরখণ্ডি

চিনির আতা—কিনছে তো কিনছেই। কি কর্মে লাগাবে এই সমস্ত, আর কে-ই বা নিয়ে যাবে—

পান্নালাল বলে, আসুন, ফেরা যাক—

একদিকে সামিয়ানা খাটানো। সারি সারি কলার তেউড় বসাচ্ছে তার নিচে। প্রতি তেউড়ের মাথায় এক একটা সরা।

মেলার একজনকে ডেকে সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করে, এখানে কি?

কবি-গানের পাল্লা হবে দুই দলে। মুখে মুখে ছড়া কেটে এ ওকে ফাঁদে ফেলবে, ফাঁদ কেটে বেরিয়েও আসবে ক্ষমতার জোরে।

ভাল মজা তো! কখন হবে গান?

রাত্রে—

মুখ শুকনো করে পান্নালালকে সুপ্রিয়া বলে, রাত্রি অবধি তো থাকা চলে না। কি বলেন মাস্টার মশায়? বাবা খুব ভাববেন তা হলে—

পান্নালাল বলে, চলুন, চলুন,—যাই এবার। সন্ধ্যে হয়ে এল। মেঘ হয়েছে, বৃষ্টি হবে হয়তো।

চড়কগাছ ঘুরছে বনবন করে। আর ওদিকে নাগরদোলা। পান্নালালের কথার জবাব না দিয়ে বাইশ বছরের ছোট খুকিটির মতো সুপ্রিয়া ছুটল সেদিকে। ভিড় জমেছে, জুতো-পরা সুশ্রী মেয়েটার কাণ্ড দেখে মানুষ-জন তাজ্জব হয়ে যাচ্ছে।

বিরক্ত হয়ে পান্নালাল বলে, কথা মোটে কানে নিচ্ছেন না। বৃষ্টি এল বলে, দেখছেন?

ভিজব মাস্টারমশায়, ভিজব। খু-উ-ব মজা লাগে ভিজতে।

অবহেলা ভরে ঘাড় ফিরিয়ে যে-লোকটা নাগরদোলা চালাচ্ছে তাকে বলে, থামাও—আমি চড়ব।

এক লাফে একটা খোপে উঠে বসল। পান্নালালকেও ডাকে, আসুন—আসুন না—

পান্নালাল বলে, পাগল হই নি তো। গ্রামের পণ্ডিত—কত সম্ভ্রম আমার এখানে!

বটে! তড়াক করে নেমে সুপ্রিয়া তার হাত ধরে ফেলল।

চড়তে হবে—হবেই—

টপ-টপ করে বড় বড় ফোঁটা পড়ল। সেই সঙ্গে বাতাস। বড় বাদাম-গাছটার পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ছে। বৃষ্টি—বৃষ্টি—মুষলধারে বৃষ্টি। কয়েকজনে সামিনার দুই কোণের দড়ি তাড়াতাড়ি খুলে দিল; এতে কম ভিজবে জিনিসটা। মেলার জন্য অস্থায়ী চালা বাঁধা হয়েছে। যেখানে দশ জনের জায়গা, পঞ্চাশ জন মাথা ঢুকিয়েছে সেখানে। রশিখানেক দূরে চাষীপাড়া, কলাবনের আড়ালে খড়ের চাল দেখা যাচ্ছে। এরা ছুটল সেদিকে।

(২)

গিয়ে উঠল এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ি। টিনের ঘর, দুটো গোলা পাশাপাশি। বাইরের দিককার দাওয়ায় তারা উঠেছে। মাটির দেয়াল দিয়ে অন্তঃপুর আলাদা করা। খানিকটা জায়গায় দেয়াল নেই, বর্ষা এসে পড়ায় দেয়াল দেবার অবকাশ হয় নি হয়তো। সেখানটায় সুপারি-পাতার বেড়া। পান্নালাল বলে, দ্বারিক সর্দারের নিশ্চয় নাম শুনেছেন। তার বাড়ি এটা। বিষম মানী চাষীদের ভিতর। মেয়েদের সূর্যের অগোচরে না হোক, মানুষের চোখের আড়ালে রাখবেই।

কাপড়-চোপড় ভিজে জবজবে, মাথা দিয়ে জল গড়াচ্ছে। দ্বারিক গামছা হাতে ছুটতে ছুটতে এল। জলচৌকিটা ঝেড়ে দিয়ে বলে, এস মা, এস পণ্ডিতমশায়, মাথার জলটা মুছে ফেল আগে। কি করা যায়। আমাদের ঘরের কাপড় তোমাদের দিই কেমন করে?

সুপ্রিয়া বলে, একটুখানি ভিজেছে। ও গায়ে-গায়ে শুকিয়ে যাবে।

দ্বারিকের তবু সোয়াস্তি নেই। শীত করছে, আগুন পোহাবে মা? আনব আগুনের মালসা?

সুপ্রিয়া হেসে তাড়া দেয়, আপনি ঘরে যান দিকি। কিছু লাগবে না আমাদের।

মাঝে মাঝে বৃষ্টিটা একটু কমে, এরা যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়, তখনই আবার চেপে আসে। মেঘান্ধকার, বিদ্যুৎ-চমক, টিনের চালে জলপড়ার আওয়াজ—চারিদিক তোলপাড় করে তুলেছে।

আলাপটা ভাল জমল কার্তিককে দেখে। উল্লসিত হয়ে সুপ্রিয়া বলে, তোমাদের বাড়ি—এ তো নিজেদেরই জায়গা। কতদিন আসব-আসব করি। বাবার জ্বালায় নিজের গাঁয়ে বেরোবার জো নেই, এ তো ভিন্ন গ্রাম। ভেবেছিলাম মেলার ভিতর দেখা হয়ে যাবে, তা বৃষ্টিই এনে তুলেছে তোমাদের এখানে।

মুচকি হেসে কার্তিককে জিজ্ঞাসা করে, তারপর?

লজ্জিত কার্তিক মুখ নিচু করল।

সুপ্রিয়া বলে, খবর রাখি গো—বিয়ে-থাওয়া হয়ে গেছে। আমরা নেমন্তন্ন পেলাম না। তোমাদের সঙ্গে কথা বলব না তো—না তোমার সঙ্গে, না সেই দুষ্টুটার সঙ্গে।… বউ এখানেই তো, না বাপের বাড়ি?

ঘাড় নেড়ে কার্তিক তাড়াতাড়ি সরে পড়ে। একটু পরে জল ছপ-ছপ করতে করতে উঠান পার হয়ে এসে খবর দেয়, রান্নার যোগাড় হয়ে গেছে। আসুন।

রান্না? ভালো রে ভালো—রান্না এখন কে করতে যাচ্ছে?

উপোস করে থাকবেন, সে হবে না।

পান্নালাল বলল, বৃষ্টি থামলেই আমরা চলে যাচ্ছি। আমার আবার নেমন্তন্ন ওঁদের বাড়ি। তোমরা খাওয়া-দাওয়া করগে যাও—

হঠাৎ দ্বারিক বেরিয়ে আসে। যেন আগের মানুষ সে নয়। হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, নাম তোমরা দাওয়া থেকে। নেমে যাও পণ্ডিত—

পান্নালাল অবাক হয়ে বলে, এই বৃষ্টির মধ্যে ? সে কি ?

ছেলে-পিলে নিয়ে ঘর করি। ভিটেয় উপোস করে পড়ে থেকে অকল্যাণ ঘটাবে ?

সুপ্রিয়া করুণ চোখে তাকাল কার্তিকের দিকে ; চুপি চুপি কার্তিক বলে, বাবার রাগ খারাপ—রাগের মাথায় সব করতে পারে।

যে রকম তেড়ে এসেছে, এর পর তর্ক করলে ঘাড় ধরে উঠানে নামিয়ে দেবে—নিতান্ত অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। সুপ্রিয়া ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল। দ্বারিকের দিকে তাকিয়ে বলল, যাচ্ছি কর্তা, যাচ্ছি। এক্ষুনি গিয়ে রান্না চাপাব।

পান্নালাল নির্বিকার, টিপিটিপি হাসছে মনে হয়।

দ্বারিক চলে যেতে সুপ্রিয়া বলে, ভারি বেয়াড়া মানুষ তো ! টুঁটি চেপে ধরে আতিথ্য করবে, এ কি বিপদ ! আর একদিন হয়েছিল কেদার মোড়লের ওখানে, সে-ও নাছোড়বান্দা। সবাই যেন এরা এক ছাঁচের।

পান্নালাল বলে, সবাই—গোটা দেশটাই এই রকম। এত দুঃখেও জ্ঞান হল না। সাত সমুদ্র পার থেকে পেটের দায়ে বিদেশিরা দোকান করতে এল, সেদিনও সমাদরে তাদের ডেকে বসিয়েছিলাম। তারই ভোগ ভুগছি। সেদিন আতিথ্য-বৃত্তি সঙ্কুচিত করলে ইতিহাস অন্য রকম হয়ে যেত।

মাদুরের উপর পান্নালাল লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। একটু পরে দেখা গেল, পা নাচাচ্ছে।

সুপ্রিয়া বলে, স্ফূর্তি যে গায়ে ধরে না !

রাঁধা-ভাত যেদিন জোটে, বড্ড আমোদ হয়। হাত পুড়িয়ে রাঁধতে রাঁধতে হাতে কালসিটে পড়ে গেছে। ভাত বেড়ে ব্যঞ্জন সাজিয়ে আপনি আমায় ডাক দেবেন—

সুপ্রিয়া বিপন্ন ভাবে বলে, আচ্ছা, বলুন তো রান্না কি জানি, না করেছি কোনদিন ? রান্নাঘরে উঁকি মেরেও কখনও দেখতে দেন না বাবা।

আবদারের সুরে সে বলল, আমি পারব না। আপনার অভ্যাস আছে, আপনি যা হোক করুনগে মাস্টারমশায়।

পান্নালাল শিউরে ওঠে। সর্বনাশ, মেয়েমানুষ উপস্থিত থাকতে পুরুষে রাঁধবে, এক্ষুনি হৈ-হৈ পড়ে যাবে। পাড়ার যত বউ-ঝি দেখতে আসবে আজব কাণ্ড।

সুপ্রিয়া বলে, বলে দিন আমার অসুখ আছে। আগুনের ধারে যেতে ডাক্তারের মানা।

পান্নালাল জিভ কেটে বলে, সবাই জেনে ফেলেছে জাতে আমি কায়েত। আর রায় মশায়ের জাতও অজানা নেই কারো। আপনার রান্না স্বচ্ছন্দে খেতে পারি খাবও তাই। কিন্তু আপনাকে রেঁধে খাইয়ে পাপের ভাগী কি করে হব বলুন?

পা নাচাতে নাচাতে এবার পান্নালাল গুনগুনিয়ে গান ধরল।

বিরক্ত কণ্ঠে সুপ্রিয়া বলে, গান থামান। ভাল লাগছে না।

পান্নালাল বলে, জাতে ছোট হওয়ারও কত সুবিধে দেখুন!

রাগে গরগর করতে করতে সুপ্রিয়া বলে, বাজে কথা রাখুন। জাতের ছোট-বড় নয়, কায়দায় পেয়ে গেছেন তাই। নইলে কলিমদ্দি মিঞা হোক, আর গদাধর মহান্তই হোক—কার রান্না করে বদহজম হয়ে থাকে আমাদের?

মুখে আঙুল দিয়ে পান্নালাল বলে, চুপ—চুপ! এসব শুনতে পেলে আর কিন্তু ঢুকতে পাবেন না এ-পাড়ায়। কনফারেন্স করে জমিদারের বিরুদ্ধে কিংবা ইংরেজের বিরুদ্ধে যা বলেছেন, সে সব বরদাস্ত করেছে। কিন্তু ওর মধ্যে সমাজ-সংস্কার আনতে গেলে—সর্বনাশ। একেবারে পাশ-ঠেলা করে দেবে।

সংস্কার তো কোটা ভাগ করে হয় না। রাজনীতি আর জীবন-রীতির সংস্কার—সবই কি মানবতার মুক্তির জন্য নয়?

পান্নালাল বলে, সবাই সেটা ভেবে দেখে না, তাই দলে এত মানুষ পাওয়া যাচ্ছে। মনে মনে আন্দাজ, নূতন বিধান আমার অসুবিধাগুলো দূর করে দেবে, আর আমি যে শোষণ করছি সেটা অব্যাহত রইবে চিরকাল। ভেবে দেখুন, কংগ্রেসের পত্তন হল এক ঝুনো সিভিলিয়ান আর এক লাট সাহেবের উদ্যোগে।

তাঁরা ভাবলেন, ইংরেজ-রাজত্ব কায়েমি তো থাকবেই—তার ভিতটা পোক্ত হোক রাজা-প্রজার সৌহার্দ্যে। কোথায় এসে পৌচেছে সে কংগ্রেস? কোন বাণী তার কণ্ঠে? আজ স্বায়ত্ত-শাসনেও কুলোচ্ছে না, পূর্ণ-স্বাধীনতা চাই।… ব্যস্ত হবেন না, খুঁটিনাটি ভাবতে হবে না, মানুষের সত্য-চেতনা উদ্বুদ্ধ হোক—বিপ্লবের স্রোতে খড়-কুটো সমস্ত ভেসে যাবে।

দ্বারিক আবার এল, হাতে লণ্ঠন আর প্রকাণ্ড আয়তনের এক কলসি। বলে, চল মা, ঘাট দেখিয়ে দিচ্ছি। তালের খেটে—বড্ড পিছল, কলসি নিয়ে সাবধান হয়ে উঠতে হবে।

অসহায় ভাবে সুপ্রিয়া বলে, ও বাবা! এত বড় কলসি টানতে পারব না তো। জলটা কেউ আপনারা তুলে দিন।

দ্বারিক বলে, পোড়া কপাল! ব্রাহ্মণ-সেবার জল আনব, সে কপাল করে এসেছি কি মা? জল-চল জাত হলে তোমায় কষ্ট দিতাম না।

পান্নালাল উঠে বলে, আচ্ছা, আমি—আমি না হয় এনে দিচ্ছি। অসুখ থেকে উঠেছেন কিনা, দেহটা বড্ড দুর্বল—

এক ঝাঁকিতে সুপ্রিয়া কাঁখে তুলল কলসি। ঘুরে দাঁড়িয়ে পান্নালালকে আড়াল করে বলে, আলো তুলে ধরুন কর্তা, দেখা যাচ্ছে না।

উঠান জলে ভর্তি। জুতো খুলে শাড়ির আঁচল দো-ফেরতা কোমরে জড়িয়ে সুপ্রিয়া শীতে হি-হি করতে করতে ঘাট থেকে জল নিয়ে এল।

ভাত চেপেছে, টগবগ করে ফুটছে, সেই অন্ধকারে পান্নালাল এসে উঠল রান্নার জায়গায়। করুণা হয়েছে সুপ্রিয়ার অবস্থা দেখে; তাকে বাঁচাতে এসেছে। বলে, অত বড় অসুখ থেকে উঠেছেন—আগুন-তাতে বেশি থাকবেন না। ভাতে-ভাতই বেশ। মাছ-টাছের দরকার নেই সর্দার মশায়, ও সব আমরা ভালবাসি নে। আর অসুখ অবস্থায় ওঁর উচিতও নয় অত সাত-সতের রান্না করা।

ঘাড় দুলিয়ে সুপ্রিয়া বলে, থাক—কাজে ভণ্ডুল দেবেন না বলছি।

আগে ছিল অভিমান, এখন এই একটা দিনের গৃহিণীপনায় সত্যি সত্যি তার খুব আমোদ লাগছে। খুন্তি উঁচিয়ে কৃত্রিম ক্রোধে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, যান বলছি, চলে যান যেখানে ছিলেন—

ঘরের ভিতর কার্তিকের বোন পুঁটি আর যামিনী-বউয়ের মধ্যে খুব হাসাহাসি হচ্ছে তখন। যামিনী পুঁটিকে টানতে টানতে বেড়ার ধারে নিয়ে এসেছে। বলে, ও দিদি, রান্নার শ্রী দেখে যাও একবার। ওঁর আবার নাকি বড্ড অসুখ। তিনটে কুমিরে খেয়ে উঠতে পারে না—অসুখে তিনি মরে যাচ্ছেন। হি—হি—হি—

মর পোড়ারমুখী, হেসেই খুন হলি। চঞ্চল বউটার গাল টিপে দিয়ে পুঁটি নিজের কাজে গেল।

সেই বেড়ার ধার থেকে যামিনী নড়ল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সুপ্রিয়ার কাণ্ডকারখানা। আবার ননদের কাছে ছুটে গিয়ে হেসে লুটোপুটি। বলে, দেখে যাও—দেখে যাও দিদি। জুতো পরে গট-মট করে বেড়ায়—ইদিকে বেড়ি ধরতেও জানে না।

মুখে আঁচল দিয়ে যামিনী হাসে। হাসির বেগ ঠেকাতে পারে না।

চুপ কর—শুনলে কি মনে করবে, চুপ-চুপ! বলতে বলতে পুঁটিও হেসে ফেলে। সে-ও কিছু কিছু দেখেছে। তারপর বউকে যুক্তি দেয়, পুড়িয়ে জ্বালিয়ে ফেলছে—আহা, মুখে দেবে ওরা কি করে! ওখানে গিয়ে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিগে যা—

যামিনী জিজ্ঞাসা করে, যাব দিদি? দোষ হবে না?

তাতে আর দোষ কি? পুরুষমানুষ কেউ নেই ওদিকে—

যাই তা হলে? যামিনী ছুটল।

পুঁটি সামাল করে দেয়। চালের নিচে যাস নে কিন্তু—খবরদার! জাত মারা যাবে।

গোলগাল বউটা ঝুম-ঝুম পালং-পাতা মল বাজিয়ে রান্নার জায়গার খানিকটা দূরে এসে দাঁড়ায়।

সুপ্রিয়া চোখ তুলে চেয়ে ডাক দিল, এস—এস। কেমন সুন্দর ঘর-বর হয়েছে! দিদি এসে অতিথি হয়েছে, তা দেখাও দিলে না একটিবার!

মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, চিনতে পারছ না আমায়?

প্রথমটা যামিনী চিনতে পারে নি। একনজর তো দেখা! সে রাত্রে ঘরের মধ্যে সে যায় নি,—কার্তিক ছিল, তার উপর এর বাবা সেই বুড়ো ভদ্রলোকটি—যাবে কি করে? ভাল ভাল গল্প হচ্ছে শুনে একবার কেবল দাঁড়িয়েছিল দোর-গোড়ায়। সুপ্রিয়া তাকাতেই দৌড়ে পালাল। সেই চঞ্চল মেয়েটা কেমন ধীর হয়ে গেছে এখন, বউ হয়ে ভারিক্কি হয়েছে। সুপ্রিয়ার এত কথা কানেই গেল না যেন! চুপচাপ দেখে, আর মুখ টিপে টিপে হাসে।

সহসা বলে উঠল, কি করছেন? মাছ পুড়ে কয়লা হয়ে গেল যে, গন্ধ বেরুচ্ছে। জল ঢালুন শিগগির—

সন্ত্রস্ত হয়ে সুপ্রিয়া হুড়হুড় করে জল ঢেলে দিল।

ঘটিসুদ্ধ ঢাললেন? নাঃ—রান্নার কিছু জানেন না। মুখে বলে বা কি করব, হাত ধরে দেখিয়ে দিলেও আপনার হবে না।

সুপ্রিয়া হেসে বল্লে, তা দেখিয়ে দিয়ে যাও না ভাই হাতটা ধরে। দাও না—

যাঃ—বলে যামিনী আর একটু সরে দাঁড়ায়।

বেশ লাগে বউটিকে। কথায় কথায় হাসে, আর ভঙ্গিটি এমন—যেন কত বড় গিন্নি! সুপ্রিয়া দেবী—বড় বড় দুটো সমিতির সেক্রেটারি, একটার ভাইস-প্রেসিডেন্ট—আর এখানে কত বড় কনফারেন্স করল, সেজন্য কলকতার কাগজে কত প্যারা বেরিয়েছে তার নামে—চাষাবউ তাকে একজন অপদার্থ ভেবে বসেছে।

(৩)

খেতে বসেছে পান্নালাল। মুচকি হেসে সুপ্রিয়া চুপিচুপি বলে, মেয়ে-বউরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে বেড়ার ফাঁক দিয়ে। ঠিক হচ্ছে তো—দেখুন, গেরস্ত-বাড়ির মেয়েরা যেমন সামনে বসিয়ে খাওয়ায় ?

পান্নালাল ভদ্রতা করে বলে, আপনিও বসে যান না। সেই কখন খেয়েছেন তুপুরবেলা। সন্ধ্যেয় চা-টা হয় নি।

সুপ্রিয়া বেড়ার ও-ধারে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, ও মা কি ঘেন্না! মেয়েমানুষ পুরুষের সামনে বসে খাবে, কি যে বলেন!

পান্নালালের সামনে মাটির উপরেই সে চেপে বসল। বলে, ডালটুকু ঢালুন বলছি। ফেলতে পারবেন না, মাথা খান।

বলে ফিক করে সে হেসে ফেলল।

মুখ তুলে পান্নালাল বলে, নুনে পুড়ে যবক্ষার হয়ে গেছে, গলায় উঠছে না।

জল ঢেলে নিন ; গ্লাসে তো জল রয়েছে। নোনতা কেটে যাবে।

তারপর মাছের ঝোলের বাটি থেকে এক হাতা কেটে দেয়। জিজ্ঞাসা করে, এটা ?

পানসা। মোটেই নুন দেন নি।

নুন মেখে নিন। পাতে দিয়ে দিইছি।

একটা হাতপাখা ছিল ওদিকে, কুড়িয়ে এনে সুপ্রিয়া জোরে জোরে বাতাস করে।

কি করছেন—আহা করছেন কি ? ঠাণ্ডা বাদলার হাওয়া, তার উপর··· জমে গেলাম যে!

সুপ্রিয়া হেসে গড়িয়ে পড়ে।

ঠিক হচ্ছে না ? গেরস্ত-বাড়ি যে রকম করে থাকে ?

সহসা গম্ভীর হয়ে পান্নালাল প্রশ্ন করে, বলুন তো সুপ্রিয়া দেবী, এই যে পরিপাটি করে ভাত বেড়ে এত যত্ন করে খাওয়াচ্ছেন, এ কি লোক-দেখানো অভিনয় শুধু ?

জবাব দিতে সুপ্রিয়ার যেন গলা আটকে আসে। বলে, কি মনে হয় আপনার ?

কি জানি, আদর-যত্ন তেমন ভাবে পেলাম কবে যে বিচার করে বলব ? উমা আঁকুপাকু করে, কিন্তু তারও পরের জায়গায় চির-জীবন কেটে গেল— সাধ মেটাতে পারল কই। জেলের একটা মুসলমান কয়েদি রান্না করত খুব ভাল—আপনার চেয়েও অনেক ভাল, তুলনাই হয় না, কিন্তু সে সামনে বসে খাওয়াত না—

টর্চের জোরালো আলো এসে পড়ল। অনেকগুলো মানুষ উঠানে। দুনো ভাড়া কবুল করে হরিহর একখানা পালকিও পাঠিয়েছেন, রাত্রিবেলা মাদার-ডাঙা থেকে মেয়ে পায়ে হেঁটে ফিরবে—এ তাঁর ইচ্ছা নয়। আর এ কি ব্যাপার—এদের মধ্যে অনুপম—মাথায় ছাতা সে দ্বারিক সর্দারের দাওয়ায় উঠল। জুতো এবং প্যাণ্টলুনের হাঁটু অবধি জলে কাদায় জবজবে।

বলে, গোরুর-গাড়ির পইয়ে জল বেধেছে। ছিটকে লেগে এই দশা। তোমরা বেরোবার পরই এসে পৌছলাম। তোমার বাবার গ্রামোন্নতি-স্কীম শোনা গেল অনেকক্ষণ ধরে। ঘুরে ঘুরে তিনি দেখালেন ডাক্তারখানা হবে যে জায়গায়। এই আসছ, এই আসছ—সন্ধ্যা থেকে আমরা পথ তাকা-তাকি করছি। শেষকালে বুঝতে পারলাম, আটকা পড়ে গেছ। বিপদেই পড়েছ হয় তো। শিভ্যালরি চেগে উঠল। উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছি।

ভোজনরত পান্নালালের দিকে কঠোর দৃষ্টি হেনে বলল, বাঃ রে, তুমি রান্না করতে জান দেখছি, হাওয়া করতে করতে খাওয়াতেও জান।

পান্নালাল বলে, আর রেঁধেছেনও একেবারে অমৃত। ওঁরটা আছে এখনো, চেখে দেখবেন নাকি?

রূঢ় কণ্ঠে অনুপম বলে, আপনি কবে এসে জুটলেন? আমি বাড়ি ছিলাম না, দুটো দিন সবুর করেও ডুব দিতে পারতেন। তা হলে ভদ্রতা হত।

পান্নালাল বলে, রাগ করে করবেন কি? অত কাণ্ডজ্ঞান থাকলে আপনাদের মতো দশের একজনই হয়ে উঠতাম এদ্দিনে। দুর্দিনের আশ্রয়দাতা আপনি—এঁটো হাত ধুয়ে এসে নমস্কার করছি, দাঁড়ান।

(৪)

মেঘ কেটে ঘোলাটে জ্যোৎস্না উঠেছে। এবার এরা বাড়ি ফিরবে। সহসা ঢপাঢপ ঢোলে ঘা পড়ল। ঝমর-ঝমর কত্তালের আওয়াজ। কো-কো করে বেহালা বাজছে, শোনা গেল।

দুর্যোগের মধ্যে সুপ্রিয়া ভুলে গিয়েছিল, কালীতলায় কবি-গান হওয়ার কথা। দলওয়ালাদেরও সন্দেহ ছিল, ঐ অবস্থায় গান হবে কি না হবে। এখন মেঘ কেটে যাওয়ায় স্ফূর্তি হয়েছে সকলের। পাড়ার সকলে আসরমুখো চলেছে। সুপ্রিয়াও ঘুরে দাঁড়াল।

শুনে গেলে হত খানিকটা। কক্ষণো আমি শুনি নি।

অনুপম বলে, দূর—কি শুনবে এই সব গেঁয়ো চেঁচামেচি? মাথা ধরবে, কানে তালা লেগে যাবে। কত ভাল ভাল গানবাজনা শুনেছ শহরে—

তা হলে আপনি চলে যান বরং। দাসু থাক, আর যদি কারো ইচ্ছে হয় থাকুন।

পান্নালালের দিকে সুপ্রিয়া অনুনয়-ভরা দৃষ্টিতে তাকাল।

দ্বারিকও নাচিয়ে দেয়। বেশ তো—এসে পড়েছ যখন মা, আমাদের আমোদ-আহ্লাদ দেখে যাও একটুখানি বসে। কোন রকম অসুবিধে হবে

না। আলাদা চৌকি পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাদের জন্য। প্রসন্ন ঘোষ আর আমাদের কানা-কোদার লড়াই। শুনবার মতো জিনিস একখানা।

ভিজে চুল শুকিয়ে গেছে, চুলের বোঝা মাথায় ঝুটি করে জুতো পায়ে সুপ্রিয়া বাড়ির ভিতর এসে দেখে, যামিনী-বউ তাদের পাতের এঁটো কুড়োচ্ছে।

কি রে? গান শুনতে যাবি নে?

যামিনী বলে, বড়রা যাবে। আমি বউমানুষ, আমায় যেতে দেবে কেন বাইরে?

সুপ্রিয়া বলে, বাইরেটা হল কোনখানে? উঠানের উপর বললে হয়! এইটুকুও যেতে দেবে না?

বউমানুষ কিনা—

দেখতে ইচ্ছে করছে না?

একটু ইতস্তত করে মৃদুকণ্ঠে যামিনী বলে, করছে তো। কিন্তু নতুন বউ যে! বাপরে বাপ—এমন কড়া পর্দা!

কিন্তু যামিনীর মুখে দুঃখের ছায়া দেখা যায় না। চিরকালের রীতি—এর শাশুড়ী কিম্বা শাশুড়ীরও শাশুড়ী যিনি ছিলেন, এই বয়সে রাত্রিবেলা বাড়ির বাইরে যান নি। সকালবেলা সূর্য ওঠার মতোই অলঙ্ঘ্য এ নিয়ম। রাগ বা দুঃখ করবার এতে কিছু নেই।

গান একটু বেশি রাত্রে শুরু হয় এসব অঞ্চলে। শ্রোতারা খাওয়া-দাওয়া সেরে, এবং গিন্নিরা তারও পরে রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এসে বসে। বাদলার জন্য আরও বেশি দেরি হয়ে গেছে আজ। বেলেমাটির জায়গা বলে সুবিধা হয়েছে, বৃষ্টির জল শুষে নিয়েছে। তার উপর তুষ ছড়ানো হল, প্যাচ-পেচে কাদা হয়ে যাতে গাইয়ের অসুবিধা না ঘটে! সেই যে কলার তেউড় ও সরা বসানো হচ্ছিল, ঐ সব সরার মধ্যে তুষ আর কেরোসিন দিয়ে জ্বেলে দেওয়া

হয়েছে। চারিদিক আলো-আলোময়। আসরের ঠিক সামনে আড়বাঁশের একদিকে ঝকঝকে এক পিতলের কলসি কানায় দড়ি বেঁধে ঝোলানো হয়েছে, আর একদিকে পাকা মর্তমান-কলা এক কাঁদি।

কার্তিককে সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করে, এর মানে ?

সগর্ব হাসি হেসে কার্তিক বলে, বলেন কেন দিদি, বাবার মাথায় কত আসে। বারোয়ারি গান তাঁরই উদ্যোগে কিনা! তিন মাস ধরে কেরোসিন তেলের জোগাড় চলেছে, জলমার হাট থেকে পছন্দ করে কিনে এনেছেন ঐ কলসি। দুই কবিতে পাল্লা হবে, যে জিতবে পিতলের কলসি তার। হারলে পাবে কলার কাঁদি।

প্রসন্ন ঘোষ জাতে গোয়ালা, উত্তর অঞ্চল থেকে এসেছে। গলা থেকে মেডেলের মালা খুলে দ্বারিকের হাতে দিল। মেডেল একুনে থান কুড়িক হবে। খানিকক্ষণ হাতে হাতে ঘোরে, সকলের তাজ্জব লেগে যায়।

আর বসে আছে এক কোণে মুখ নিচু করে লম্বা-চুল, শনের মতো সাদা-দাড়ি, লাজুক কানা-কোদা। একটা চোখ কানা—নামের সঙ্গে কানা বিশেষণটা তাই কায়েমি হয়ে জুড়ে আছে। এত বয়স হয়েছে, কিন্তু লজ্জা তার কমল না। আসর ছাড়া আর কোনখানে সে গায় না। দেমাক করে যে গায় না, তা নয়—ফরমায়েসি গান গাইবার ক্ষমতাই তার নেই। ভূষণ দাসের বাড়ি বিনোদের বিয়ের বউভাতের সময় সকলের অনুরোধে সে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু গলা খুলল না। কেশে মুখ লাল করে এমন কাণ্ড করেছিল যে ধার্মিক ভূষণ তাকে রেহাই দিল ; দয়াপরবশ হয়ে বলল, থাক ওস্তাদ। আনন্দের দিনে তুমি যে নাকের জলে চোখের জলে ভাসবে, তার কাজ নেই। তুমি থাম।

অথচ জমজমাট গানের আসরের মধ্যে প্রতিপক্ষ যখন এই কানা-কোদাকে বেড় দিয়ে গান ধরে, তখন তার আর এক মূর্তি। চোখটি পিটপিট করে, ঘন ঘন তাকায় সে মেয়েদের মধ্যে যেখানে তার বউ আতরমণি বসে আছে।

যেখানে কানা-কোদার গান, আতরমণি সেখানে যাবেই। অঞ্চলের বাইরে কোথাও কানা-কোদা যায় না—লোকে বলে, দূরের জায়গায় আতরমণির পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় বলেই সে যায় না! কি ভাষা থাকে বুড়ি আতরমণির দৃষ্টিতে, তার দিকে চেয়ে কি ভরসা পায়—তখন আর কাউকে পরোয়া করে না কানা-কোদা। প্রতিপক্ষের কথা শেষ হলে মাথা নাড়া দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়, লম্বা চুল সিংহের কেশরের মতো ফুলে ওঠে। কানা-কোদা—প্রতিদিনের জীবনে দীনাতিদীন অতি-নম্র মূর্তি, আসরে সে বজ্রগর্ভ। এ-মানুষ আর সে-মানুষের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না!

দ্বারিক সর্দারের কিছু রাগ ও অবহেলা আছে কানা-কোদার উপর। দুজনে প্রায় একবয়স, খালের ওপারে কানা-কোদার বাড়ি, ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে। সে যে একজন গুণীলোক হয়ে উঠেছে, কিছুতেই দ্বারিক ধারণায় আনতে পারে না। কিন্তু ছোকরার দল গর্ববোধ করে তাদের অঞ্চলবাসী কবি কানা-কোদার জন্য। তারা বলাবলি করছে, হুঁ—এক কুড়ি মেডেল না আরো কিছু! ওসব গড়িয়েছে প্রসন্ন ঘোষ। বেনে ডেকে আমরাও গড়াতে পারি অমন দশগণ্ডা বিশগণ্ডা।

মেডেলের মালা গলায় ঝুলিয়ে প্রসন্ন ঘোষ উঠে দাঁড়াল। আলো ঠিকরে পড়ছে মেডেলের উপর। হাঁ, গাইতে জানে বটে! ভবানী-বিষয় সেরেই অমনি বিষম আক্রমণ

এ যে বিষম কলি, কি-ই বা বলি!
যত সব নাদাপেটা চাষার বেটা—
সাত পুরুষের কুলকর্ম হঠ্-হঠ্-হঠ্ লাঙল চষা।
কোকিলের গান শোনাবেন এঁদো আস্তাকুড়ের মশা—
হায় হায় হায়, কাল যে বিষম কলি
কি-ই বা বলি—

হঠ্‌-হঠ্‌-হঠ্‌ আওয়াজ করে প্রসন্ন গোরু তাড়াবার ভঙ্গিমা করে, আর হাসির হুল্লোড় পড়ে যায় আসরে। কানা-কোদার ভক্তেরা চোখ টেপাটেপি করে বলে, সত্যি কথা, কোকিলই তুমি প্রসন্ন। রঙে তো বটেই।

কিন্তু গলাখানিও প্রসন্নর কোকিলের মতো মিষ্ট। রাত শেষ হয়ে আসে। এক কবির পর আর-এক কবি উঠছে। ঢুলি আসরের এক-প্রান্ত থেকে লাফিয়ে ওদিকে গিয়ে পাক খেয়ে ঢোল বাজাচ্ছে, আর মুখে মুখে বোল আবৃত্তি করছে—

ঘিউর-ঘিজা ঘিউর-ঘিজা গিজা-ঘিনি-তা

তা-তা-তা—

শেয়ালে খেলে মা-থা-আ—

উৎসাহ উত্তেজনায় মেয়ে-পুরুষ কারো চোখে ঘুম নেই। গানের মতো গান হচ্ছে বটে এতকালের পর। এ-গ্রাম ও-গ্রাম থেকে যারা সব এসেছে—অনেকে তাদের মধ্যে উসখুস করছে, আসরটা ভাঙলে হয়—বায়না দেবে, তাদের গ্রামেও নিয়ে যাবে এই দল ছুটো।

পান্নালালেরও যেন নেশা ধরে গেল। শুনতে শুনতে মনের মধ্যে গান জাগছে অনেক দিন পরে। সে অস্থির হয়ে ওঠে। জীবনের সর্বভোগ-বঞ্চিত সৈনিক—কিন্তু নির্যাতনে অন্তরের কবিতা মরল কই? এত বড় যুদ্ধ চলছে, দ্বার-প্রান্তে ধ্বংসের হানাহানি—কিন্তু এরা কেমন মশগুল হয়ে গানের রস উপভোগ করছে, কোন সমস্যায় জীবন পীড়িত নয়। ঠকেছে না জিতেছে এরা? চিরদিন এমনি তো হয়ে এসেছে এদেশে। রাষ্ট্রিক রদ-বদলের ধাক্কা স্বয়ংপূর্ণ সমাজ-দেহে পৌছয় নি। কিন্তু সর্বনাশ এবারও কি সেই রকম থমকে দাঁড়িয়ে থাকবে এদের এই কবির আসরের সামনে অবধি এসে? গান শুনে আর পান খেয়ে ভদ্র হয়ে ফিরে যাবে শত্রু?

ভোর হল। গান তখনও চলছে। সভার আলো নিভেছে। আড়মোড়া

ভেঙে উঠে দাঁড়াচ্ছে জোয়ান চাষীরা, আউশ-ক্ষেতে লাঙল জুড়তে যেতে হবে। মেয়েরাও উঠছে, উঠানে ছড়াঝাঁট দেওয়া আছে, গোয়াল-বাড়ানো আছে। আর তাড়াতাড়ি পান্তা বেড়ে দিতে হবে মরদদের—তারা খেয়ে লাঙল-গোরু নিয়ে নামবে বউডুবির বিলে।

(৫)

সুপ্রিয়া পালকিতে উঠতে যাচ্ছে, দ্বারিক আর কার্তিক এসে দাঁড়াল।

দ্বারিক বলে, গুহক চণ্ডালের ঘরে রামচন্দ্র এসেছিলেন মা, আমাদের হল সেই বিত্তান্ত। আমি একদিন যাব তোমাদের গাঁয়ে, রায়-কর্তার চরণ-ধুলো নিয়ে আসব।

সুপ্রিয়া বলে, কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি আমরা। বাবার কারবারের ক্ষতি হচ্ছে—আর এখন কোনরকম গণ্ডগোলও নেই সেখানে। অনুপমের দিকে কটাক্ষ করে বলে, যেতেই হবে—ভগ্নদূত এসে উপস্থিত। চিঠিতে জপাচ্ছিলেন, এবার নিজে এসে পড়েছেন। ছেড়ে যাবেন, সে রকম তো মনে হচ্ছে না।···তা আপনারা একবার চলুন না কেন কলকাতায়। যাবেন ?

রূপদাসী ঘাড় নেড়েছিল কলকাতার কথায়, দ্বারিকের কিন্তু চোখ জ্বল-জ্বল করে ওঠে। একবার গিয়েছিল কি না, তাই। আজব শহর। কল টিপলে আলো জ্বলে, কল ঘোরালে জল পড়ে। অমাবস্যার রাতেও অন্ধকার নেই, ভারি ফূর্তির জায়গা কলকাতা।

এক খড়ের ব্যাপারির সঙ্গে দ্বারিক সর্দার কলকাতায় গিয়েছিল তিন দিন। আজ তিন বছরেও তার গল্প শেষ হল না। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর দ্বারিক মাদুর বিছিয়ে শোয়, যামিনী-বউ শ্বশুরের পায়ে তেল মালিশ করে দেয়, পুঁটি তামাক সেজে আনে। বুড়ো ভুড়ুক-ভুড়ুক তামাক টানে আর শহরের গল্প করে সেই সময়টা।

অনুপমও বলল, নেমন্তন্ন করে যাচ্ছি। যেও সর্দার। ভাল করে দেখিয়ে শুনিয়ে দেব।

দ্বারিক উল্লসিত হয়ে বলে, যাব বই কি, ঠিক যাব। শহর তো নয়, সগ্‌গোধাম। আউশ বুনে নিশ্চিন্ত হয়ে দিনকতক ঘুরে আসব।

সুপারি-পাতার বেড়ার আড়ালে যামিনী। মল আর কাচের চুড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সুপ্রিয়া তার কাছে গেল। আলগোছে প্রণাম করে যামিনী বলে, কথাবার্তা শুনেছি। আমিও কিন্তু যাব দিদি—

যাবি, নিশ্চয় যাবি। তুই, তোর বর, তোর শ্বশুর—তোদের বাড়িসুদ্ধ সবাই যাস আমাদের শহরে—

এদিকে-ওদিক চেয়ে চুপিচুপি বলে, টুপি-পরা সাহেব ঐ যে—ওর সঙ্গে আমার বিয়ে এই বোশেখে। তোদের বিয়ের ফাঁকি দিয়েছিস, আমি নেমন্তন্ন করে গেলাম।

যাবার মুখে আর শুনল না সুপ্রিয়া। বউকে জড়িয়ে ধরে আদর করে পালকিতে উঠল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

(১)

আউশ বোনা হল না বীজধানের অভাবে। আমনের সেই অবস্থা হয় বুঝি। চষা-ক্ষেত ধূ-ধূ করছে—নূতন বর্ষার জলে মাটি সরস ও স্নিগ্ধ হবে এইবার। জল বাড়লে তখন আর রোয়া চলবে না। পাগল হয়ে চাষারা ডোল-আউড়ির তলায় যার যে কটা খোরাকি ধান ছিল, সমস্ত বীজতলায় ছড়িয়ে দিল। কাল কি খাবে, সম্বল নেই। ভরসা আছে উপায় একটা কিছু হবে, ধানের চালান এসে পড়বে সমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে—প্রথম চৈত্রে গাড়ি গাড়ি এদের ধান কিনে যেখানে রওনা করে দিয়েছে। ধানের পালায় পালায় উঠানে পা ফেলা যেত না—অত ধান আজকে একেবারে অদৃশ্য।

লোকে ভয় দেখিয়েছিল, ধান ঘরে রাখলে বিপদে পড়বে তোমরা। শত্রু এসে কেড়ে নেবে, আর গলাটা দুইখণ্ড করে কেটে দিয়ে যাবে সেই সঙ্গে। থানার লোক দল বেঁধে গোলা-আউড়ি হাতড়ে গেল একবার। দরকার বোধ করলে শহরের মন্ত্রীরাও এসে নাকি গৃহস্থর তক্তাপোশের নিচে ধানচাল খোঁজাখুঁজি করবেন। তার উপর দরটা এমন ছিল—যা সাতপুরুষে কেউ কখনো কানে শোনে নি। সকল চাষা তাই ধান বেচে দিয়েছে। অগুনতি নোট—সিকেয় ঝোলানো লক্ষ্মীর হাঁড়ির মধ্যে এনে এনে রাখত, নোটে নোটে স্তূপাকার হয়ে উঠল। ভেবেছিল, আউশ উঠবার মুখে দর তো নেমে যাবে—টাকার কাড়ি রইল, সেই সময় ধান কেনা যাবে যার যেমন দরকার! ক্ষেতের ধান ঘরে এনে রাখাও যখন অপরাধের ব্যাপার, এ ছাড়া উপায়ই বা ছিল কি?

সেই নোটের বোঝা শুকনো পাতার মতো বাতাসে উড়ে গেল দেখতে দেখতে। একজোড়া কাপড় কিনবে তো গুনে দাও এক গাদা নোট। নুন কিনবে, কেরোসিন কিনবে—দাও এক এক মুঠো। আর এমন হয়েছে, আজকে নোটের পাহাড় ঢেলে দিলেও সমস্ত অঞ্চলে এক খুঁচি ধান কেউ দেবে না। ধান-চাল ভেল্কিতে উড়ে গেছে।

অবোধ নিরীহ চাষী—এরা না জানুক, পান্নালাল কিছু কিছু জানে ঐ ভেল্কিওয়ালাদের। এখন খুলে বলা চলে না—কেউ মুখ ফুটে বলবে না, খবরের কাগজে ছাপবে না, ভারত-শাসনের কড়া আইনে শুনতেও ভরসা পাবে না কেউ—কিন্তু সে জবানবন্দি দেবে, যখন হিসাব-নিকাশের দিন আসবে সেই সময়। ইস্কুল উঠে গেছে, তবু সে গ্রাম ছাড়ে নি। সারা দেশে মন্বন্তরের আগুন—পালাবে কোথা? শাস্তিতে বিশ্রাম করা তার ভাগ্যে নেই—চুপচাপ মাথা ঠাণ্ডা রেখে এর মধ্যে সে থাকবে কেমন করে? ক্ষেত-খামার ঘর-গৃহস্থালি নৌকো-গাড়ি মেলা-কবিগান সৌজন্য-আতিথেয়তার বাংলাদেশ চোখের উপর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, ভূষণ্ডী-কাকের মতো ধ্বংসের সে সাক্ষী হয়ে রইল।

এই ফাল্গুনে পান্নালালের ভীষণ বসন্ত হয়েছিল। পাঠশালা-ঘর থেকে অচেতন অবস্থায় দ্বারিক তাকে বাড়ি নিয়ে তুলেছিল। আহা, বিদেশি মানুষ—আপন-জন কেউ নেই এখানে! প্রাণের আশা ছিল না; দ্বারিকের টিনের আটচালার দক্ষিণের কামরায় এক মাসের উপর পড়ে পড়ে সে ভুগেছে। কি করে যে বাঁচিয়েছে ওরা! হিংস্র ব্যাধি সমস্ত মুখের উপর দংষ্ট্রা-চিহ্ন রেখে গেছে। পান্নালাল অনেক সময় ভাবে, তখন তার মারা গেলেই ভাল হত—এই অসহ্য দৃশ্য দেখতে হত না তা হলে। হাত-পা থেকেও যাদের কিছু করবার নেই, বেঁচে থাকা অভিশাপ তাদের পক্ষে।

হরিহর রায় শুধু নন—যত সজ্জনেরা গ্রামে এসেছিলেন, কেউ আর এখন নেই। পাঠশালা মাইনর-ইস্কুলের আভিজাত্য লাভ করবে, নূতন পাকা-রাস্তা

টিউব-অয়েল আর দাতব্য হাসপাতাল হবে, সোনার গ্রাম গড়ে তুলবেন সকলে মিলে চেষ্টাচরিত্র করে—এই সব সাধু সঙ্কল্প মুলতুবি রইল আপাতত। জল-জঙ্গল, সাপের ভয়, ম্যালেরিয়া, তার উপর জিনিসপত্র কিছু পাওয়া যায় না—এর চেয়ে বোমার ঘা খেয়ে মরতেও যদি হয়, তার আরাম অনেক বেশি। শহরের মানুষরা পাগল হয়ে সব শহরে পালাচ্ছে।

পালাচ্ছে গ্রামের মানুষরাও। পেটের ক্ষিধেয় যে যেদিকে পারে ছিটকে পড়ছে।

চার কুড়ি বছর বয়স দ্বারিকের। বছরের পর বছর এই সব জোত-জমি করেছে, ঘরবাড়ি-গোলা বেঁধেছে, সোনার সংসার সাজিয়ে তুলেছে। ছেলে-মেয়ে, বউ-ভাইবউ, নাতি-নাতনি, নিকট ও দূরসম্পর্কের আত্মীয়-কুটুম্ব—সকাল থেকে রান্নাবান্না, মানুষজনের আনাগোনা, কর্মকোলাহল—বাড়িতে একটা কাক পড়তে পারে না। কিন্তু এখন এই কিছুদিনের মধ্যে কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল, পোষ্যের দল কে কোথায় পালাল, এতগুলো ঘর হা-হা করছে, চারিদিকে চুপচাপ। রূপকথায় আছে পাতালপুরীর কথা—রাক্ষসে লোকজন খেয়ে সাতমহল অট্টালিকা ফাঁকা করে ফেলেছে—এ-ও অবিকল তাই।

সকালবেলা দাওয়ায় বসে দ্বারিক ফড়-ফড় করে হুঁকো টানছে, আনাচে-কানাচে এ-ঘরে ও-ঘরে এই আওয়াজটুকুরও স্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। এ রকম শান্তিতে তামাক খাওয়া কোনদিন কপালে ঘটে নি—কত উৎপাত, কত উপদ্রব!

ঘরের মধ্যে সেই সময় এক কাণ্ড। যামিনী বিছানা সরাতে গিয়ে দেখে বালিশের নিচে তার মল দু-গাছা। রাগ করে কাতিককে বলে, একটা সত্যি কথা তোমার মুখে নেই। এই যে বললে, স্যাকরাবাড়ি রেখে এসেছ, গালিয়ে দেখে হিসেব করে তারা টাকা দেবে—

কার্ত্তিক বলে, খুব টাকা চিনেছিস বউ। রাতদিন কেবল টাকা—টাকা—টাকা—

যামিনী অপ্রতিভ হল না। বলে, তা কি করব বল। মেয়ের মা—ছেলেমানুষটি তো নই।

নূতন বউ হলে কি হয়; এমনি পাকা কথা। এত কষ্টেও মুখের হাসি মরে নি। সবাই সরে পড়েছে, বাইরের মধ্যে আছে কেবল মা-বাপ-মরা ছোট্ট একটি মেয়ে। এখন অবশ্য আর বাইরের নয়, কে শিখিয়ে দিয়েছে—খুকি যামিনীকে মা বলে ডাকে।

ম্লান হেসে অভিমান-ভরা কণ্ঠে যামিনী বলতে লাগল, এমন দাম আর পাওয়া যাবে না। মাথা ভেঙে মরছি—তা একটা কাজ কি হবে তোমাকে দিয়ে? আমার একটা কথাও তুমি শোন না—

কার্তিক বলে, দাম পাওয়া যাচ্ছে অবিশ্যি—কিন্তু আমাদের কেউ কি দেবে? নিয়ে গিয়েছিলাম। গরজ বুঝে বলল মাত্র দশ টাকা।

দশটা পয়সাও কেউ দেবে না এর পরে। রুপো কতটুকু—কেবল তো কাঁসা।

তোর যে সাধের জিনিসটা বউ।

চোখ বড় বড় করে যামিনী বলে উঠল, ওমা—মা! মল পরা উঠে গেছে আজকাল—কেউ পরে না। আকাল চলে যাক—এই টাকায় আমার এক জোড়া কানবালা গড়িয়ে দিতে হবে।

একটু চুপ করে থেকে বলে, এদ্দূর হেঁটে হাটখোলা অবধি গেলে দশটা টাকা দিচ্ছিল—তাই-বা কে দেয়? তা মান দেখিয়ে চলে এলে। মনখানেক চাল নিয়ে এলে তবু দিনকতক তো নিশ্চিন্ত।

দশ টাকায় মন?

না-হয় দশ-বিশ সের।

বাজারে টাকা-পয়সা পাওয়া যায় বউ, ধান-চাল কেউ দেয় না।

যামিনী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

কার্তিক বলতে লাগল, গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে যদিই-বা মেলে দু-এক সের, গঞ্জে ও-বালাই নেই। ঢ্যাড়া পিটে দর বেঁধে দিয়ে গেল, সেদিন থেকে সামান্য যার যা আছে তা-ও সরিয়ে ফেলেছে, মাথা খুঁড়লেও বের করবে না।

মলজোড়া যামিনী কার্তিকের হাতের মুঠোয় জোর করে গুঁজে দিয়ে বলে, যাও—এক্ষুণি চলে যাও তুমি, যে ক-সের পাও, আনগে। খুকি খাব-খাব করে এসে পড়বে—

খুকি তখন মোচার খোলার নৌকায় কনে-পুতুল সাজিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার উদ্যোগে ছিল। তার নাম উঠতে মুখ তুলে তাকাল।

যামিনী অধীর হয়ে বলে, তুমি কি চোখ বুজে থাক? কিচ্ছু বোঝ না? যা দাম দেয়, বেচে দিয়ে এস। বুড়ো-শ্বশুর আর ছোট্ট মেয়ে—দুই-ই সমান। এক্ষুণি এসে দাঁড়াবেন। আমি কি করব? মরণ হয় না কেন আমার!

খুকি ছুটে এল। পুতুলটা কার্তিকের হাতে দিয়ে বলে, এটাও বেচগে। আমি আর খেলব না।

কি? শব্দ কিসের? বুড়ো দ্বারিক হুঁকো ফেলে দিয়েছে। হুঁকো কলকে গড়িয়ে উঠানে পড়ল। নাঃ—বাড়ি ছাড়তে হল এদের ঠেলায়। বাঁশের লাঠি তুলতে গিয়ে থরথর কাঁপছে দ্বারিকের হাত। লাঠি ঠুক-ঠুক করে সে চলল। চোখের কোটর জলে ভরে যাচ্ছে। এরা পণ করেছে, বাড়িতে তাকে থাকতে দেবে না। ছোট্ট ঐ মেয়েটা অবধি ঝাঁটা মারছে, পুতুল বেচতে দেওয়া—ঝাঁটার বাড়ি ছাড়া সে আর কি? দাওয়ায় বসে বসে দ্বারিক আর তামাক টানবে কি করে?

গ্রাম ছেড়ে বিলমুখো চলল। চাটুজ্জেপাড়ায় নারায়ণ-কোঠার পাশ দিয়ে পথ। কোঠার বারাণ্ডায় কেবলি সে মাথা কুটছে, নারায়ণ, এই দুটো মাস—প্রথম কার্তিকে কার্তিকশাল কাটা হবে, ভাদ্র আর আশ্বিন এই দুটো মাস একবেলা আধপেটা খাবার যোগাড় করে দাও ঠাকুর—

ঠাকুরেরও ঠিক এই রকম বিপদ। যুধিষ্ঠির চাটুজ্জের প্রতিষ্ঠা-করা ঠাকুর, দুপুরে পাকা-ভোগ আর রাত্রে শীতলের জন্য বড় একটা গাঁতি দেবোত্তর করে গিয়েছে। বিগ্রহ শয়ন করবেন, তার জন্য পালঙ্ক ও গদি-মশারির বন্দোবস্ত। সেই ঠাকুর ইদানীং মাসাবধি নিরম্বু উপবাসী। সেবাইত এখন যুধিষ্ঠিরের নাতি হরেকৃষ্ণ। বউ-ছেলে নিয়ে কোথায় সে গিয়ে উঠেছে।

ধানবনে আলের ধারে গিয়ে দ্বারিক বসল। ঝিরঝিরে বাতাস, সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে আসে। মনে বল পায়। আর কি, ভাদ্র আর আশ্বিন—দুটো মাস শুধু। আবার সব ফিরে আসবে। মানুষের ভিড়, কোলাহল, সচ্ছলতা—সমস্ত।

মরি মরি!—কি ফলন ফলেছে এবার! পাঁচ বছরের ফসল এই একেবারে উঠে আসবে। গাঢ় সবুজ ধান-চারা—মেঘের রঙ। মেঘভরা আকাশটা কি উপুড় করে রেখেছে দূরবিস্তৃত বিলের উপর? কি কষ্টের চাষ এবার! উপোস করে রোদ আর বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ধান রুয়েছে, কত আদরের এই ধান! ছেলের মতো। ধানের এক-একটা গোছা জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছে করে। বুড়োমানুষ দ্বারিক, দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসছে, মানুষ দেখে ঠাহর করতে দেরি হবে—কিন্তু ক্ষেতের মধ্যে কোন্ ঝাড়টা কি রকম সমস্ত তার নখদর্পণে। একটি চারা ঝাড় থেকে আলাদা হয়ে যদি শুয়ে পড়ে, সেটাকে সযত্নে খাড়া করে দিয়ে তবে তার তৃপ্তি। এই এখানে জল ঝরছে ঝিরঝির করে, খলবল করছে কই-খলসে-নাটা-পুটি—মাছেরা উজান-মুখো উঠতে চায়, ধানের ফাঁকে ফাঁকে বউটুবনি ফুল, কেউটে-ফণার ফুল, বিলঝাঁঝি, চেঁচোঘাস…

ক্ষেত ছেড়ে উঠে আসতে দ্বারিকের মন চায় না।

(২)

বউয়ের ঠেলায় কার্তিক ঘরে থাকতে পারল না, মল দু-গাছা গামছায় জড়িয়ে বেরুল। ফের হাটখোলায় চলেছে।

পিছনে পিঠের উপর প্রকাণ্ড থাবা। মুখ ফেরাতেই অট্টহাসি। বিজয়—

ভূষণ দাসের আগমনে বিজয় মজুমদার। অনুপম নিয়ে গিয়েছিল, তার পর বছর খানেক পরে এই দেখা হল। সে বিজয় নেই। পরনে কোট আর হাফ-প্যান্ট—তিনটে করে দু-হাতের ছয় আঙুলে ছ-টা আংটি।

বিজয় বলে, কোথায় চলেছ তাড়াতাড়ি? পরশু এসেছি, মামার ওখানে আছি। চল না আমার সঙ্গে, অনেক কথা আছে—কথা বলতে বলতে যাই। গামছায় কি রে?

থতমত খেয়ে কার্তিক বলে, চাল আনতে যাচ্ছি মজুমদার। ধান-চালের কি হয়েছে—লক্ষ্মী যেন অঞ্চল ছেড়েছেন। জেলে নিয়ে পুরবে সেই ভয়ে সমস্ত ধান বেচে দিয়ে এখন এই অবস্থা—

কার্তিকের হাত ধরে বিজয় গড়ভাঙায় ভূষণ দাসের বাড়ি নিয়ে এল। ভিতর-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই, বাইরের আটচালা এবং পাশের একটা কামরা নিয়ে বিজয় আছে। অনুপমেরা বিরাট এক কনস্ট্রাকশন-কোম্পানি খুলেছে, সেই সম্পর্কে বিজয় এসেছে।

দু-দিন মাত্র এসেছে, তা খুব জমিয়ে নিয়েছে বিজয়। আটচালায় লোকারণ্য। তাকে দেখে সকলে কোলাহল করে উঠল।

বিজয় বলে, বোসো তোমরা, এক্ষুণি আসছি।

কামরার দরজায় গিয়ে সে ডাক দেয়, ওরে শুকলাল, শোন—চাল বের কর দিকি—বেশ জুত করে বেঁধে দে চাট্টি এই গামছায়। গয়না নিয়ে যাচ্ছ কোথায় হে? এই মল?

কার্তিক সঙ্কুচিতভাবে বলে, বউয়ের পছন্দ নয় কিনা—মল ভেঙে কানবালা গড়তে দিয়েছে।

হো-হো করে বিজয় হেসে উঠল। বটেই তো, কানবালা চাই, কঙ্কন চাই, হেলোতেলা কত কি চাই—বুঝবে বায়নাক্কা। কাল গিয়েছিলাম একবার মোড়ল-পাড়ার দিকে। কেদার মোড়লের মেয়ে বিয়ে করেছ শুনলাম।

তারপর বলে, তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি তো ফৌত। পেটকাটা ঘরে চামচিকে উড়ছে দেখে এলাম।

কার্তিক প্রতিবাদ করে বলে, কি যে বল! ফৌত হবে কেন? মামা-শ্বশুর কাকিনাড়ার কলে কাজ করেন, সেখানে নিয়ে গেছেন ওঁদের। মামাশ্বশুরের আপন বলতে আর কেউ নেই। ওঁরা আছেন খুব ভাল, রাজার হালে রয়েছেন। খবরাখবর পেয়ে থাকি। পয়সা দিলেও চাল মেলে না, এ পোড়া জায়গায় যার স্থবিধে আছে সে থাকতে যাবে কি জন্যে?

শুকলাল চাল এনে দিল।

বিজয় দেখে তাড়া দিয়ে ওঠে, বেটা হাড়কিপ্পন, এই কটা দিয়েছিস? তোর বাপের ঘর থেকে দিচ্ছিস নাকি? ছোটবেলার এয়ার-বন্ধু—ওর নৌকোয় কত মাছ মেরে বেড়িয়েছি, হা-ডু-ডু খেলে একদিন ঠ্যাং ভেঙে দিয়েছিল হতভাগা—মনে আছে, হ্যাঁ রে কার্তিক?

এবার পালি-ভরতি চাল এনে ঢালল শুকলাল—সের দশেকের কম নয়। প্রসন্নমুখে কার্তিক বলে, দাম দিয়ে যাব। কাল-পরশু যেদিন হোক—

বিজয় বলে, দামের ভাবনায় তো ঘুম হবে না! তোমায় দিয়ে যেতে হবে না ভাই, আমি যাব তোমাদের বাড়ি। গিয়ে বউ দেখে আসব।

কার্তিক নিমন্ত্রণ করল, যাবে তো বটেই, রান্নাবান্নাও সেদিন ওখানে করতে হবে। কবে যাচ্ছ? কাল-পরশুর মধ্যে—

ঘাড় নেড়ে বিজয় বলে, কাল নয়—পরশুও নয়। এ হপ্তায় হবে না। গাঁয়ে গাঁয়ে বৈঠক চলেছে। মনে মনে হিসাব করে বলে, আচ্ছা মঙ্গলবার—সকালবেলার দিকে বাড়ি থেকো।

আটচালার জনতার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, মরবার সময় নেই ভাই। দশ গ্রামের মানুষ এসে বলছে, উপায় করে দাও। তা দিচ্ছিও। সেদিন এক চালানে পাঠিয়ে দিয়েছি—বাষট্টি জন। আট ঘণ্টা ডিউটি—মজুরি

দেড় টাকা, ওভারটাইম আছে। এর উপর কোম্পানি রেশন দিচ্ছে, চাল সাড়ে-ছটাকার দর, সরষের তেল চার আনা—

কার্তিকের দিকে চেয়ে প্রস্তাব করে, তুমিও চল না কেন। গাঁয়ে পড়ে থাকলে উপোস করে মরতে হবে। চাল আর এ তল্লাটে নেই, সরিয়ে ফেলেছে। আমার ফ্রেণ্ড তুমি, তাই বলছি। আচ্ছা, যাচ্ছি তো মঙ্গলবারে—সেই দিন কথাবার্তা হবে।

আটচালার দিকে সে চলল।

(৩)

বিজয় আজকাল সাহেব লোক—কথার ঠিক রাখে। মঙ্গলবারের দিন যথাসময়ে এল। খাতির করে কার্তিক জলচৌকি এগিয়ে দেয়। মহাব্যস্ত বিজয় ঘাড় নেড়ে বলে, মরবার সময় নেই ভাই, কখন বসি? রান্নাবান্নাও আজকে নয়। নারাণ-কোঠার রোয়াকে তোমাদের গাঁয়ের সকলের এসে বসবার কথা।

কার্তিক বলে, সে তো একটুখানি জায়গা। আর বৃষ্টি এসে পড়ে তো চিত্তির। তাদের ডেকে এনে বসাই না আমাদের টিনের ঘরের দাওয়ায়।

তখন যামিনী পুকুরঘাট থেকে জল নিয়ে আসছে। বিজয় বলে, ফুটফুটে বউখানা তো! বাঃ—বাঃ, ভাগ্যি ভালো তোমার।

যামিনীর উদ্দেশে ডাক দেয়, শোন ও নতুনবউ! আহা, আমায় দেখে ঘোমটা কেন? তোমাদের গাঁয়ে মামার কাছে মানুষ। এসে উঠেছিও সেখানে। ছোটবেলা কতবার তোমাদের বাড়ি গিয়ে খেজুর-রস খেয়ে এসেছি, কেদারখুড়ো বলে ডাকতাম তোমার বাবাকে। চিনতে পারছ না? এই—এক গ্লাস খাবার জল দিয়ে যাও তো—

যামিনী ভিতরে চলে গেল। একটু পরে জল নিয়ে এল—সে নয়, কার্তিকের

মা বগলা দাসী। হাঁপানি রোগ আছে বুড়ির ; হাঁপানি বেড়েছে, তবু তাকে পাঠিয়েছে। যামিনী এল না।

বিজয় বলে, উঃ—সুপারি-পাতায় ঘিরে কি অন্তঃপুর বানিয়েছ বাবা! বন্ধুমানুষ, আমার সামনেও বউয়ের দেড়হাত ঘোমটা ?

হেসে উঠল। তারপর বলে, কাজের কথা হোক। তুমি চল। আমার ফ্রেণ্ড—মেট করে দেব তোমায়। দু টাকা হিসাবে রোজ—মাসে ষাট। তা ছাড়া আরও পুষিয়ে দেব এদিকে-সেদিকে। মানুষজন জোটাও দেখি।

এখানকার পাট একেবারে তুলতে হয় যে তা হলে—

বেশ তো—

ক্ষেতখামার, মা-বাপ-বউ—

বিজয় হেসে বলে, কোম্পানি আমাদের পিঁজরাপোল নয়। বুড়োবুড়ি যাবে কোন কর্মে ? বউকে নিয়ে চল বরং—খাসা বউটা। বড় মেজো সেজো অনেক রকমের অনেক মেজাজের বাবুরা আছেন, টাকা তো খোলামকুচি, ওদিকে—ধাঁ করে তোমার উন্নতি হয়ে যাবে।

কি রকম করে হাসছে, কার্তিকের খারাপ লাগে। বিজয় টাকা করেছে, উদারও বটে—কিন্তু মুখের যেন আড় নেই। ঠাট্টা করে বলছে অবশ্য, কিন্তু বড্ড বিশ্রী ঠাট্টা।

নারায়ণ-কোঠার রোয়াকে যারা জমায়েত হয়েছিল, তাদের ডেকে আনা হয়েছে। তামাক সাজতে কার্তিক বাড়ির ভিতর গেল। যামিনীকে বলে, সত্যি বউ, অমন করে ছুটে আসা মোটেই উচিত হয় নি তোর!

আমার ভয় করে।

বাঘ তো নয়—মানুষ। ভালোমানুষ। কি উপকারটা করলে সেদিন!

কিন্তু কেমন করে তাকায়—

তোদের গড়ভাঙাতেই ছিল এতটুকু বয়স থেকে—চেনাজানা বলে তাকায়।

উঁহু, উপকারী মানুষটা—চটে যাবে শেষকালে। জনটন যদি চায়, নিজের হাতে দিস বউ। খুশী হবে।

ওদিকে দাওয়ার উপর বিজয় মুখ-হাত নেড়ে বলছে, ঘোষ ব্রাদার্স কনস্ট্রাকশন-কোম্পানির ঐশ্বর্যের কাহিনী, দু-হাতের ছ-টা আংটি ঝিকমিকিয়ে উঠছে। এই এখানে এক ছটাক চাল পাচ্ছ না কেউ—কোম্পানির গুদাম-ভরতি পর্বতপ্রমাণ চালের বস্তা, পিপে-ভরতি তেল-কেরোসিন। বে-দরদে নেবে, খাবে, যার যেমন দরকার।

পান্নালাল এসেছে, কেউ ডাকে নি—নিজেই এসেছে। সে মৃদু মৃদু হাসছিল।

চটে গিয়ে বিজয় বলে, হাসছেন কেন ?

পুরুষমানুষ, কাঁদতে যে লজ্জা করে।

তার মানে ?

মানুষ জোটাতে পারছেন না, কি মুশকিল ! না খেয়ে মরছে, তবু কেন যে যায় না আপনাদের পিছু-পিছু !

বিজয় বলে, যাবে—এখনো হয়েছে কি ? কাটুক না আরো দু-এক মাস। আপনি পিছন থেকে টিপুনি দিলে কি হবে মশায়। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা—'বাপ' 'বাপ' করে গিয়ে পড়বে।

পান্নালাল বলে, চাল-তেল-কেরোসিনের লোভ দেখাচ্ছেন বিজয়বাবু, একথা কই বলতে পারছেন না তো—দেশের জন্য আমাদের ভাইরা লড়াইয়ে গেছে, তাদের সুখ-সুবিধার দায়িত্ব আমরা যারা ঘরে আছি—আমাদের উপর। বুঝতে দেব না যে তারা পরিবারের বাইরে, আমাদের স্নেহ-যত্ন অহরহ তাদের ঘিরে রাখবে। এই সার্বিক যুদ্ধে নিষ্কর্মা কেউ নয়—আপনারা গ্রামের চাষী-মজুর, আমারা ঘোষ ব্রাদার্স কনস্ট্রাকশন-কোম্পানি—নানা ফ্রন্টের কর্মী আমরা সকলেই। চলুন আমাদের সঙ্গে, স্বাধীনতা-সৈনিকদের জন্য নতুন

নতুন ব্যারাক গড়তে হবে। যৎসামান্য কিছু ভাতা পাবেন। আমরাও দেখুন, সিকি পয়সা মুনাফা করছি না—কায়ক্লেশে খরচটা মাত্র তুলে নিচ্ছি। …বুকের উপর হাত রেখে, পারেন তো, এমনি ভাবে আহ্বান করুন দিকি দেশের মানুষকে—

পান্নালাল স্তব্ধ হয়ে মনে মনে যেন রোমাঞ্চ অনুভব করল এক অপরূপ কল্পনায়। স্বাধীন দেশের নরনারী যেন আমরা—আহ্বান আসছে স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য। গম্ভীর কণ্ঠে সে বলতে লাগল, সত্যি সত্যি তাই যদি হত কেমন হত ভেবে দেখুন। চেঁচিয়ে গলা ভাঙতে হত না। মানুষ পাগল হয়ে ছুটে আসত যদি আপনাদের কোম্পানি ও উপরওয়ালারা দেশের নামে সকলকে ডাক দিতে পারতেন। আমাদের মতো এমন ত্যাগী দরদী আপনভোলা জাত বড় বেশি নেই জগতের মধ্যে—

পান্নালাল চলে গেলেও রুষ্টমুখে বিজয় খানিকক্ষণ তার পথের দিকে চেয়ে থাকে। ছিঁড়ে-যাওয়া আলোচনা কিছুতেই আর জোড়া লাগে না।

কার্তিককে দেখিয়ে সহসা সে বলে উঠল, এই দেখ তোমরা—এত বড় মানী ঘরের ছেলে, এ-ও যাচ্ছে আমার সঙ্গে।

যাচ্ছ নাকি কার্তিক ?

উঁহু, ধান পাকবে যে—আমাদের বাইশ বিঘে জমির ধান—

বিজয় রাগ করে বলে, যাবে না তুমি ?

যাই কি করে মজুমদার ? ধানের কি গতি হবে তা হলে ? সংসার-ধর্ম উচ্ছন্নে যাবে যে !

বৈঠকে সুবিধা হচ্ছে না। প্রথম দলে অনেক কষ্টে যাদের পাঠানো হয়েছিল, কেউ তারা পৌঁছা-খবর অবধি দেয় নি। নানা রকম গুজব রটছে বিজয়ের সম্বন্ধে। পান্নালাল বলেছে ঠিক—কিছুতে মানুষ জোটানো যাচ্ছে না। বুড়োরা তো প্রায় তাকে ছেলে-ধরার সামিল জ্ঞান করছে। না

খেয়ে মরছে, তবু বাড়ির ছেলেদের বিজয়ের বৈঠকে আসতে চুপি-চুপি মানা করে দেয়

মেঘ নেই, প্রখর রোদ। শুকনো মুখে বিজয় গড়ভাঙা ফিরছে। পিছনে কার্তিক। ফাঁকায় এসে সে বউয়ের মল বিক্রি-করা টাকাগুলো বিজয়ের হাতে গুঁজে দিল।

কি ?

সেদিনকার চালের দাম। আজকেও আর কিছু দিতে হবে মজুমদার।

হঠাৎ গলা খাটো করে বলল, তুমি বলেই বলছি—খাওয়া জুটছে না।

বিজয় নোটগুলো মাটিতে ছুঁড়ে দেয়। আগুন হয়ে বলে, আমার কোম্পানি চাল বিক্রি করে না। ভিক্ষেও দেয় না। মর—শুকিয়ে মরে থাক তোমরা সব। হিত-কথা বললে যাদের কানে যায় না, তাদের মরাই উচিত।

পরদিন কি মনে হল—একটা ঠোঙায় করে বিজয় নিজে চাল বয়ে নিয়ে চলল সর্দার-বাড়ি। বাপ-ছেলের কেউ নেই, বগলা দাসী ও-ঘরে পড়ে হাঁপানিতে ধুঁকছে।

বিজয় ডাকল, শোন নতুন বউ—ওহে, ও কেদার-খুড়োর মেয়ে, কার্তিক বলে এসেছিল—চাল এনেছি, নিয়ে যাও।

যামিনী এল।

বিজয় তার দিকে চেয়ে বলে, সোনার বর্ণ কালি হয়ে যাচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া জুটছে না তো—আহা !

হঠাৎ প্রশ্ন করে, রাতে কি রান্না হয়েছিল ? বল—বল—ভাইয়ের মতো আমি, লুকোবে না—

বয়স আর কি-ই বা যামিনীর ! মুখখানা শুকিয়ে গেছে। ঝরঝর করে দু-গাল বেয়ে জল পড়তে লাগল।

বিজয় বলে, যত বেটা কুয়োর ব্যাং কুয়ো ছেড়ে নড়বে না। কাঁহাতক চাল দিয়ে দিয়ে পুষব আহাম্মকগুলোকে? তা কার্তিক না যায়, তুমি যাবে? শুকিয়ে মরে থাকলে কোন্ পরমার্থ হবে শুনি?

বুকের কাছে ঢিব-ঢিব করছে যামিনীর। এসব কি বলে! বিজয় ফিক-ফিক করে হাসছে, মোলায়েম কণ্ঠে বলছে, তাই চল। খেতে দেব, পরতে দেব। ভাত-লুচি শাড়ি-গয়না—যা চাইবে তাই।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বিজয়। ধরবে নাকি? যামিনী ছুটে ঘরে ঢুকে দরজা দেয়। এই হল ভালমানুষ! তার স্বামী পর্যন্ত ঠেলে দিতে চায় তাকে এই বাঘের মুখে।

বিজয় বলে গেল, শোন, রসগোল্লা পাঠিয়ে দিচ্ছি এক্ষুণি শুকলালকে দিয়ে। খেয়ে নিয়ে প্রাণটা তো বাঁচাও। তারপর ভেবে দেখো। তাড়া নেই, আছি আমি আরও দু-পাঁচ দিন।

রসগোল্লা পৌছবার আগেই কার্তিক এসে পড়ল। হাত খালি—চালের ধান্দায় এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে ঘুরে চোখ হয়েছে আগুনের ভাঁটা। যামিনীর কাছে দু-এক কথা শুনেই কার্তিক তার চুলের মুঠি ধরে শুইয়ে ফেলল। পিঠের উপরে দমাদম লাথি।

তুই নিজে নষ্ট। আস্কারা না পেলে বাড়ির মধ্যে আসে? মর—মরে যা—সংসারে নুড়ো জ্বালিয়ে দিয়ে আমিও বেরোই—

দ্বারিক ছুটে এল। বাপের সামনে থেকে কার্তিক সরে পড়েছে। পাগলের মতো দ্বারিক বুক চাপড়াচ্ছে। লক্ষ্মীমন্ত বলে অঞ্চলের মধ্যে নাম—সেই সংসারে আজ ঘরের লক্ষ্মীর শতেক খোয়ার! হায়-হায়, হায়-হায়-হায়!

কাঁদছে আর মাথা চাপড়াচ্ছে দ্বারিক। চোখের জলে বুক ভেসে গেল। দুটো মাস—ভাদ্র আর আশ্বিন—সে যে অনেক দিন! যেন সাঁড়াসাঁড়ির বান

ডেকেছে, ডুবিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রকাণ্ড ভাউলের মতো সংসারটাকে কাছির পর কাছি বেঁধে ঠেকাতে চাচ্ছে দ্বারিক, কাছি কট-কট করছে, ছিঁড়ে গেল বলে! আশি বছর ধরে দিনের পর দিন সাজানো গোছানো—সমস্ত যেন বানচাল হয়ে যাচ্ছে।

শিথিল দেহে অসুরের বল এসেছে। ছুটল বুড়ো তিন ক্রোশ দূরে বউডুবির হাটখোলায় ভূষণ দাসের কাছে।

দাস মশায়, পয়লা তো দেদার পিটছ এবার—

কোথায়? পাঁচ শালার নজর পড়ে, পুলিশ লেলিয়ে দেয়।

দোকানের টিনের চাল দেবে নাকি বলছিলে?

তাই তো ইচ্ছে। হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরছে শালারা, খোড়ো-চালে হয়তো বা আগুনই ধরিয়ে দেয়। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে টিন অমিল—

আমার টিনের ঘর—

বলতে গিয়ে কথা আটকে গেল দ্বারিকের।

বেচবে? অ্যা—বল কি!

গলা ঝেড়ে নিয়ে দ্বারিক বলল, সংসার উচ্ছন্নে গেল, ঘর সাজিয়ে রেখে করব কি? চাল ভেঙে এনে তুমি দোকান-ঘর বাঁধ।

ভূষণ বলে, বেশ। আড়াই শ টাকা দিতে পারি—

দ্বারিক বলে, যা তোমার খুশি। টাকা নয় কিন্তু, ধান—ধান—

তার চেয়ে বাঘের দুধ চাও না কেন সর্দার?

দ্বারিক সর্দারের মতো মানুষ হাত-জোড় করে সামনে দাঁড়াল।

দিতেই হবে। তোমার ভাল হবে দাস মশায়। শালিখানেক অন্তত ধান দাও আমাদের। তোমার অনেক আছে।

ভূষণ দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। অনেক আছে? কোন্ শালা রটাচ্ছে এসব কথা? বদনাম দিয়ে বাড়ি-ছাড়া করবে আমায়।

খপ করে দ্বারিক তার হাত চেপে ধরে। আবার পা ধরতে যায় দেখে ভূষণ পা তুলে আসনপিঁড়ি হয়ে বসল।

দ্বারিক বলে, কত যত্নের ঘর আমার! বাদা থেকে কাঠ আনা, দক্ষিণি কারিগর এনে খুঁটির উপর পল-তোলা। দেখেছ তো—কত বছর লেগেছিল ঐ ঘর বাঁধতে। সমস্ত ভেঙে-চুরে নিয়ে এসগে তুমি। আমার বাগান নাও, পুকুর নাও—ভাদ্র আর আশ্বিন এই দুটো মাস কেবল চালিয়ে দাও ভূষণ। বুড়োমানুষ—বলছি, তুমি রাজ্যেশ্বর হবে, ছাইমুঠো ধরলে সোনামুঠো হবে, আমাদের আশীর্বাদ।

তার মুখের দিকে চেয়ে ভূষণ আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিল। বলে, আচ্ছা, আচ্ছা,—তামাক খাও দিকি। সুলুক-সন্ধান দিচ্ছি, নির্ঘাত পেয়ে যাবে। ধান নিয়ে তো কথা—

(৪)

মানুষ ধান-চালের অভাবে পাগল হয়ে ছুটাছুটি করছে, গাঁয়ে টিকতে পারছে না। ভূষণ দাসের আছে। তা সত্ত্বেও তার ঐ অবস্থা। পালাতে হবে; না পালিয়ে উপায় নেই।

দুপুরবেলা রান্নাঘরে ভূষণ আর বিজয় খেতে বসেছে।

কারা গো, ধুপধাপ করে আসছে কারা?

উঁকি মেরে দেখল, পাড়ারই দশ-বারোটা ছেলেমেয়ে—বিনোদের ছোট ছেলে পটলের খেলুড়ে।

ভূষণ ধমক দিয়ে ওঠে, খেলার সময় নাকি এটা? যা-যা—চলে যা বাড়ি—

তারা দাওয়ার ধারে সরে দাঁড়ায়, বকাবকি কানেই যাচ্ছে না যেন। পা বাড়িয়ে ভূষণ দুয়োর ভেজিয়ে দিল।

কিন্তু পারবার জো নেই বিন্দু-বউর জন্য। দুয়োর খুলে সে বাইরে গেল।

বলে, বোস্ বাছারা—সারি দিয়ে বসে পড়্ দিকি। পাটালির পায়েস রেঁধেছি, খেয়ে যা ছুটি ছুটি।

দাওয়াটা জুড়ে তাদের পাতা পেতে বসাল। এতগুলো প্রাণী—কিন্তু সাড়াশব্দ নেই, চোরের মতো খেয়ে যাচ্ছে।

ভূষণ রাগ করে ওঠে, দিলে তো সব লুটিয়ে-পুটিয়ে? তুমি কি খাবে? মূলোর ডাঁটা?

বিন্দু বলে, কি করব বল? আমার পটল খাচ্ছে, আর ওরা সব শুকনো মুখে ঘুরে বেড়াবে—চোখ মেলে দেখা যায়?

হুঁ, টিকতে দিল না ভিটের উপর। বিজয়ের দিকে চেয়ে ভূষণ হুমকি দিল, তুমি সরে পড় দিকি, তোমার জন্যই যত গণ্ডগোল।

আমার কি দোষ মামা? আমি কি ডেকেছি ওদের? আমার মানুষজন আসে তো বাইরের আটচালা অবধি। চাল নিয়ে সেখান থেকে বিদায় হয়ে যায়।

ভূষণ বলে, যত হাঘরে বাড়ির পথ চিনে যাচ্ছে যে! বড়লোক বলে নাম রটে যাচ্ছে চারিদিকে। তোমার—সেই সঙ্গে আমারও।

এবার বিজয় হাসতে লাগল।

ভূষণ বলে, হাসি নয়। কবে যাচ্ছ বল। তোমার জন্য ডাকাত এসে না পড়ে এ-বাড়ি!

বিজয় বলে, আর দু-চারটে দিন মাত্তোর—

দু-চার দিনেই বা কি হবে? আরো কিছু মড়ক জমবে বটে! কিন্তু মড়া বয়ে নিতে পাঠায় নি তো তোমার কোম্পানি? দেখলে তো হদ্দমুদ্দ, জ্যান্ত থাকতে কেউ তোমার ফাঁদে পা দিচ্ছে না।

বিজয়ও ঠিক এই কথা ভাবছে কদিন ধরে। এ ভাবে সুবিধা হবে না। পান্নালাল যেমন বলছিল—সেই ধরনেরই একটা প্যাঁচ কষে দেখবে নাকি—দেশ-উদ্ধার আর জাপানি-শত্রুর সম্বন্ধে জ্বালাময়ী গোটাকতক বক্তৃতা ছেড়ে?

কৃষক-কনফারেন্সে এত মানুষ মাতিয়েছিল, আর এখন চাল ছড়িয়ে এত যে টোপ দিচ্ছে—চাল নেবার বেলা ভিড় খুব, কাজের কথা উঠলে আর কারো টিকি দেখা যায় না।

খাওয়া সেরে ভূষণ ছাতাটা হাতে নিল। দেরি হয়ে গেছে, বিনোদ দোকান আগলাচ্ছে, বাপ গিয়ে পৌছলে তবে সে খেতে আসবে। চালানি কারবার জোর চলেছে। টাকা হরিহর রায়ের—কলকাতা থেকে তিনি মনি-অর্ডারে টাকা পাঠান, মালপত্র এখান থেকে তাঁর উল্টাডাঙার গুদামে গিয়ে ওঠে। সম্প্রতি এক চালান পাট যাচ্ছে, তিনটে বড় ভাউলে বোঝাই হচ্ছে নদীর ঘাটে। ভূষণের এখন নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই।

বেরোবার মুখে দেখে, আটচালা ঘরে বিদেশি কে-একজন। গায়ের ফতুয়াটা খুলে ফেলে তাই নেড়ে লোকটা বাতাস খাচ্ছে। গলায় পৈতের গোছা। ভূষণকে দেখে বলল, একটুখানি জিরিয়ে যাচ্ছি বাবা। রোদ পড়লেই চলে যাব। এক ঘটি জল আর একটা মাদুর পাঠিয়ে দিয়ে যান—

ভূষণকে কিছু বলতে হল না। মাদুর আর তেলের বাটি পটলের মারফতে চলে আসছে। অর্থাৎ খবর পৌচেছে ইতিমধ্যেই বিন্দুর কানে। পটলকে ডেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিন্দু বলছে, ঠাকুর মশায়ের সেবা হয় নি নিশ্চয়। উনুন পেড়ে দিয়েছি পটল, চান করে দুটো ভাতে-ভাত চাপিয়ে দিতে বল্—

চাদর নেবার উপলক্ষ করে ভূষণ ফিরে আসে। এসে তর্জন করতে লাগল, রাস্তার মানুষের সঙ্গে লৌকিকতা করবে। মেয়েমানুষ—ঘরে বসে খাও—জান না, দিনকাল কি হচ্ছে—

বিন্দু বলে, তা বলে ব্রাহ্মণ উপোস করে থাকবেন গেরস্ত-বাড়ি ?

ব্রাহ্মণ বলে কথা কি—দুনিয়ার কেউ উপবাস করবে, তুমি থাকতে হবার জো নেই। চুল পেকে গেল, তবু ধাত বদলাল না। তদ্বির-তাগাদা করে

যা এক-আধ বস্তা চাল আনি, কর্পূর হয়ে উড়ে যায় তোমার এই রীতের দোষে—

সন্ধ্যার পর ফিরে এসে ভূষণ দেখল, বিজয়ের যথারীতি পাত্তা নেই,—বাইরের ঘরে টেমি জ্বলছে, ব্রাহ্মণটি সেই রকম বসে।

চলে যান নি ঠাকুরমশায়?

অতিথি ঘাড় নাড়ল।

কেন শুনি?

রাগে রাগে সে দাওয়ায় উঠল। জিজ্ঞাসা করে, কেন—হল কি আপনার? রোদ পড়ল না এখনো?

জবাব নেই। ঠাহর করে দেখে, আহ্নিকে বসেছে। প্রবাসে নিয়ম নাস্তি—বিনা উপচারেই চলছে। আহ্নিকের মধ্যে কথা বলতে নেই, আর যতক্ষণ ভূষণ এখানে আছে এ আহ্নিক সারা হবে না কিছুতে।

গলা শুনে বিন্দু চলে আসে! হাত নেড়ে ভূষণকে নামিয়ে নিয়ে চলল। বলে, চেঁচামেচি করছিলে কেন? রোদ লাগিয়ে এসেছেন বুড়ো মানুষ—বললেন, মাথা টিপ-টিপ করছে। রাতটুকু থেকে সকাল হলেই চলে যাবেন—

ভূষণ বলে, হুঁ—যাচ্ছেন! সকালবেলা পা টন-টন করবে এই বলে রাখলাম। করে কিনা মিলিয়ে দেখো।

উঠোনে এসে আবার থমকে দাঁড়াল। ঘরের ভিতর বিস্তর মেয়েলোক। এই পাড়ারই সব। মনের আনন্দে আলাপনাদি হচ্ছিল, ভূষণ এসে পড়ায় থেমে গেছে।

ওঁরা?

বিন্দু বলে, বিষ্যুৎবারে আজ লক্ষ্মীর ব্রত কিনা···সবাইকে ডেকেডুকে আনলাম।

সারা হয় নি?

পুজো-আচ্চা তো হয়ে গেছে। ওঁদের খেতে দিই নি, একেবারে প্রসাদ পেয়ে চলে যাবেন।

মুখ কালো করে ভূষণ বলে, আর ও-বেলা যে প্রসাদ পেলে গুচ্ছের খানেক—তখন কোন বারব্রত ছিল ?

চাপা গলায় বিন্দু বলল, চুপ, চুপ! শুনতে পাবেন। তাদেরই মা-খুড়ি এঁরা তো সব—

ভূষণ বলে, আর বাপ-খুড়োরা জুটছেন কখন, বল তো ? কাল সকালে ? তাঁরাই বা ছাড়বেন কেন ?

বিন্দু পা-ধোওয়ার জল এনে দিল। পায়ের ধাক্কায় ঘটি উলটে দিল ভূষণ। আপন মনে গজর-গজর করতে লাগল, দেখছি শেয়াকুলের কাঁটা দিয়ে ঘিরতে হবে বাড়ি ঢোকবার রাস্তা। তা ছাড়া রক্ষে নেই। আর পরকেই বা দুষি কেন, বাড়ির গিন্নি যখন এই রকম—

অন্ধকারে এই সময় দুটো ছায়া-মূর্তি ছুটতে ছুটতে এল। মতি সর্দার আর তার ভাইপো।

দাস মশায়, কোঁচ মেরেছে তোমাদের বিজয়কে। গোঙাচ্ছে সর্দারদের পগারে পড়ে। রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে।

ভূষণ লাফিয়ে ওঠে, বলিস কি ?

ছেলে-বুড়ো সকলে ছুটল মাদারডাঙা-মুখো। দ্বারিক সর্দারের গোলার পিছনে—জায়গাটা লোকারণ্য হয়ে গেছে। ভূষণ কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে বলে, কই ? কোথায় ?

তখন পগার থেকে বিজয়কে রাস্তার উপর তোলা হয়েছে। কোঁচ বিঁধে আছে ডান-উরুতে, বাঁ-দিকে কাত করে তাকে শোয়ানো হয়েছে। দ্বারিক ছুটে ঘর থেকে বালিশ এনে গুঁজে দিল তার ডান পায়ের নিচে, আহত জায়গায় যাতে নাড়া-চাড়া না লাগে।

ভূষণ আর্তনাদ করতে লাগল, ওরে বাবা, একি হল রে!

ম্বারিক নাকি পরীক্ষা করছিল। বলে, আছে এখনো। সদরে এক্ষুণি রওনা করবার ব্যবস্থা কর, দাস মশায়। নৌকা তো নেই—ডোঙার উপর চালি করে একে শুইয়ে দিতে হবে।

মতি সর্দারের বাড়ি বাঁকাবড়শি, হরিহর রায়ের বাড়ির কাছেই। সে আর তার ভাইপো কুটুম্ববাড়ি থেকে ফিরছিল। নিজেরা না খেয়েও কুটুম্বর মুখে দুটো ভাত দেবার জন্য লোকে আঁকুপাঁকু করে, কুটুম্বর কাছে সহজে ছোট হতে চায় না—সেই ভরসায় কুটুম্ববাড়ি যাতায়াত বড্ড বেড়ে গেছে ইদানীং। অবশ্য মুনাফা নেই—সেই কুটুম্বরাও আবার বেরিয়েছে তো! তারাও পাল্টা এসে হাজির হচ্ছে এ-পক্ষের বাড়ি।

এই অবস্থার ভিতরও মতি সর্দার সবিস্তারে গল্প করছিল, কি আর বলব দাদা, আগে থাকতে তারা বোধ হয় খবর পেয়ে গিয়েছিল। গিয়ে দেখলাম, ভোঁ-ভোঁ—দরজার শিকল-তোলা। ভাইপো বলে, কি হবে খুড়ো মশায়? আমারও পিত্তি জলে গেছে। বললাম, কুটুম্ব হয়ে এই রকম যখন ব্যাভার—জলস্পর্শ করব না হারামজাদাদের এখানে। ফিরলাম ধুলো-পায়েই। এই অবধি এসেছি, ভাঁটবনের ভিতর শুনি গোঁ-গোঁ করছে। কি রে? কেঁদো ভেবে ভাইপো তো জড়িয়ে ধরেছে আমায়···

খবর শুনে বিনোদও দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে ছুটতে ছুটতে এল। বিজয় তখন একটু সামলেছে, কথা বলছে চিঁ-চিঁ করে।

বিনোদ বলে, এখানে এসেছিলে কি করতে হে? তোমার মাদারডাঙার বৈঠক তো কবে সারা হয়ে গেছে।

কিচ্ছু জানি নে বড়-দা, কেমন করে এলাম। টের পেলাম, যখন পিছন থেকে ঘ্যাচ করে বিঁধিয়ে দিল। আমি বাঁচব না বড়-দা—

হাউ-হাউ করে সে কাঁদতে লাগল।

ভূষণ বলে, এই—গেরিলা-যুদ্ধের প্রাকটিশ শুরু হল এইবার। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে পড়ে, দেখ। চাষা ক্ষেপিয়ে দিয়ে তারা তো দিব্যি

সরে পড়েছে—এখন সামলাও ঠেলা। পই-পই করে মানা করেছিলাম, কানে না নিয়ে তখন যে বড় মাতব্বরি করতে গিয়েছিলে! ঠিক হয়েছে। এখন কাঁদলে কি হবে বাপধন?

দ্বারিকের যুক্তিই ঠিক। কোঁচ খুলে ফেলতে ভরসা করা যায় না এ জায়গায়। যদি হাড়-মাংস বেরিয়ে আসে, রক্ত-স্রোত বন্ধ করা না যায়! সালতি-ডোঙায় বিজয়কে সদরে রওনা করা হল, বিনোদ গেল সঙ্গে।

রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে। নারিকেল-পাতার কাড়ু জ্বালিয়ে গ্রামের আট-দশটা মানুষ আগু-পিছু নিয়ে ভূষণ বাড়ি ফিরল।

বিন্দু সভয়ে বলে, কাঁপছ যে তুমি ঠক-ঠক করে?

শীত লেগেছে। আমার বুকের মধ্যে কেমন করছে। লেপ পেড়ে দাও বউ, গায়ে দেব।

(৫)

ভূষণ সেদিন দ্বারিককে চুপি-চুপি বলে দিয়েছিল খাঁ-বাজারের কথা। অনেক দূর—আর একটা জেলা; জলমা থেকেও তিনটে জোয়ার ও দেড়-পো ভাঁটি লাগে। এখান থেকে পায়ে হেঁটে কিম্বা ডোঙা বেয়ে চলে যাও জলমা অবধি। তারপর স্টিমারে দেবগ্রাম। সে অঞ্চলে নৌকো আটক নেই। দেব-গ্রামের ঘাটে বড় বড় সাঙড় থেকে টাপুরে ডিঙি—সকল রকম নৌকো ভাড়ায় পাওয়া যায়। অত্যন্ত চুপি-চুপি নৌকো ঠিক করতে হবে, নয় তো টের পেয়ে গেলে বিস্তর ভাগিদার জুটে যাবে। ধানের জন্য সবাই মরীয়া—কে কি তদ্বির করছে, কাউকে ঘুণাক্ষরে বলবে না। মন্বন্তরে মানুষ স্নেহ-প্রীতি-আত্মীয়তা ভুলে গেছে।

এদিককার লোকে খবর রাখে না—বিস্তর ধান ওঠে খাঁ-বাজারে, যত চাও। তিন হাট আগে ভূষণ নিজে কিনতে গিয়েছিল। অতএব খাঁটি খবর।

খাঁ-বাজারের যত কাছাকাছি আসছে, নানা অঞ্চলের নৌকো আগে-পিছে ছুটছে। সবাই একমুখো চলেছে, ত্রিশ-চল্লিশখানা হয়ে দাঁড়াল।

খালের ভিতর দিয়ে ভাঁটি বেয়ে হাটে পৌঁছতে হয়। হৈ-হৈ চিৎকার উঠল। পোশাক-পরা সিভিক গার্ডের দল ছুটেছে খালের দিকে। ভারী বুটজুতোর খটখট শব্দ। ধান এক কণিকা জেলার বাইরে যাবে না। তা হলে যা এখনও পাওয়া যাচ্ছে এদিকে-ওদিকে, সমস্ত শুষে নিয়ে যাবে মন্বন্তর-অঞ্চলে। তেঘরার বাঁক থেকে এই সব নৌকো ফেরাবার চেষ্টা হয়েছিল ; মস্ত বড় গাঙ, ঠেকানো যায় নি—কে কোন্ দিক দিয়ে বেরিয়ে এল। এখানকার এই খালটা ছোট, পুল আছে—কংক্রিটে তৈরি, ফোকরওয়ালা। পুলের ফোকরের মুখ আটকে দাঁড়াল লাঠি হাতে কনেস্টবল আর সিভিক-গার্ডের দল।

বাঁক ঘুরে নৌকো দেখা দিল। খালের জল ঢেকে গেছে, প্রকাণ্ড বহর সাজিয়ে আসছে। নৌকোওয়ালারাও দেখতে পেয়েছে। তারা পাল্টা চেঁচিয়ে ওঠে, আয়—এগিয়ে আয় সুমুন্দিরা, গেঁথে ফেলব এক-একটা সড়কির মাথায়—

সত্যিই সড়কি এনেছে, মাঝিরা উঁচিয়ে ধরেছে—তীক্ষ্ণ ফলার উপর রোদ পরে চকচক করছে। দাঁড়িরা দাঁড় খুলে এক একখানা কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়েছে মাঝিদের পিছনে।

থানা কাছেই। খবর পেয়ে দারোগা বন্দুক নিয়ে ছুটে এলেন। কিন্তু বন্দুকে ভয় পায় না, পেটের খিধে এত সাহস এনেছে মানুষের মনে। আর বন্দুক শুধু দেখাবার কথা—বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ছুঁড়বার হুকুম নেই। ছুঁড়তেও মায়া লাগে, বুকের পাঁজরা একটা-দুটো করে গোনা যায় ঐ মহাবীরগুলোর—ছুঁড়বে কোথায় ?

খানিকটা হল্লা করে দারোগা চলে গেলেন। চাকরি বাঁচানো নিয়ে কথা—তা এতেই ঢের হয়েছে। গঞ্জের লোক দেখেছে, চেষ্টার তিনি কসুর করেন নি। মনে মনে একবার হয়তা ভাবলেনও ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে হাতি গলে যাচ্ছে—

কে নয় চোর? শিরে সর্পাঘাত, তাগা বেঁধে বিষ আটকাবে কোনখানে? আহা পেরে ওঠে তো হতভাগারা খাক না দু-এক গ্রাস চুরি-চামারি করে।

তিন-চার দিন ধরে ঢ্যাঁড়া দিচ্ছে, দশ টাকা মনের বেশি ধান কেউ বেচতে পারবে না। বেচলে জেল হবে, অথবা জেল-জরিমানা দুই-ই হতে পারবে—

শুনছ হে, কি বলে গেল?

বলুকগে। কতই তো বলছে ও-রকম। তেলের দর বাঁধছে, আটা-ময়দার দর বাঁধছে, মস্ত দরের ফিরিস্তি ছাপিয়ে টাঙিয়ে দিচ্ছে। ওদের মতো ওরা করে যাচ্ছে, আমাদের মতো আমরা কিনে-বেচে যাই—

কিন্তু সেদিন সত্যি সত্যি বিষম কাণ্ড হয়ে গেল একটা। নদীর ধারে বটতলা গোবর-মাটি দিয়ে নিকানো। ব্যাপারিরা ধান এনে ঢালে সেইখানে। দুপুরের পর থেকেই বেচা-কেনা জমে। সকালবেলা এখন জন কুড়ি-পঁচিশ মাত্র ধান এনেছে, খদ্দের-পত্তোরেরও ভিড় নেই। দ্বারিক ভরসা করে বিকাল অবধি থাকতে পারে না। বিক্রির জন্য ধান এনে এনে নামাচ্ছে, দেখেও যেন বিশ্বাস হতে চায় না। তাড়াতাড়ি তারা বস্তা নিয়ে নৌকো থেকে নেমে এল। ধান ঢালছে, কয়াল খুব ব্যস্ত—কাঁধের গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে আর ধান মেপে চলেছে, রামে এক—রামে দুই—রামে তিন—কই হে ঢাল ব্যাপারি, আরও লাগবে—খুঁচি পুরল কই?

তুখড় কার্তিক বিড়ি বের করে কয়ালের হাতে দেয়। বলে, একটু জিরিয়ে নাও কয়াল মশায়। ঘেমে নেয়ে উঠছ, ছেলের হাতে দাও না খুঁচিটা—মাপতে লাগুক। শোন—

হাটের বাইরে একটু দূরে ডেকে এনে বলে, দেখে-শুনে কিনে দিতে হবে। শ' দুই টাকার মাল।

কয়াল প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে। ধান এখন সোনার চেয়ে মাগ্যি। ও আমি পারব না। মার খেয়ে মরবে কে?

পেটে খেলে পিঠে সয়। ধর—

দুটো টাকা তার হাতে গুঁজে দিল। কয়াল বলে, দু-দশ টাকার কর্ম নয় রে দাদা—

দু-টাকার নয়, দশ টাকারও নয় ?

কয়াল রাগ করে বলে, তোমাদের কি আক্কেল-বিবেচনা আছে ? পাঁচ টাকার ধান ষাট টাকায় কিনতে এসেছে, আর আমাদের বেলাতেই তখন হাত শুকনো—

মীমাংসা একটা হল শেষ পর্যন্ত। মাপের মুখে কয়াল ভাল করে পুষিয়ে দেবে। আড়াই-সেরা খুঁচিতে ধান মাপ হয়, টেনে মাপলে ওতে তিন সেরের কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়া যায়।

হাণ্টার নিয়ে দারোগা দেখা দিলেন এই সময়।

দশ টাকার বেশি মন বেচতে পারবে না। বে-আইনি।

ব্যাপারি বলে, কেনা যে হুজুর সাড়ে বারো—

কেন, কেন ? কেনাও অপরাধ, জেল হয়ে যাবে।

আচ্ছা হুজুর। বুঝতে পারি নি। যা হয়েছে হয়েছে—আজকের দিনটা বিক্রি করে যাই।

যাদের ধান তখনো হাটে নামায় নি, গতিক দেখে ছুটোছুটি করে তারা পালায়।

দারোগা বললেন, সমস্ত ধান সীজ করা হল। যারা কিনতে এসেছ, লাইনবন্দি হয়ে দাঁড়াও। এদের গুনে ফেল তো করালীচরণ—

এগারো জন হল।

ছারিক এগিয়ে এসে বলে, আমারও কি দাঁড়াতে হবে হুজুর ? আমার কেনা হয়ে গেছে, ঐ ছোট গাদাটা আমার। হুকুম হয় তো নৌকোয় তুলি। অনেক দূরের পথ—

কত দূর ?

অনেক দূর হুজুর, পাইকঘেরি থানা—সেখান থেকেও ক্রোশ তিনেক। দুঃখের কথা কি বলব—হাজার টাকা খরচ করে ও-বছর টিনের ঘর বেঁধেছিলাম, আড়াই শ' টাকায় বেচে দিয়ে ধান কিনছি।

দারোগা বললেন, ভিন্ন জেলায় ধান সরাবে আর এখানকার মানুষ মরবে উপোস করে?

কয়ালকে হুকুম দিলেন, এ ধান তোমার জিম্মায় থাকল মহাদেব। এর এক চিটেও যেন না নড়ে।

দ্বারিক হাহাকার করে ওঠে, হুজুর পেটে খাব বলে সাধের ঘর বেচে এলাম। ঘর গেল, পেটেও দানা পড়বে না? যাবেন না, চলে যাবেন না, বলে দিন কি হবে—

দারোগা ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, দশ টাকা দরে এখানকার ঐ এগারো জনের মধ্যে ভাগ হবে এই ধান। বিদেশি মানুষ, ভালোয় ভালোয় সরে পড়, নয় তো প্যাঁচে পড়ে যাবে—

হাণ্টার আস্ফালন করে বললেন, পালা—পালা বলছি—

বিকেলবেলা বেচাকেনা যখন জমজমাট হবার কথা—দেখা গেল, হাটের সেই নিকানো বটতলা খাঁ-খাঁ করছে। একটা ব্যাপারি নেই, খদ্দেরের পর খদ্দের এসে মাথায় ঘা দিচ্ছে, দারোগাকে গালিগালাজ করছে মনে মনে।

আমবাগানে গা-ঢাকা দিয়ে কে যাচ্ছে ওদিকে?

আমি গো আমি। মেয়ের বাড়ি গিয়েছিলাম, বাড়ি ফিরছি এখন।

কাঁধে কি ওটা? বস্তা? ধান? কোন্ নবাবের ঘরে মেয়ে দিয়েছ, মেয়ে ধান দিয়েছে বাপের কাঁধে তুলে?

দিয়েছে চুরিচামারি করে। কেন নজর দিচ্ছ বাপু?

কোথায় পেয়েছে এ ধান, লোকটা কিছুতে ভাঙতে চায় না। কার্তিকও

তেমনি আছোড়বান্দা। শেষে ভয় দেখায়, থানায় ধরে নিয়ে যাব এই ধানসুদ্ধ। বুঝবে মজা। এই বেলা বল শিগগির—

বিল দেখতে পাচ্ছ, ঐ যে একটানা ধানবন—ডিঙি বা ডোঙা নিয়ে ঘুরলে কিংবা নজরে খুব জোর থাকলে দেখতে পাবে, ধানের মাথা ছাড়িয়ে এক-একটা লগি উঁচু হয়ে উঠছে এক-এক জায়গায়। ভাল করে নজর করতে-না করতে লগি ডুবে যাচ্ছে। এই হল সঙ্কেত, এর থেকে বুঝে নেবে বৃত্তান্ত। ধানের জন্য মানুষ জল-কাদা ভেঙে বিল ঝাঁপিয়ে ছুটছে ঐ সব লগি নিশানা করে। সৌভাগ্যবান যারা দু-পাঁচ খুঁচি জোটাতে পেরেছে, সন্ধ্যার আঁধারে অপথে-বিপথে চুপি চুপি তারা গ্রামে ওঠে। আগে বিক্রি হচ্ছিল খাঁ-বাজারে প্রকাণ্ড বট-ছায়ায়, এখন বাজার বসে গেছে দিগন্তব্যাপ্ত বিলের সর্বত্র।

জমাদার এসে রিপোর্ট করছিল দারোগার কাছে—এই এক আচ্ছা কায়দা বের করেছে হুজুর। আমাদের কারো গন্ধ পেলে তক্ষুণি লগি নামিয়ে নেয়। কসাড় ধানবনে কোন্ ব্যাপারি কোথায় ঘাপটি মেরে আছে—কার সাধ্য খুঁজে বের করে! আইনকে ফাঁকি দিচ্ছে এই ভাবে।

দারোগা বললেন, তোমাদের বলে রাখছি, একা-দোকা ওসব জায়গায় গোঁয়ার্তুমি করতে যেও না কেউ। খিদেয় হন্যে হয়ে গেছে।... দেশি মানুষ এরা—কিছুকগে ধান যে ভাবে পারে, তবে বিদেশি নৌকোর উপর খুব কড়া নজর রাখবে। এক চিটে ধান বাইরে চলে যেতে না পারে—

হল্ট—খাড়া রও—

মড়া হুজুর, বল হরি, হরিবোল—

খোল্ মড়া। দেখব।

মেয়েছেলে হুজুর—

অর্থাৎ, মেয়েছেলে মরে গেলেও যেন তাদের আবরু থাকে! মেয়েছেলের কথা বললে দেখতে চাইবে না, ছেড়ে দেবে।

বজ্রকণ্ঠে জমাদার বলে, নাম্বা বলছি।

তখন কাঁধের বোঝা ফেলে দিয়ে বাপ-বেটা দৌড় দেয়। দফাদারের লাঠি পড়ল সটান দ্বারিকের মাথায়।

বাবা গো!

রক্ত দরদর করে পড়ছে, তবু দ্বারিক দৌড়চ্ছে। দৌড়—দৌড়—। দু-খানা পা শুধুই সম্বল আজকে পৃথিবীতে, পা চালাচ্ছে পুরোদমে—আর যে চলে না! ঠক-ঠক করে কাঁপছে, আশি বছরের অতি-পুরানো জীর্ণ হাড় দু-খানা বিশ্রাম চাচ্ছে। রাস্তা, রংচিতের বেড়া, ওপারে অড়হর-ক্ষেত। লাফিয়ে পার হতে গিয়ে সে পড়ে গেল বেড়ার পাশে। কাশবন আর কাঁটাঝিটকের ঝাড়—বাঃ, খাসা জায়গা তো! কি সুন্দর তুলোর গদি পেতে রেখেছে! আ-হা-হা—

কার্তিক কিন্তু ধরা পড়ে গেল। সে ছুটছিল সদর রাস্তা বেয়ে। না খেয়ে যত দুর্বল হোক, কেউ তার সঙ্গে ছুটে পারে না। কিন্তু খাল সামনে পড়ে গেল। খালে সাঁকো-পুল কিছু নেই। পিছনে চার জন ধর্-ধর্ করে আসছে। কার্তিক ফিরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। হাত দু-খানা একত্র করে দাঁড়িয়ে আছে। এসে বাঁধুক ওরা, উপায় কি?

রাত্রি হল। কার্তিককে লক-আপে নিয়ে রেখেছে। এখন দিব্যি আরাম লাগছে। বাঁচা গেল, পেটের ক্ষিধেয় আর এদেশ-সেদেশ করে বেড়াতে হবে না। ঝিমোচ্ছে ··

বাড়িতে যামিনী আর মা। যেন স্বপ্নের ঘোরে কার্তিক হেসে উঠল। ভাতের হাঁড়িতে জল চাপিয়ে বসে আছিস নাকি তোরা? থাক বসে। যাচ্ছে, যাচ্ছে ধানের ভরা। গাঙের ঢেউয়ে দুলে দুলে যাচ্ছে—

ওদিকে জমাদার হেসে হেসে দারোগার কাছে কৃতিত্বের কাহিনী বলছে, শুনুন স্যর, কি রকম বুদ্ধি বের করেছিল। নৌকো থেকে মাদুর নিয়েছে,

পালের বাঁশ খুলে নিয়েছে। ধান ছোট ছোট বস্তায় পুরে মাদুর জড়িয়ে বাঁশে বেঁধে এমনভাবে গাঙের ঘাটে নিয়ে আসছিল—ঠিক যেন মড়া। আমরাও তক্কে তক্কে ছিলাম—

নটা বাজল ঢং‌ঢং করে। ঘুমের আবিল কেটে কার্তিক তড়াক করে উঠে বসল। চেঁচিয়ে ওঠে, ভাত দেবে কখন তোমরা? দু-দিন খাই নি, জান?

যেন এখানে আগাম পয়সা চুকিয়ে দিয়ে রেখেছে—এই রকম ভাব।

লোহার রেলিঙের ওদিক থেকে করালী দফাদার জবাব দেয়, পোনামাছের কালিয়া চাপানো হয়েছে বাবাজি। সম্বরা দিয়ে ভাত-ব্যঞ্জন সাজিয়ে নিয়ে আসছেন তোমার শাশুড়ি—

সাত চোরের মার খেয়েছে কার্তিক, মাথায় গোলমাল লেগেছে, ঠাট্টা বুঝতে পারে না। বলে, তা হলে এক ঘুম ঘুমিয়ে নেব না কি? কি বলেন?

আঃ—বলে ধূলোর উপর মাদুর-মোড়া সেই ধানের বস্তাগুলো মাথায় দিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে কার্তিক চোখ বুজল।

নবম পরিচ্ছেদ

(১)

বাইরে গেরিলা-আতঙ্ক, ঘরের মধ্যে বিন্দু-বউর লক্ষ্মীপূজা এবং শিশু ও ব্রাহ্মণসজ্জনের সেবা। পৈতৃক বাড়ি ছাড়তেই হবে।

সন্ত্রস্তভাবে দিন পনের কাটিয়ে একদিন দোকান থেকে ফিরবার সময় ভূষণ গণ্ডা তিনেক তালা নিয়ে এল।

বিন্দু হেসে বলে, এই বুদ্ধি করেছ বুঝি? বাড়ির রাস্তায় কাঁটা না দিয়ে বাড়ির গিন্নিকে তালা আটকাবে?

ভূষণ বলে, তালা দুয়োরে দিয়ে বেরুব। যেখানে যাচ্ছি, শেয়ালকুলের চেয়েও জবর বেড়া সেখানে।

কোথায়?

হরিহর রায়ের বাড়ি। কেউ নেই—অন্দর বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। রায় মশায়কে তাই চিঠি লিখেছিলাম। জবাব এসেছে। ওখানে গিয়ে আমাদের থাকতে বলেছেন।

বিন্দু রাগ করে বলে, ছি-ছি-ছি! ভাতের কাঙাল দু-চার জন আসে—ভিটে ছেড়ে পালাচ্ছ তাদের ভয়ে?

উঁহু, প্রাণের ভয়ে। গলা খাটো করে ভূষণ বলতে লাগল, মেয়েমানুষ—বারো হাত কাপড়ে কাছা নেই, অবস্থা তাই তোমার নজরে আসছে না। এত বড় এই গাঁয়ের মধ্যে ভরপেট দুবেলা খাচ্ছি কেবল আমরা। শালাদের হিংসে হচ্ছে। বিজয়কে মেরেছিল—সে অবশ্য ধরি নে। কু-নজর দিত নাকি মেয়েছেলের উপর। তা হলেও সামাল হয়ে থাকা দরকার। যত বেটা

হেলো-চাষা কোঁচ-সড়কি শানিয়ে বসে আছে শত্রু-বধের জন্ত। কি কাণ্ড করে গেছে রায় মশায়ের মেয়ে! কনফারেন্স না গুষ্টির পিণ্ডি। তারা তো দিব্যি শহরের তেমহলায় পা দোলাচ্ছে, এখন মর্ শালারা যারা গাঁয়ের জল-জঙ্গলে পড়ে আছিস।

বিন্দু বলে, তা এই পথটুকু ভেঙে ওরা বুঝি বাঁকাবড়শি অবধি যেতে পারবে না?

ভূষণ হেসে বলে, তারও এক বেড়ে কায়দা হয়েছে। লঙ্গরখানা খুলেছে রায় মশায়ের মণ্ডপ-বাড়ি। রেগেমেগে যায় তো যাবে সেই অবধি। তারপর চার চার হাতা খিচুড়ি। রাগ জল হয়ে গিয়ে ভরা-পেটে সব জকার দিতে দিতে ফিরে যাবে। অন্দরবাড়ি অবধি কেউ এগুবে না।

নিশুতি গ্রাম শ্মশানের মতো। ভূষণ, বিনোদ আর বউ-ছেলেমেয়েরা চলেছে। দিনমানে যাওয়া যায় না, দশকথা উঠবে, দশরকম জবাব দিতে দিতে হিমসিম হতে হবে। লোকে চোখ ঠারাঠারি করবে, ভূষণ দাস আর কাজি-পাড়ার সখিনা বিবিতে তা হলে তফাত রইল কোনখানে?

বাঁকাবড়শি গ্রামের ভিতর এসে মনে হল, সাঁ করে কারা আমবাগানের ছায়ার অন্ধকারে সরে গেল।

বিনোদ চড়া গলায় প্রশ্ন করে, কে?

জবাব নেই। ভূষণ বলে, চল—চল। চোর-ছ্যাচোড় হবে হয়তো। বিনোদ তবু হ্যারিকেন উঁচু করে কয়েক পা চলল সেইদিকে।

মতিরাম যেন! কি হচ্ছে ওখানে?

মতি বলে, গাঁ ছেড়ে চললাম—

চলবে তো রাস্তা দিয়ে—জঙ্গলের মধ্যে কেন?

মতি এগিয়ে এল খানিকটা।

যাচ্ছিলাম। তা মেয়ে ছুটোও যাচ্ছে কিনা, তোমাদের দেখে সরে দাঁড়াল।

ভূষণ আশ্চর্য হয়ে বলে, রাত্তিরবেলা এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে মেয়েছেলে নিয়ে যাচ্ছ ?

দিনমানে যাব কি করে ?

নিজের পরনের কাপড়ের দিকে তাকাল মতি। পরিধেয়ের যে অবস্থা—পুরুষমানুষ, বুড়োমানুষ—তার পক্ষেই এদের সামনে হ্যারিকেনের আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা শক্ত। কিছু আর ব্যাখ্যা করে বলতে হয় না।

ভূষণ কোমল কণ্ঠে বলে, যাচ্ছই বা কেন মতি ? বাড়ির পাশে এমন তোফা লঙ্গরখানা হয়েছে। রায় মশায় আদেশ করেছেন, আমি নিজে তদারক করব কাল থেকে। এদ্দূর থেকে জুত হবে না বলে সবসুদ্ধ চলেছি রায়বাড়ি। তোমাদের জন্যেই যাচ্ছি, এই দেখ, নিজের বাড়ি-ঘর-দোর ছেড়ে।

এই যুদ্ধ ও আকালের দিনে অনেক বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে 'লঙ্গরখানা' নামক নূতন কথা এবং নূতন অনুষ্ঠানটির সম্বন্ধে সম্প্রতি পরিচয় ঘটেছে গ্রামবাসীদের। বিনামূল্যে হাতা চারেক গ্রুয়েলের বন্দোবস্ত—তা সত্ত্বেও দলে দলে এই রকম চলে যাচ্ছে, প্রায় প্রতি রাত্রেই। এতবড় অঞ্চলটা দিনমানে যেন মরে থাকে, বিবস্ত্র মানুষ পথে-ঘাটে বেরোতে পারে না,—কিন্তু সকালবেলা খোঁজ নিয়ে দেখগে, খাঁ-খাঁ করছে এবাড়ি-ওবাড়ি।

ভূষণ জিজ্ঞাসা করল, তা চললে কোথা তোমরা ?

মতি বলল, ঠিকঠাক নেই সে রকম কিছু ; শহরে-বাজারে কোনখানে—

ভূষণ আগুন হয়ে ওঠে। বড্ড কুলীন হয়েছ—না ? রায় মশায়ের মণ্ডপে খেতে সরম লাগে, আর শহরে বুঝি থালা সাজিয়ে নিয়ে বসে রয়েছে ? যাও—টের পাবে মজা।

সেটা অবশ্য আন্দাজ করতে পারে মতি। শহরের খবরও কিছু-কিছু এসে গেছে গ্রাম অবধি। তবু শহরে যা চলবে, গ্রামে বাপ-পিতামহর ভিটেয় বসে তা চালায় কি করে ? কটা বছর আগেও তার বাড়ি দুর্গোৎসব হয়েছে, তিন জন ঢাকি ঢাক বাজিয়েছে অহরহ। কত লোকের পাতে ভাত দিয়েছে সে সময়।…

পুবপাড়ার শীতল সামন্তও রওনা হচ্ছে। বোঁচকা বেঁধে কাঁধে নিয়েছে। পিছনে শীতলের মা-বোন সেজ ছেলেটা আর কোলের মেয়ে। উনুন ভেঙে দিল, আর কেউ এসে না রাঁধে—গৃহস্থর উনুনে পথের মানুষ কেউ এসে রাঁধাবাড়া করবে, বিষম অলক্ষণ সেটা! কিন্তু কে-ই বা আসবে, আর রাঁধবেই বা কি! চিরকালের সংস্কার—মন বোঝে না তাই।

যেতে যেতে শীতলের ছেলে বলে, দাঁড়া, পিসি, দোরঘুড়িটা রয়েছে মাচার উপর – নিয়ে আসি। পিসিরও মনে পড়ে যায়, তাই তো—মাচা-ভরতি তোলা রইল তার মশালের গাদা। পাটকাঠিতে গোবর দিয়ে সমস্ত মাঘ মাস সে মশাল বানিয়েছিল বর্ষাকালে পোড়াবে বলে।

কাজি-পাড়ায় শোন, গলা ফাটিয়ে কাঁদছে সখিনা বিবি, ধুলোয় আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। ওদের যে আমি এক কুড়ি বছর চোখে-চোখে চৌকি দিচ্ছি—কার কাছে রেখে চলে যাব? বছর কুড়ি আগে সখিনার একটা চুল পাকে নি, দেহে কুঞ্চনরেখা পড়ে নি—তিন দিনের আগ-পাছ তার বর ও ছেলেটা মরে যায়। উঠানের ধারে তেঁতুলতলায় তাদের কবর। বাড়ি বাড়ি ধান ভেনে অনেক দুঃখে এতদিন ভিটেয় ছিল—শুধু ভিটের মাটি চিবিয়ে থাকবে আর কেমন করে?

(২)

মতির দলটা আর খানিক এগিয়ে মাঠের ধারে ফাঁকায় এসে দেখে—পান্নালাল। হাতে লাঠি, পান্নালাল টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। মনের বিশ্বাস আলগা হয়ে যাচ্ছে যেন এতকাল পরে। কি রকম সে হয়েছে আজকাল! লোকের ধারণা, পণ্ডিতের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ভূষণও হরিহর রায়কে এক চিঠিতে তাই লিখেছিল।

শ্মশান-রক্ষীর মতো রাত্রে, কদাচিৎ বা দিন-দুপুরে, দীর্ঘ পদক্ষেপে পান্নালাল এ-গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে বেড়ায়। নিরীহ নিষুপ্ত এই এদেরই জন্য

সে সর্বত্যাগী। অদৃষ্টকে গালি দিয়ে এবং যে-দোকানি একটা দেশলাই এক আনা দামে বিক্রি করেছিল একমাত্র তাকেই দায়ী করে নিঃশব্দে এরা বিদায় হচ্ছে। ঐ দোকানদার-মজুতদার ছাড়া আর কারো নামটা উচ্চারণ করবারও উপায় নেই পরাধীন দেশে। কোথায় কোন্ দূর-সমুদ্রে বোঝাই জাহাজ নিঃশব্দে নিঃসীম দিগন্তে বিলীন হচ্ছে, আমাদের কোন্ শাসক কর্ণধার লাখ লাখ ঘুষের টাকা কোথায় রাখবে, জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না—এ সব খবর কেউ কেউ জানেও যদি, কে বলবে মুখ ফুটে? হাঁ করে আছে আইন, গ্রাস করে বিলুপ্তির অন্ধকারে অমনি নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। বেপরোয়া যারা বলতে পারত, তাদের জেলে পুরে পিশাচ-নৃত্য চলেছে দেশ জুড়ে। রণক্ষেত্রের প্রান্তবর্তী বাংলাদেশে অটুট শান্তি—কর্তৃপক্ষের গর্ব করবার কথাই বটে! কিন্তু সমস্ত জেনে শুনে পান্নালাল কি করবে এখন? রাগে শুধু হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে। জেলের কয়েদির মতো কিছুই করতে পারছে না, দাঁড়িয়ে চোখ মেলে এই ভয়ানক ধ্বংস-স্রোত দেখা ছাড়া!

মতিদের দেখে সে থমকে দাঁড়াল।

তোমরাও চললে তা হলে তীর্থিধম্মে?

মতি চুপ করে রইল।

বেরোও বেরোও। আপদ-বালাই যত আছ, দূর হয়ে যাও গ্রাম থেকে। দূর—দূর—

লাঠি তুলে এমনভাবে ঘুরে দাঁড়ায় যে মাথায় একটা বাড়ি মেরে বসেই বা! কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আর পান্নালাল চেয়েও দেখল না, ছুটে চলল অনতিদূরে কানা-কোদার বাড়ির দিকে।

আতরমণির আর্তনাদ আসছে, খেয়ে ফেলল—ও বাবা, আমায় যে খেয়ে ফেলল একেবারে!

কানা-কোদা মরে গেছে না খেতে পেয়ে। লাজুক কবি—আসরের মধ্যে

ছিল সিংহের মতো দুর্ধার। মরবার দিনও সকালবেলা বটতলার ছাপা অতি-জীর্ণ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণখানা পড়েছিল। যদি আবার গাওনা হয় কোনখানে, প্রতিপক্ষ বেকায়দায় ফেলে—পুরাণ-প্রসঙ্গ জানা না থাকলে ব্যূহভেদ করবে সে কেমন করে ?

যে-আসরে কানা-কোদা, সেইখানে আতরমণি। হাতে কাঁসার খাড়ু, কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা—খাঁচার পাখির মতো কানা-কোদার গান নাকি সে বন্দী করে রেখেছিল। তার চোখের ইসারা পেলে তবে পাখি পাখা মেলত। এই নিয়ে লোকে কত ঠাট্টা করেছে তাকে আর কানা-কোদাকে। সেই আতরমণি ছটফট করছে। তিন-চারটে শিয়াল কামড় দিচ্ছে জ্যান্ত মানুষের গায়ে। জর এসেছে—প্রায় বেহুঁশ জ্বরের ঘোরে, তারই মধ্যে চেঁচাচ্ছে।

পান্নালাল এসে পড়ল। ঘরে বেড়ার হাঙ্গামা নেই—বর্ষায় মাথা গুঁজবার জন্য চাল একখানা চাই, তা-ই কোন রকমে এখনও খাড়া আছে গোটা আষ্টেক খুঁটির উপর। শুধু পিছন দিকে কানা-কোদার নিজের হাতে পোঁতা একটা ঝুমকো-জবার গাছ। অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে।

শিয়ালগুলো লাফিয়ে পড়ল ভিটের কানাচে। পান্নালাল লাঠি উঁচিয়েছে শিয়াল লক্ষ্য করে নয়,—আতরমণির দিকে। বলে, মাথা ভেঙে দেব বুড়ি। পেটের ভাত গেছে, মানুষের রাতের ঘুমও নিয়ে নিবি নাকি ?

আতরমণি কাতরে বলে, রক্ত পড়ছে বাবা, এই দেখ—

পড়ছে তো পড়ছে—পান্নালালের মাথাব্যথা নেই। তা ছাড়া দেখবেই বা কি করে ? অন্ধকার—এখানে বলে নয়, এত বড় অঞ্চলে কেরোসিন আলোর বিলাসিতা এখন তিনটে-চারটে বাড়িতে মাত্র। যেমন একটা ঐ দেখা যাচ্ছে খাল-পারে হরিহর রায়ের দোতলার উপর। এতকাল অন্ধকার থেকে আজই কেবল আলো জ্বলছে, ভূষণেরা গিয়ে জ্বালিয়েছে।

উঠোনে হুটোপুটি, শিয়ালে ঝগড়া বাধিয়েছে। বৌও-ও করে

পান্নালাল লাঠি ছুঁড়ল। শিয়লের দিকে কিম্বা হরিহর রায়ের বাড়ির আলোর দিকে। লাগল না অবশ্য। শিয়ালেরা সরে গেল।

বুড়ি থেমেছিল একটু—শিয়ালের সাড়া পেয়ে আবার চেঁচাচ্ছে, ও বাবা, বাবা গো! পান্নালালকে বলে, নিয়ে চল বাবা, তুমি যেখানে আছ। বড্ড ভাললোক তুমি।

পান্নালাল বলে, খুন করে ফেলব ভাললোক বললে।

ভয় পেয়ে আতরমণি একটু চুপ করে থাকে। আবার কাতরায়, নিয়ে চল পণ্ডিতমশায়, এখানে থাকলে খুবলে খুবলে খেয়ে ফেলবে।

চল—

আতরমণি বলে, উঠবার জো নেই বাবা, ধরে তুলতে হবে।

বয়ে গেছে তবে আমার—বলে পান্নালাল পা বাড়াল। হঠাৎ ফিরে এসে এক ঝটকায় কাঁধের উপর তুলে নিল তাকে।

হন-হন করে চলেছে। নামাল বাঁধানো মেজেয় পাকা সানের উপর।

এ কোথা নিয়ে এলে বাবা? এ যে মস্ত বাড়ি।

পান্নালাল বলে, মস্ত মস্ত কাণ্ড হয়ে থাকে এখানে। দুপুরে-সন্ধ্যায় ভিখারি-ভোজন হয়, গন্ধ পাচ্ছিস না? খেসারির ডাল আর ক্ষুদসিদ্ধ করে খাওয়ায় হরিহর রায়। ধন্যি-ধন্যি পড়ে গেছে।

ভিতর-বাড়ির জানলার আলোর দিকে তাকিয়ে পান্নালাল রুক্ষ হাসি হেসে ওঠে। বলে, চেঁচা দিকি সোনামানিক, এইবার যত পারিস। সমস্ত রাত চেঁচা—ছাত ভেঙে ফেল চেঁচিয়ে।

আতরমণি কেঁদে ওঠে, চলে যেও না বাবা, ফাঁকা মণ্ডপে ফেলে রেখে। মরে যাব।

বেঁচেই বা কার কি করবি? মর্, পারিস তো মরে যা দিকি। তাতেও খানিকটা মুশকিলে পড়বে, মড়া ফেলতে মানুষ ডেকে ডেকে বেড়াতে হবে ওদের।

রাত্রির উন্মত্ততার পর সকালবেলা পান্নালাল শূন্য পাঠশালা-ঘরের দাওয়ায় পড়ে আছে। রোদ এসে পড়েছে মুখের উপর।

দাদা, দাদা গো, শুনছ? আমার শ্বশুর ফিরে এসেছেন।

রোগের যন্ত্রণায় দিনের পর দিন সর্দার-বাড়ির কামরার মধ্যে পান্নালাল ছটফট করত, যামিনী সে সময় পাখা নিয়ে বাতাস করেছে, ডাব আর পাকা-পেঁপে কেটে সামনে এনে ধরেছে। আরোগ্য-স্নানের দিন নিম-হলুদের ব্যবস্থা করেছে, আনন্দ সেদিন ঝলমল করছিল শান্তশ্রী বউটির মুখের উপর। তবু সে স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলে নি পান্নালালের সঙ্গে। আজকালই বলে থাকে—পান্নালালের পাগল হয়ে যাবার গুজব রটনার পর থেকে। এখন আর বাধা নেই কিছু। টিনের ঘর নেই, মাটির পাঁচিলটা খাড়া আছে—কিন্তু খসে খসে পড়ছে, সর্দার-বাড়ির বউয়ের বেহায়াপনা নিয়ে পাঁচকথা বলে বেড়াবার মানুষও নেই পাড়ার মধ্যে।

যামিনী ডাকছে, কি বলছি, শুনতে পাচ্ছ? ও দাদা—

এখন পান্নালাল আলাদা আর এক মানুষ। চোখ মেলে প্রসন্ন হাসি হেসে বলে, ফিরেছেন দ্বারিক? বাঁচা গেল। তখনই বলেছিলাম, ভাবনা কোরো না বোন, দূরের পথ—দেরি কিছু হবেই। দুপুরে তা হলে নেমন্তন্ন আমার, কি বল? চাট্টি ধান রোদে দিয়ে ভেনে কুটে নাও গে তাড়াতাড়ি। জাত তো মেরে দিয়েছ—রোগের সময় যখন বার্লি রেঁধে খাওয়াতে। এবারে পেট ভরাই।

যামিনীর মুখের দিকে নজর পড়ে পান্নালাল স্তব্ধ হল। যেন মরা-মানুষের মুখ। ব্যাকুল হয়ে যামিনী বলতে লাগল, চারদিন ধরে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌচেছেন দাদা। শুধু পাকা তাল খেয়ে আছেন এ কদিন। এসেই চেঁচামেচি করছেন 'খাব' 'খাব' করে। মেলতুক নিয়ে ঘুরছেন, ভাত না দিলে এক কোপে মাথা দু-ফাঁক করে দেবেন বলছেন। একদম মাথার ঠিক নেই।

আমার মতো—না?

পান্নালাল উৎকট হাসি হেসে উঠল। বলে, মেলতুক কেড়ে নিয়ে তুমিই একটা কোপ ঝাড় গে না বুড়োর মাথায়। চুকে-বুকে যাক। ও—গায়ের জোরে পেরে উঠছ না বুঝি? চল—আমি যাচ্ছি, ঠাণ্ডা করে দিয়ে আসি।

লাফিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। যামিনী ভাল করে চিনেছে পান্নালালকে সেই অসুখের সময় থেকে। তার কথায় ভয় পায় না। ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলল।

আমার কে আছে দাদা? বাপ মা নিখোঁজ। শ্বশুর পাগল। আর—

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে পান্নালাল জিজ্ঞাসা করে, কার্তিক আসে নি?

কোথায় গেছে, শ্বশুরও তা বলতে পারছেন না। আবোল-তাবোল বলছেন। কখনো বলছেন, পালিয়ে বসে আছে গাছের মাথায়। কখনো বলেন, যুদ্ধের চাকরি নিয়েছে, গুড়ুম-গুড়ুম করে কামান ছুঁড়ছে—ফিরে আসবে লাটসাহেব হয়ে। যেখানে থাকুক দাদা, প্রাণে-প্রাণে বেঁচে থাকলে রক্ষে পাই।

এসে দেখল, দ্বারিককে শাসন করবে কি—ইতিমধ্যে উঠানে পেয়ারা-তলায় বেহুঁশ হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। বলি-রেখা এই কদিনের ভিতরেই জালের মতো সমস্ত মুখ ছেয়ে ফেলেছে; আশি বছর বয়সের ক্লান্তি সর্বাঙ্গে। একপাশে মেলতুক পড়ে রয়েছে।

তখন পান্নালাল চলল বাঁকাবড়শি, হরিহরের লঙ্গরখানায়। আতরমণি এখন গড়িয়ে গড়িয়ে দেয়ালের ধারে এসে ঠেশ দিয়ে বসেছে। সতৃষ্ণ প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে কতক্ষণে রান্না শেষ হবে, খেতে দেবে সকলকে।

না—ভূষণ দাস নেই এ জায়গায়, হাটখোলায় চলে গেছে। এ বেলাটা সে লঙ্গরখানা দেখাশুনো করতে পারে না, বিনোদ দেখে।

দু-ক্রোশ পথ ভেঙে আবার পান্নালাল হাটখোলায় ছুটল। নিপাট ভালোমানুষ হয়ে ধর্না দিয়ে পড়ল ভূষণের দোকানে।

ভূষণ যথারীতি আকাশ থেকে পড়ে। সেই মামুলি কথা—

চাল ? বাঘের দুধ যদি চাও—

পান্নালাল বলে, টিনের ঘরের দরুন তোমারই দেওয়া নোট এনেছি দাস মশাই। দ্বারিক সর্দার যেমন বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি প্রায় রয়েছে। কাজে আসছে না। একমুঠো দুমুঠো যা লাগে নোট দিয়ে দিচ্ছি। যত দর হয় হোকগে— চাল বের কর।

ভূষণ বুড়ো-আঙুল নেড়ে বলে, নেই বাপু, ঢনঢন। থাকলে উচিত-দরেই দিতাম। ঢ্যাঁড়া পিটে দর বেঁধে দিয়ে গেল। বেশি নিয়ে ফ্যাসাদে পড়ব ?

পান্নালাল বলে, আগে যাও মিলত, ঢ্যাঁড়ার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উধাও। ফন্দি-ফিকির খুঁজতে খুঁজতে প্রাণান্ত সকলের।

ভূষণ বলে, তা ওরাই বা লঙ্গরখানায় আসে না কেন পণ্ডিত ? কুলীন হয়ে থাকে তো মরুক শুকিয়ে।

বিরক্ত হয়ে সে দাঁড়াল। ভ্যানর-ভ্যানর কাঁহাতক ভাল লাগে ? একজন-দু-জন নয়—খদ্দেরের পর খদ্দের আসছে। সকাল থেকে রাত দুপুর অবধি অনবরত এই এক কথা।

পান্নালাল পথ আটকাল গিয়ে।

জবাবটা দিয়ে যাও। কি করা যাবে ?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভূষণ বলে, পরের উপকার করতে বেরিয়েছ যখন, বেশ তো—তুমিই না হয় একবার খাঁ-বাজারে গিয়ে দেখে এস। মিছে খবর তো বলি নি। সেরে-সামলে না আনতে পারলে হবে কেন ?

পান্নালাল বলে, খাঁ-বাজার নয়—কালাবাজারের খবর বল।

নিস্পৃহকণ্ঠে ভূষণ বলে, কি জানি—দেখ সুলুক-সন্ধান করে।

কোথায় সে বাজারটা ?

কথা না বাড়িয়ে ভূষণ পিছনের কামরায় সশব্দে খিল এঁটে রোকড়-খতিয়ান নিয়ে বসল।

দোকানের লোকজনকে উদ্দেশ করে পান্নালাল বলে, তোমরা বলতে পার ভাই? চাট্টি ভাত না খাওয়ালে যে মরে যাচ্ছেন বুড়ো দ্বারিক।

দ্বারিক সর্দারের কথায় সত্যি কষ্ট হচ্ছে সকলের। তিনকড়ি জিরেমরিচ মাপছিল। চোখ টিপে চুপি-চুপি সে বলে, রাত্তিরবেলা আঁধার হলে সাদাবাজারই কালাবাজার হয়ে দাঁড়ায়। কিছু জান না—তুমি কি আকাশ থেকে নেমে এলে পণ্ডিত মশাই?

পান্নালাল ফিরল, দুপুর গড়িয়ে তখন বিকাল হয়ে এসেছে।

কি হল দাদা?

পান্নালাল বলে, উনুন জ্বেলেছ বুঝি? জল ঢাল উনুনে, এ বেলাও ঐ পাকা তাল।

নজর পড়ল, যামিনীর ডান-পায়ে অনেকখানি কাটা। গাঁদা-ফুলের পাতা বেটে দিয়েছে।

কাটল কি করে?

যামিনী বলে, পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম ঘাটে বাসন নিয়ে যেতে।

ঘরে ছুঁচোর তে-রাত্রির—বাসন লাগছে কোন কর্মে?

ছোট মেয়েটা ফাঁস করে দিল। না-পড়ে যায় নি তো মা। দাদু থালা ছুঁড়ে মেরেছে, তাই—

থালা ছোঁড়াছুঁড়ি কেন?

যামিনী চুপ করে থাকে। খুকিকে জেরা করার পর বেরুল, ঘুম ভেঙে দ্বারিক থালা পেতে বসেছিল, আবার তোলপাড় করছিল 'ভাত' 'ভাত' বলে। না পেয়ে শেষে থালা ছুঁড়ে মারে। সেই থালা লাগে যামিনীর পায়ে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটেছিল। পান্নালাল মেলতুক সরিয়ে নিয়েছিল, নইলে মেলতুকই মেরে বসত নিশ্চয়!

কোথায় দ্বারিক?

জবাব না পেয়ে পান্নালালের সন্দেহ হল। জিজ্ঞাসা করে, রায়বাড়ি গেছেন নাকি ভাতের তল্লাসে ?

যামিনীর দিকে চেয়ে সে বোমার মতো ফেটে পড়ল।

বুদ্ধি দিয়ে তুমি পাঠিয়েছ বোধ হয়। তা তোমরাই বা রয়েছ কেন? চলে যাও এক-একটা থালা হাতে করে। সুখের পায়রার দল, বড়লোকের মণ্ডপে গিয়ে বক-বকম করগে বসে—

তার চোখ ফেটে জল বেরুবে বুঝি! তেজস্বী দ্বারিকের কত কথা মনে পড়ে। সুপ্রিয়ার সঙ্গে সেই যেদিন বর্ষারাত্রে এসেছিল এ-বাড়ি। আরো কতদিনের কত ঘটনা। দ্বারিককেও থালা হাতে বসতে হল ভিখারির লাইনে? সকলের শিরদাঁড়া ভেঙে গেল, সোজা মাথা একটা থাকতে দেবে না দেশে ?

(৩)

সন্ধ্যা হয়েছে। সারাদিনের পর স্নান করে পান্নালাল ফের চলল বউডুবির হাটে, ভূষণের দোকানে। ঠারেঠোরে তিনকড়ি একটু সন্ধান দিয়েছে, কালাবাজারের সামান্য একটুখানি আভাস।

হাটবার, কিন্তু হাট জমে নি তেমন। আসল বস্তু ভাতেরই খবর নেই, মানুষ মাছ তরিতরকারি কিনবে কোন কর্মে? যত খদ্দের ভূষণের দোকানে এসে ভিড় করছে। আর সেই কাকুতি-মিনতি—আজ মাসখানেক অবিরাম যা চলছে।

ভূষণ নেই, পিছনের কামরায় পাইকারদের হিসাব মেটাচ্ছে। গদির উপর হাতবাক্সর সামনে বিনোদ ধমক দিয়ে উঠল, বলছি যে ফুরিয়ে গেছে চাল—

এত এত বস্তা ছিল, ফুরোল এর মধ্যে ?

পাখনা গজিয়েছিল, উড়ে গেছে। আকাশে ঐ যে-রকম উড়োজাহাজ উড়ে যায় না? অমনি।

পান্নালাল দু-হাতে জনতা ঠেলে এগিয়ে আশে।

ইয়ার্কি রাখ বিনোদ। বের কর, কি আছে—

বিনোদ ঘাবড়ে গেল একটুখানি। স্বর নরম করে বলে, কিছু নেই। মিছে কথা বলব কেন? থাকলে—দোকান পেতে বসেছি, নিশ্চয় দিয়ে দিতাম।... বেরোও দিকি ভাইসব, ঝাঁপ বন্ধ করি এবার—

উচ্চকণ্ঠে আবার বলে, যাও, বাইরে চলে যাও তোমরা।

বেরুল অনেকে। পান্নালাল চক্ষের পলকে লাফিয়ে উঠল পাটের গাঁইটের উপর—যেগুলো কলকাতায় হরিহর রায়ের গুদামে যাচ্ছে ভাউলে বোঝাই হয়ে। গাঁইটগুলো ধাক্কা মেরে সে গড়িয়ে দিচ্ছে। চিৎকার করছে, যাচ্ছ কোথা তোমরা? সরাও এগুলো টেনে টেনে।

কতক মানুষ থমকে দাঁড়াল। এগোচ্ছিলও পায়ে পায়ে। বিনোদ পায়ের চটি খুলে দৌড়ে আসে।

ছুঁচো কাঁহাকা—এতবড় আস্পর্ধা?

পান্নালাল বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে। হাতের কাছে পাঁচসেরি লোহার বাটখারা, তুলে ধরল বিনোদের দিকে।

চেঁচামেচিতে ইতিমধ্যে বিস্তর লোক ঢুকে পড়েছে। গতিক দেখে বিনোদ ছুটে বেরুল।

আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা। হাতে দড়ি দিয়ে সব শ্রীঘরে পাঠাব, তবে আমি ভূষণ দাসের বেটা—

সে থানায় ছুটল।

আর যে দু-তিনটে দোকান ছিল, তারা ঝপাঝপ ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে ইতিমধ্যে। মাছ-শাক-তরিতরকারিওয়ালারা জিনিসপত্র সামলে ধামা মাথায় দৌড়ল।

গোলমাল শুনে ভূষণ দাস দোকান-ঘরে চলে এল।

কর কি, আহা—কর কি তোমরা? কি হচ্ছে পণ্ডিত? মালপত্তোর

ছড়িয়ে নৈরাকার করছ—চল বাবা সকল, আমার বাড়ি। খোরাকি চাল থেকে সেরখানেক করে দিয়ে দেব তোমাদের।

নিরীহ নিষ্কর্মা পাঠশালার পণ্ডিত পান্নালাল—সকলের বিশ্বাসভাজন, এমন কি ভূষণের চিঠিতে মাথা খারাপ হবার খবর না পেলে হরিহর রায়ই হয়তো লঙ্গরখানার ভার চাপাতে চাইতেন তার উপর। কতকাল পরে আজকে আবার অসুরের শক্তি সে গায়ে পেয়েছে। হাত দিয়ে পা দিয়ে সেই আড়াই-মনি তিন-মনি বড় বড় গাঁইট এদিকে-সেদিকে ফেলছে। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে দরদর করে। ঠেলে ঠেলে পারছে না—যেন শেষ নেই, সীমা নেই। যে লোকগুলো আশায় আশায় কাছাকাছি ঘনিয়ে এসেছিল, এখন অনেকেই তারা সরে পড়েছে।

গাঁইট সরাতে সরাতে অবশেষে অনেক নিচে—তিনকড়ি মিথ্যে কথা বলে নি, মিথ্যে সে বলতে যাবে কেন? বেচাকেনা করে বটে দোকানে, কিন্তু সে-ও তো চিনির বলদ—বোঝা বয়ে মরে, বোঝা বইতে বইতেই মুখ থুবড়ে মারা পড়বে একদিন!

ক্লিষ্ট ঘর্মাক্ত মুখের উপর আগুন জ্বলে উঠল। মুখ তুলে বলে, কি দাস মশায়? এ সব কিসের বস্তা—এই পাটের নিচে?

কিন্তু কোথায় কে? ভূষণ সরে পড়েছে। একটা বস্তা ঘাড়ে করে দোকানের বাইরে ফাঁকা হাটখোলায় পান্নালাল দড়াম করে ফেলল। বস্তার উপর উঠে দাঁড়িয়েছে, আর দোকানের দিকে দু-হাত আন্দোলিত করে উন্মত্ত উল্লাসে চিৎকার করছে—

চাল, চাল—ওরে ভাই, বস্তা বস্তা চাল রয়েছে ঐ যে—

লোকারণ্য। ধামা-পালি হাতে হাটুরে মানুষ বিষণ্ণ মুখে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ফিরছিল। মুখে মুখে রটে গেল খবর। রক্ত-হিংস্র নেকড়ে বাঘের মতো সবাই ছুটে এল। সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে সকলের, এই দশটা মিনিট আগেও যে ছিল অত্যন্ত শান্ত, ঘাড় তুলে কথা কইত না, সে-ও পাগল হয়ে চাল-কাড়াকাড়ি করছে, অশ্রাব্য গালিগালাজ করছে ভূষণের উদ্দেশ্যে।

অবাক কাণ্ড, ক্ষিদেয় এত সাহস দেয় মানুষের বুকে! পেট্রোগ্রাডে ক্ষুধার্ত নারীরাই রুটির দোকানে ঢিল মারে, দুর্জয়শক্তি জারের বিরুদ্ধে প্রথম সেই বিদ্রোহের সূচনা। বিনোদ হয়তো থানায় পৌঁছে গেছে এতক্ষণ, থানাওয়ালারা এসে পড়ল বলে, কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে এক্ষুণি—তা বলে ভ্রূক্ষেপ নেই; মানুষের মুখে মুখে যেন তারের খবর হয়ে গেছে। শুধু চাল নয় এখন—নুন-তেল ডালকলাই যা হাতের মাথায় পাচ্ছে, ফেলছে, ছড়াচ্ছে, ছোঁড়াছুঁড়ি করছে মুঠোমুঠো, পায়ের লাথিতে পাত্রসুদ্ধ গড়িয়ে দিচ্ছে এদিকে-সেদিকে।

আমবাগানের ওদিকে নিরাপদ দূরে থেকে জনকয়েক উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, বেগতিক দেখলে বেমালুম গা-ঢাকা দেবে। তাদের দিকে নজর পড়তে পান্নালাল আরও চেঁচাতে লাগল, চাল পাওয়া গেছে রে—চাল, চাল—

আরও খানিকটা পিছিয়ে দাঁড়াল লোকগুলো। সাবধানী চোখের দৃষ্টি। তখন পান্নালাল গালিগালাজ শুরু করছে, যা সামনে পাচ্ছে ছুঁড়ছে তাদের দিকে। বলে, লেজ নাড়াছস খেঁকি কুকুরের দল? পালা, পালা –

এত বড় দোকান—মালপত্র সাবাড় দেখতে দেখতে। শেষকালে তক্তা-পোশ, বেঞ্চি, বাঁশের মাচা, জিনিসপত্র রাখবার কোটো-কাঠরা ভেঙে তছনছ করছে। ডাকছে, কোথায় গেলে ও ভূষণ, বাইরে এস একবার। চাল যে মোটে নেই! দেখে যাও।

ভূষণ তখন কামরার মধ্যে ঢুকে পড়ে ছিটকিনি এঁটেছে, হুড়কো দিয়েছে, দিয়ে দুয়োরে চেপে দাঁড়িয়ে ইষ্টনাম জপছে। গুরু রক্ষে কর, আজকের রাতটুকু কাটুক—আর কাজ নেই, পালিয়ে যাব আর কোন জায়গায়—

গোলমাল একটু শান্ত হয়ে এল। তা হোক—থানার লোকজন না আসা পর্যন্ত বেরুচ্ছে না ভূষণ। হঠাৎ—ও কিরে, ও? জানলার ফাঁকে দেখা যাচ্ছে আগুন। রাত্রির আঁধার বিদীর্ণ করে লকলক করছে আগুনের শিখা। ঘরে আগুন দিয়েছে—জতুগৃহ-দাহের অবস্থা হল যে! ঘরের ভিতরেই পুড়িয়ে

মারবে। পিছন-দরজা খুলে আমবাগানের দিক দিয়ে পালিয়ে যাবে বলে যেই বেরিয়েছে, একজন অমনি ঝাপটে ধরল ভূষণকে—

ছেড়ে দে··· দোহাই! পাঁচ টাকা দেব··· দশ টাকা···ধম্মবাপ তুই আমার—

টানতে টানতে তাকে নিয়ে এল বাগানের বাইরে। অনেক মানুষ জুটে গেছে—এ মারছে, ও মারছে। ভূষণ হাতজোড় করে বলে, কালীর দিব্যি—ও আমার ক্ষেতে ফলেছিল, ও আমার খোরাকি চাল—

কে-একজন বলে উঠল, খোরাকি চাল—তা ওকে চাট্টি খেতে দে তোরা। খা—খা—কত খাবি খা—

ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে ভূষণকে। মুঠো মুঠো চাল এনে ঠাসছে তার মুখে। আর খাবি? খা—খা—

মুখ ভরতি, ঠেসে ঠেসে তবু সেই কাঁচা চাল ভরছে মুখের ভিতর। চোখ লাল, দম আটকে আসছে। ঘৃণিত চোখে এক ভয়াবহ ভঙ্গি করে ভূষণ অসাড় হয়ে গেল।

ভয় পেয়ে সবাই স্তব্ধ হয়েছে।

সর্বনাশ, মেরে ফেললে নাকি? ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করছ কেন তোমরা? পান্নালাল দৌড়ে এল এদিকে। নেড়েচেড়ে বলে, না—আছে। এস তোমরা, পালিয়ে এস। এই খেলা করছ, চাল ওদিকে সমস্ত ফুঁকে গেছে। ফাঁকি পড়ে গেলে, শিগগির চলে এস—

ভূষণ তেমনি পড়ে রইল, পান্নালাল টেনে নিয়ে এল সকলকে। নিজের সেই বস্তাটার মুখ খুলে দু-হাত ভরে ভরে চাল দিল তাদের ধামায় কাপড়ে। সের পাঁচ ছয় কেবল রইল বস্তায়।

চাল এসেছে, চাল নিয়ে এসেছে, উৎসব আজ অঞ্চল জুড়ে। শুধু চাল নয়, পিটুনি দিয়ে এসেছে ভূষণকে। আর যাদের ধরা পাওয়া যায় না, দো-মহলা-তেমহলায় শহরে-বাজারে থাকে, তাদের উপরেও খানিকটা আক্রোশ যেন মিটিয়ে এল ভূষণকে মেরে।

ধবপাস্—করে দাওয়ায় চালের বস্তাটা ফেলে লাটসাহেবের মতো পান্নালাল যামিনীকে বলল, খোল—

যামিনী খুলে দেখে অবাক হয়ে বলে, কোথায় পেলে দাদা?

অতি কোমল কণ্ঠ পান্নালালের, একটু আগের সে মানুষ যেন নয়। বলে, ভাত রাঁধ—মনের সাধে হাঁড়ি ভরে চাপিয়ে দাও দিদি আমার—

যুঁইফুলের মতো পরিপাটি অন্ন—শেষ অবধি গলায় ঢুকবে যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। কি একটা অঘটন ঘটবে এর মধ্যে, একটা অলৌকিক ব্যাপার কিছু।

সর্দার-বাড়ির সে আবরু নেই; পাঁচিল খসে খসে পড়ছে। তবু পাঁচিল আর সুপারি-পাতার বেড়া বজায় আছে এখনো একরকম। পান্নালাল পাঁচিলের দরজায় কষে খিল দিয়ে এল।

ভাত বাড়ো। দ্বারিক নেই বুঝি! এ বেলাও? বেশ হয়েছে। থাকলেও দিতাম না। ঠেসে ভাত বাড়ো দিদি, যতগুলো পাতায় ধরে। খুকির, তোমার আর আমার—

কলাপাতা নিয়ে এসেছে—তিনখানা বড় মাঝপাতা। দু-খানা পাশাপাশি পেতে ঠাঁই করল পান্নালাল আর খুকির। নিজের ভাত যামিনী ঘরের ভিতর নিয়ে গেল।

অর্ধেক আন্দাজ খাবার পর—যা ভয় করছিল, দরজায় ঘা দিচ্ছে।

চুপ! খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি···এই খুকি, থাবা-থাবা পুরে দে গালের ভিতর—শিগগির।

দরজার আঘাত আরও জোরে জোরে। খাওয়া শেষ করে পান্নালাল হাত ধুল। খিল খুলে সে অভ্যর্থনা করছে, আসুন দারোগাবাবু—

কোথায় দারোগা? চৈতন, রাখাল, কাশী, মেঘা—এরাই সব।

আগুন হয়ে প্রশ্ন করে, কি? কি চাই তোমাদের?

ভাত খাব চাট্টি। শুনলাম যে তুমি নাকি পণ্ডিত—

বুকে থাবা মেরে পান্নালাল বলে, ঠিক শুনেছ। রোজগার করে আনা ভাত। দানছত্তোর করবার নয়। যাও—যাও—

বুড়োমানুষ চৈতন। বলে, চারদিন আজ খাই নি

খাবে কি করে? চাল আনে মানুষে, ভাত খায় মানুষে। মানুষ নও তো তোমরা—

যা বলবার বল গে বাবা। প্রাণে বাঁচাও চাট্টি ভাত দিয়ে। চৈতন একেবারে কেঁদে পড়ল।

বলি সত্যিকথা। কুকুর-বিড়াল তোমরা—ভাত খাবে কি, খাবে এঁটো-কাঁটা। পাতের কোলে ঐ আমার যা পড়ে রয়েছে। কলকাতায় হরিহর রায় ভূষণ শয়তানকে দিয়ে খাওয়াচ্ছে তার যে পাতের এঁটো। বেরোও—বেরোও—

কে শোনে কার কথা! চৈতন ছুটে গিয়ে ঘরে উঠল। ভাতের হাঁড়ি বাঁ-হাতে প্রাণপণে বুকের উপর বেষ্টন করে ধরেছে, আর হাঁড়ির ভিতর অবশিষ্ট যা ছিল গবাগব খেয়ে নিচ্ছে। বলে, মার, ধর, যা খুশি কর পণ্ডিত, নড়ছি নে না খেয়ে—

পান্নালাল নিঃশব্দে দেখতে লাগল। নিরীহ পরম শান্ত এই মানুষগুলি—কোন অপরাধে অপরাধী নয়। শত্রু-ভয়ে রাতারাতি এদের মুখের অন্ন সরে গেল দূর-দূরান্তরে। আজকে খাদ্য নেই, খাদ্য পাঠাবার গাড়িও মিলছে না।

অথচ ট্রেনে করে সাহেব আর বড়লোক জুয়াড়িদের ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া অবধি আসছে নাকি কলকাতায়!

ভাত ছিল সামান্যই। খেয়ে শেষ করে পরম উল্লাসে চৈতন বলে, বাঁচালে বাপধন। তোমার এ দয়া ভুলব না—

পরদিন প্রহরখানেকের সময় দারোগা এল সর্দার-বাড়ি। পান্নালাল তার পাঠশালা-ঘরে ছিল, শুনতে পেয়ে ছুটতে ছুটতে এল। খাতির করে বলে, বসতে আজ্ঞা হয়। খবর কি দারোগাবাবু?

খানাতল্লাস হবে এখানে। সবাই বলছে যে—

সঙ্গে অনেক লোক এসেছে। চৈতন মোড়ল জমাদারের পিছনে।

পান্নালালাল বলে, দয়া সত্যিই ভুলতে পার নি দেখছি মোড়লের পো। আহা-হা, কূয়োর জলে ফেলে দিতাম যদি হাঁড়ির বাড়তি ভাতগুলো!

দারোগা বলে, কি হত তা হলে? খোতা-মুখ ভোঁতা করে ফিরে যেতাম আমরা? ইনভেস্টিগেট করতে পারতাম না, মনে করেন?

পান্নালাল সবিনয়ে বলে, তা কেন। এত অক্ষম হলে রামরাজ্য জমিয়ে বসে আছেন কি করে? তবে এমন টাটকা-সাক্ষিটা পেতেন না তো! খেটে-খুটে তৈরি করে নিতে হত!

হাত বেঁধে পান্নালালকে নিয়ে চলল। যামিনী আছড়ে পড়ল উঠানের উপর। শেষ সহায়টিও বিদায় হল। কোনদিন কেউ পান্নালালের চোখে জল দেখে নি, এইবার যেন চোখের পাতা ভিজে গেছে মনে হল। যামিনীকে বলে, আর যা কর দিদি—একটা অনুরোধ, বেইজ্জত হয়ো না; হরিহর রায়ের মণ্ডপে উঠো না কোনদিন। ওরা মানুষকে খাওয়ায় না, মানুষকে ভিখারি বানিয়ে তারপর খেতে দেয়। ইজ্জত নিয়ে বরঞ্চ মরে থেকো এই ঘরের মধ্যে; চৌকিদার লিখিয়ে দেবে, আমাশা হয়ে মরেছে। এমন কত লেখানো হচ্ছে!

থানা ক্রোশখানেক পথ। আপাতত পান্নালালকে তাই নিয়ে তুলল হরিহর রায়ের অন্দর-বাড়ি—একেবারে দোতলার উপর।

এত খাতির?

মস্তবড় ঘর—ঝকঝকে মেজে, মার্বেল-বাঁধানো। হরিহর রায় শুতেন এই ঘরে, এখন খালি থাকে। এমন ঠাণ্ডা—গড়িয়ে পড়তে ইচ্ছা করে।

কিন্তু আরাম করে গড়াবার জন্য আনা হয় নি তাকে এ জায়গায়।

কে কে সঙ্গে ছিল, নাম বল—

পান্নালাল বলে, সত্যি কথাই বলছি মশায়, সে এক ঝড়ের মতো ব্যাপার। হুস করে ঘটে যায়, নজর রাখবার ফুরসত থাকে না। সাক্ষি দেবার জন্য আমবাগানে অনেকে ওত পেতে ছিল, খোঁজ করুন, তারা খাঁটি খবর দেবে। আমার কিছু মনে নেই।

রাগ সামলাতে না পেরে বিনোদ ঠাস করে মারল এক চড়। হাত-বাঁধা পান্নালালের। চেঁচাতে পারে অবশ্য, কিন্তু লাভ নেই—অত বড় মণ্ডপ-বাড়ি অতিক্রম করে দোতলায় এনে তুলেছে, চেঁচিয়ে আকাশ ফাটালেও বাইরের কারও কানে যাবে না।

পান্নালাল বলে, মার বিনোদ, দিন পেয়েছ—মেরে নাও যত পার। আমরাও দেখে নেব দিন এলে।

তা-ই চলল একটানা। কিল, ঘুসি, লাঠির গুঁতো—যে যেমন পারছে। ভূষণকে মারার শোধ তুলছে। আর এদের সন্দেহ, বিজয়কে কোঁচ মারার ব্যাপারেও পান্নালালের কারসাজি আছে। পান্নালাল চুপচাপ—প্রতিবাদ নেই, নড়াচড়াও করে না। শেষকালে গড়িয়ে পড়ল।

পারা যায় না বিন্দুকে নিয়ে। সম্প্রতি এ-বাড়িরই বাসিন্দা তারা, উঁকি মেরে কোথা থেকে দেখছিল।

আহা রে, কোন ঘরের মানিক রে! বিদেশে-বিভুঁয়ে মরে যাচ্ছে—ঘরের লোক হয়তো পথ চেয়ে আছে তার জন্য!

জলের ঘটি নিয়ে বিন্দু ছুটে এসে ঢুকল। স্ত্রীলোক দেখে দারোগা সরে দাঁড়ায়। বিনোদ খিটিমিটি করছে মায়ের দিকে, কিন্তু বাইরের লোকের মধ্যে কি আর বলবে! বিন্দু মুখে-মাথায় জলের ঝাপটা দিতে লাগল।

আঃ—বলে পাশ ফিরল পান্নালাল। হাঁ করছে ঘন ঘন।

কি?

চোখ মেলে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে পান্নালাল বলে, একটু জল খাব উমা। জল আনো।

ব্যাকুল হয়ে বিন্দু জলের ঘটি মুখে ধরে।

খেতে গিয়ে পান্নালাল চারিদিকে তাকায়। জ্ঞান ফিরেছে, মনে পড়েছে সব। মুখ ফিরিয়ে নিল সে ঘটির থেকে।

থুঃ—থুঃ—

দশম পরিচ্ছেদ

(১)

যেন সাঁড়াসাঁড়ির বান ডেকেছে। বান এসে মানুষ-জন ঘর-গৃহস্থালী ভাসিয়ে ভেঙে দিয়ে গেল। খাঁ-খাঁ করছে গ্রাম। বন্যা ধাওয়া করল কলকাতার শহর অবধি। বন্যার জলে মড়া ভেসে এসেছে—জীবন্ত মড়ার দল দেখতে দেখতে দেখতে শহরের রাস্তা-গলি-পার্ক ভরতি করে ফেলল।

মহানুভব হরিহর। তাঁর টাকায় শুধু বাঁকাবড়শির লঙ্গরখানা নয়—এখানেও পাড়ার মধ্যে ফ্রি-কিচেন চলছে। রান্নার জায়গা হরিহরের নিচের দালানে, খাওয়ানো হয় পার্কে বসিয়ে। সুপ্রিয়া সর্বক্ষণ মেতে আছে এই সব নিয়ে; বাপের দেখাশুনা ছেড়ে দিয়েছে। এমন কি, নূতন বিয়ে হয়েছে এই তো মাস কয়েক—সমস্তটা দিনের মধ্যে অনুপমের সঙ্গেও ভাল করে দুটো কথা বলতে পারে না। রাত্রির কথা আলাদা, কিন্তু দিনের সঙ্গ-কামনায়ও অনুপম লোলুপ হয়ে বেড়ায়, রাগ করে কখন কখন।

সুপ্রিয়া নিজে খাটছে, আর যার কাছে যাচ্ছে সাহায্যও পাচ্ছে খুব। পাড়ায় মেয়ে-বউরা এসে কাজকর্ম করছেন। চালের পারমিটও অতি সহজে মিলছে। মহৎ কাজে নেমেছেন, গবর্নমেণ্টের তরফ থেকে যতদূর যা করা দরকার নিশ্চয় করা হবে, একশবার করা হবে। বিশেষত সরকারি দলের এম. এল. এ-র বউ যখন কর্মকর্ত্রী। সরকারি প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে বিজ্ঞাপনে ঢোকানো যাবে এই অনুষ্ঠানটি। ছবি ছাপানো যাবে কাগজে।

সুপ্রিয়া মেয়েদের বলে, টাইম-টেবল তৈরি করে ফেলুন। সেই অনুযায়ী

পালা করে নিজেরাই রাঁধা-বাড়া পরিবেশন করব। একটা পয়সাও যেন অপব্যয় না হয়। আর পাঁচটা মানুষ বাড়তি বাঁচানো যাবে রাঁধুনীর মাইনে বাঁচিয়ে।

তা-ই হচ্ছে। রিস্ট-ওয়াচ দেখে কাঁটায় কাঁটায় কাজ চলেছে।

শহরের যত আলো চুঙিতে মুখ ঢেকে আছে। ভাগ্যে ব্ল্যাক-আউট—তাই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ উলঙ্গ-গৃহস্থালী নজরের আড়ালে থাকে। হরিহর রায়ের চিরকালের অভ্যাস, ভোর থাকতে উঠে স্নান করা। কলকাতায় থাকলে গঙ্গাস্নানে যাবেনই; পৌষের শীত, বর্ষার বৃষ্টিবাদল—কিছুতে অন্যথা হবার জো নেই। কিন্তু ইদানীং তা বন্ধ হয়ে গেছে। পায়ে পায়ে মানুষ বাধে, হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে হয়, পদপিষ্ট ঘুমন্ত মানুষ হাউমাউ করে চেঁচিয়ে ওঠে—যাবেন কি করে? ঘর থেকে তিনি বেরোনই না। গ্রাম থেকে পালিয়ে এলেন ভয়ে ভয়ে, কিন্তু চল্লিশ বছরের চেনা কলকাতাও যেন নূতন এক ভয়ানক জায়গা। ফুটপাথের উপর মেয়ে-পুরুষ—নানান বয়সি, বেহায়া বে-আবরু। অবোধ শিশু কেঁদে কেঁদে গলা ফাটাচ্ছে—কোথায় দুধ? মা গিয়ে রাস্তার কলে আঁজলা-আঁজলা জল খাওয়ায়।

এত সহজ মানুষের মরা! দূর-দূরান্তরে যুদ্ধ করে মানুষ মরে মরে পড়ে যায়—বুকের উপর দিয়ে দ্রুতগতি ছোটে যান্ত্রিক-বাহিনী, মড়ার উপরও পড়ে বোমা, পড়ে মেশিন-গানের গুলি। নূতন রেজিমেণ্ট এগোবার পথে লাথি মেরে মড়া সরিয়ে দিয়ে যায় একপাশে। রোজ সকালে খবরের কাগজে পড়া যায়, মৃত্যু নিয়ে মানুষের ছিনিমিনির কাহিনী।

আর সকালবেলা উঠে চোখেই দেখা যাচ্ছে, অতি-সুলভ মড়া অজস্র পড়ে আছে শহরের এ-রাস্তায় ও-রাস্তায়, বাড়ির রোয়াকে, স্টেশনের ধারে। ফ্রি-কিচেনের কাজে যাবার মুখে যেমন একটিকে আজ দেখতে পেল সুপ্রিয়া। কোন্ গ্রাম থেকে এসেছে, পরিচয় নেই; বাঁচবার লোভে ভিক্ষার ঝুলিটা

নিয়ে এসেছিল। উলঙ্গ দু-পাটি দাঁত—খাদ্য নয়, মাছি ভনভন করছে তার ফাঁকে। মাথার কাছে লাঠি আর ঝুলিটা পড়ে। যে অপরূপ খিচুড়ি সুপ্রিয়ারা বিলি করে, হয়তো তারই আশায় অপেক্ষা করছিল। কখন সকাল হবে, রোদ উঠবে, দিদি-ঠাকরুনেরা এসে পৌছবেন ক্রিম-পাউডার মেখে চা-বিস্কুট খেয়ে, কখন বাজবে ঠিক সাড়ে আটটা···

অসহ্য হয়েছে, চোখ মেলে আর দেখা যায় না। গ্রাম ছেড়ে এখানে এসেছেন, এ জায়গা ছেড়েই বা যান কোথায় এঁরা? তাই আন্দোলন উঠেছে, আড়াল কর—লরি বোঝাই করে এদের ঢেলে দিয়ে এস শহরের বাইরে। শহরের নোংরা আবর্জনা যেমন বাইরে নিয়ে ঢালে।

সাব্যস্ত হচ্ছে, অতঃপর শহর থেকে দূরে দূরে লঙ্গরখানা খোলা হবে। সুপ্রিয়াদের এটাও উঠে যাবে, নূতন পারমিট আর মিলবে না। নবতম ব্যবস্থায় কজনের পেট ভরানো হবে, সে সম্পর্কে অবশ্য খুলে বলা হচ্ছে না কিছু। কিন্তু উৎপাতের দল মরেই যদি, বাইরে মরবে, সে দুর্গন্ধ শহর অবধি অবধি আসবে না। নিরুপদ্রব হবে কলকাতা।

ঘুম ভেঙে শহরের কর্মব্যস্ততা জেগেছে এখন। রাস্তা-গলি ঝেঁটিয়ে সাফ করা হচ্ছে, করপোরেশনের ময়লা-গাড়ি ছুটছে। ছুটে বেড়াচ্ছে এ, আর, পি, আর সিভিক-গার্ডের দল—এই একটা মড়া, ঐ যে ওখানে একটা, ঐ · ঐ··· ঐ। সুপ্রিয়া যেটা দেখছিল, সেটাকেও নিয়ে গেল তুলে।

মড়া সাফ-সাফাই হবার পর জ্যান্ত-মড়া সরাবার পালা।

হঠ্ যাও—এই, আরে ওঠ্ না হারামজাদি—পালা—পালা—

ভাঙা টিনের মগ কি মাটির মালসা হাতে কেউ ছুটল লঙ্গরখানায়, কেউ গৃহস্থ-পাড়ায়, কেউ বা গিয়ে দাঁড়াল ট্রাম-বাস যে-জায়গায় গিয়ে থামে সেখানে। পথচারীর পা জড়িয়ে ধরছে, গোরুর সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে আস্তাকুড় হাতড়াচ্ছে, তাড়া খেয়ে খেয়ে এবাড়ি-ওবাড়ির দরজায় দরজায় ঘুরছে।

হঠাৎ উমার সঙ্গে দেখা অনেকদিন পরে। সুপ্রিয়া তাকে জড়িয়ে ধরল। কত রোগা হয়ে গেছে, রং ময়লা—এ তো সে উমা নয়!

বেঁচে আছ তুমি? কলকাতায় রয়েছ? আছ কোন্‌খানে ভাই! কি করছ?

ম্লান হেসে উমা বলে, থাম। এ কটারই জবাব দিই আগে।

সুপ্রিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে, কি রকম যেন হয়ে গেছ তুমি।

বিদ্যা-দানের পুণ্যকর্ম আরও এক বছর চলল যে! বারো বছরে পুরো গাধা হতে হয়। অতএব সিকি আন্দাজ হয়েছি এই তিন বছরের মাস্টারিতে।

সুপ্রিয়া প্রশ্ন করে, আর কি করছ? দেশের কাজকর্ম কিছু?

উমা কি জবাব দেয়, উৎসাহের আবেগে শুনলই না সুপ্রিয়া। বলে, আমরা অনেক কাজ করছি। শুনলে খুশি হবে তুমি। বাড়ি চল। তোমাকেও ছাড়ব না ভাই, দলে আসতে হবে।

একরকম তাকে টেনে নিয়ে এল। সোজা দোতলায় নিয়ে তুলল। অনুপমও সেখানে।

সত্যিই খাটছে এরা। নানা ধরনের কাজকর্ম। সুপ্রিয়া নানারকম পোস্টার আর কাগজপত্র বের করল।

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে উমা বলে, উঃ—দাবির ফিরিস্তি যে তোমাদের! কি কি চাচ্ছ, দেখি—

উল্লসিত সুপ্রিয়া একটার পর একটা বুঝিয়ে দিচ্ছে।

করপোরেশনের ধাঙড়রা যখন ষ্ট্রাইক করেছিল, এটা সেই সময়কার। মাগগি ভাতা চাই।

ওখানা?

পাটের সর্বনিম্ন দর-বাঁধা চাই।

অনুপম বলে, বুঝলেন না? আক্রমণটা আমাদেরই উপর—আমরা যারা সরকারি দলের মানুষ। গবর্নমেণ্ট আর মালিক-উপরওয়ালাদের স্বস্তি পেতে দিচ্ছেন না, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারছেন।

সুপ্রিয়া দেখাচ্ছে, আর এই দেখ, এই আর-এক গাদা। চাল চাই। কেরোসিন চাই। সস্তায় কাপড় চাই।

উমা বলল, তবু তো বাদ থেকে গেল অনেক-কিছু—

সুপ্রিয়া সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

উচ্ছে চাই, কাঁচকলা চাই, নিমতলার ঘাটে সস্তায় কাঠকুটো চাই—

ঠাট্টা? ভাবছ বোধ হয়, রাজনীতি এড়িয়ে সমাজ-সেবায় নেমেছি ভয় পেয়ে। এইটে দেখ তো—

সুরঞ্জিত বড় একখানা পোস্টার সুপ্রিয়া মেলে ধরল।

—রাজবন্দীদের মুক্তি চাই—

পোস্টারটা টেনে নিয়ে উমা কালীর সুস্পষ্ট রেখায় 'রাজবন্দীদের' কথাটা কেটে দিল। বলে, মরে যদি মরুক না রাজবন্দীরা। মুক্তি চাই আমরা। যাঁরা রাজবন্দী, তাঁদেরও এই মনের কথা। দোহাই তোমাদের, কুয়াসা তুলে আচ্ছন্ন কোরো না যে দাবি কণ্ঠে নিয়ে হাজার হাজার রাজবন্দী জেলে পচছেন। মুক্তি চাই পরাধীনতা থেকে।

হাসি ঝিকমিক করছে উমার মুখে—যেন ক্ষুরধার হাসি। একমুহূর্ত সুপ্রিয়া স্তম্ভিত হয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, সে তো সকলকারই কথা। কিন্তু কাদের জন্য সে মুক্তি? সেই তারা মরে নিঃশেষ হয়ে গেলে কি অর্থ হবে বলো মুক্তির?

দালানে বিরাট উনুনের উপর বড় বড় ডেগচিতে টগবগ করে গ্রুয়েল ফুটছিল, সেদিকে আঙুল দেখিয়ে সুপ্রিয়া বলে, ভাত দিয়ে, ঐ দেখ, যথাসাধ্য তাদের বাঁচিয়ে রাখছি।

ভারতের অপব্যয়—

সুপ্রিয়া রাগ করে বলে, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা—একে অপব্যয় বলছ?

উমা বলে, আর ঐ একটা প্রকাণ্ড নিরর্থক শব্দ তোমরা রচনা করেছ—

দরিদ্র-নারায়ণ। নারায়ণ কখনো দরিদ্র নন। আর যারা দরিদ্র, তারাও নারায়ণ নয়—তারা পাপী। দারিদ্র্য মহাপাপ।

সুপ্রিয়া বলে, আচ্ছা—নারায়ণ না-ই বা হল, মানুষ তো বটে!

মানুষ নয়, ভিখারি। খেতে দিলে বাঁচবে, না খেতে দিলে মরে যাবে। মরা-বাঁচা সমান কথা ওদের পক্ষে।

সুপ্রিয়া স্তম্ভিত হয়ে বলে, মানুষ মরবে—কিছু তাতে আসে যায় না?

ও-সব মানুষ মরেইছে অনেক দিন। মরে ভূত নয়—ভিখারি হয়ে গেছে। মারণ-ক্রিয়া নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হয়েছে, টুঁ-শব্দটি হয় নি। ভিখারি বাঁচালে সমাজে উৎপাতই বাড়বে ভাই, উপকার হবে না।

সুপ্রিয়া বলে, প্রাণে বাঁচিয়েই কাজ আমাদের শেষ হচ্ছে না। ওদের ঘরে পৌঁছে জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হবে। আর যাতে কোনদিন মন্বন্তর না আসে—হাসছ যে! লাভ নেই, মনে করছ?

উমা বলে, লাভ আছে বই কি! ওরা মরুক কিম্বা বাঁচুক—মন্বন্তর-ঠেকানোয় যারা উদ্যোগী, তাদের অন্তত তিনপুরুষ মন্বন্তরের দায় ঠেকতে হবে না, এ ব্যবস্থা অনায়াসে হতে পারবে।

হরিহর এলেন। অপমানে তাঁর মুখের উপর যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। একখানা খামের চিঠি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, বিনোদ লিখেছে। বিজয়ের পর আবার ভূষণের কি অবস্থা করেছে দেখ। সাহস কতদূর বেড়েছে—বিজয়কে তবু রাত্রিবেলা, আর ভূষণকে ভরা-হাটের মধ্যে সকলের সামনে—

উমার দিকে নজর পড়ে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

শতমুখে যে ব্যাখ্যান করতে, অহিংস কংগ্রেসি মানুষ। গান্ধির মতে চলে—মার খায়, মারে না।

উমা সহসা বুঝতে পারে না।

কার কথা বলছেন?

পড়ে দেখ। কীর্তিটা দেখ তোমার হাঘরে স্বদেশি দাদার।

বিনোদের চিঠির মর্ম, বাঁকাবড়শির লঙ্গরখানা অতি উত্তম চলছিল। কিন্তু সাধ্যের তো সীমা আছে—সমস্ত জেলার মানুষ খাওয়ানো যায় কেমন করে? বাছাই করে খাওয়ার টিকিট দেওয়া হচ্ছিল, গোলমাল বাধল এই নিয়ে। এবং তারই ফলে পান্নালাল-পণ্ডিত দল জুটিয়ে প্রকাশ্য হাটখোলায় তার ধার্মিক নিরীহ বাপকে—

অনুপমকে হরিহর বলিলেন, উচিতমতো শিক্ষা দিতে হবে, নইলে মুখ দেখানো যাবে না ও-অঞ্চলে। শিষ্টশান্ত হয়ে ছিল—তাই ইদানীং মনে করতাম, গুঁতোর চোটে দিব্যজ্ঞান হয়েছে। কিন্তু হাজার বার ধুলেও কয়লার ময়লা কাটে না। পুলিশ মামলা চালাচ্ছে, দলসুদ্ধ ধরে ওদের সদরে চালান দিয়েছে। তবু তুমি চলে যাও। পিঁপড়েগুলোর পাখনা ছেদন করে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে এস, তারা পিঁপড়ে মাত্তোর, শুধু চাপড়ের ওয়াস্তা। বেশ মোটা রকম যাতে ঠেসে দেয়, সেই বন্দোবস্ত করে এস।

অনুপম ইতস্তত করে। পার্টি-মীটিং রয়েছে সামনে; মেম্বার আর মন্ত্রীদের মাইনে-ভাতা বাড়াবার জরুরি প্রস্তাব ঝুলছে।

হরিহর বলেন, অন্তত দু-তিনটে দিনের জন্য গিয়ে একবার ঘুরে এস। তুমি গেলে মন্ত্রের কাজ হবে। ছেলে হলেও তুমি, জামাই হলেও তুমি। তোমায় ছাড়া বলব কাকে, বল।

উমার দিকে আর একবার অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হরিহর চলে গেলেন। অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে উমাও বিদায় নিল।

সুপ্রিয়া আবদার ধরল, আমি যাব কিন্তু তোমার সঙ্গে।

উঁহু—এবার নয়। গিয়েই ফিরতে হবে। থাকতে পারব না তো স্থির হয়ে।

কিন্তু সুপ্রিয়া যখন ধরে বসেছে, কারো ক্ষমতা নেই রদ করবার। সে একা নয়, দাসু যাবে, উমাকেও নিয়ে যাবে। সদরে হরিহরের ছোট একটা বাসাবাড়িও আছে, অতএব অসুবিধা কি?

অনুপম বলে সদলবলে যাচ্ছ, মতলবটা কি বল তো?

পান্নালালবাবুরা বিনা দোষে বুড়োমানুষটাকে মেরেছেন, এ আমার কিছুতে বিশ্বাস হচ্ছে না। পিছনে অন্য ব্যাপার আছে।

বিরক্ত হয়ে অনুপম বলে, অর্থাৎ আমাকে পাঠানো হচ্ছে জেলের তদ্বিরের জন্য, আর তুমি যাবে ওদের খালাস করে আনতে। সব ব্যাপারেই দেখছি উল্টো রাজনীতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের।

শ্বশুরের আদেশ বলে নয়, নিজেও অনুপম পান্নালালের প্রতি প্রসন্ন নয়। তার সঙ্গে সুপ্রিয়া সমস্ত দিনের মধ্যে ভাল করে একটা কথা বলে না! রাতের শহর ভাগ্যে আলাদা রকম, নইলে রাত্রেও নিশ্চিত ঐ অবস্থা হত। আর এই সুপ্রিয়াই একদা দ্বারিক সর্দারের বাড়ি রান্না করে পাখা হাতে সামনে বসে খাওয়াচ্ছিল পান্নালালকে। নিজের চোখে সে দেখে এসেছে।

অনুপমের তিক্ত কণ্ঠ সুপ্রিয়া কানেই নিল না। অনুনয় করে বলে, আমার বড্ড পুরানো বন্ধু উমা। দেখলে না, মুখ চুন করে চলে গেল। যদ্দিন খুশি জেলে পাঠাবার বন্দোবস্ত কোরো,-জেল তো ঘরবাড়ি ওঁদের—খালাসের কথা মুখ দিয়েও আমি বের করব না। কেবল একটা কথা—

কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে অনুপমের হাত ধরে সে বলল, উমার সঙ্গে পান্নালাল বাবুর একটা ইণ্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করে দিও তুমি। তুমি ইচ্ছা করলেই পারবে। কতদিন উমা দেখে নি তাঁকে; দেখতে পাবে না হয়তো আরো কত দিন!

(২)

রাত্রির কলকাতা একেবার আলাদা। অন্ধকারে যেন নিরালম্ব প্রেতদলের আর্তনাদ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে—

মা, মাগো!

সুপ্রিয়া তো এদেরই কাজ করে যাচ্ছে অদম্য নিষ্ঠায়। কত মনোবেদনা ও ভরসা শহরে এসে-পড়া এই হতভাগাদের জন্য! কিন্তু সন্ধ্যার পর শহরের

মতো সে ও যেন অন্য এক রকমে হয়ে যায়। পথে-ঘাটে ধুঁকতে ধুঁকতে দিন-ভর যারা ডাস্টবিনে উচ্ছিষ্ট খুঁটে বেড়ায়, রাত্রি হলে তাদেরই কঙ্কালছায়া টকটকে রাঙা চোখ মেলে আঁধারে যেন মিছিল করে ফেরে সুপ্রিয়ার চোখের সামনে দিয়ে।

মাগো, রাজরানী মা আমার!

ভয়ার্ত সুপ্রিয়া অনুপমের কাঁধ ধরে নাড়া দেয়।

শুনছ? ঐ শোন—

কানে হাত-চাপা দিয়ে সুপ্রিয়া তার কোলের ভিতর মুখ গুঁজে পড়ে। অনুপমের দৃঢ় দুটি বাহু ছাড়া এখন এ জগতে তার কোন নির্ভর নেই। দিনের অবহেলার শোধ রাত্রিবেলা সুপ্রিয়া হাজার গুণ তুলে দেয়।

অনুপম সান্ত্বনা দিচ্ছে, ভয় কিসের? 'মা' বলে ডাকছে, 'মা'-ডাকের চেয়ে ভাল কি আছে?

কাঁদো-কাঁদো হয়ে সুপ্রিয়া বলে, সদরের বাসায় তুমি রেখে এস আমায়। কলকাতায় ফিরে আসব না—আমি বাঁচব না এখানে থাকলে—

ভয়ানক বিপর্যস্ত মূর্তি হয়ে গেছে সুপ্রিয়ার। শেড-দেওয়া আলোর নিচে মুখখানা পাংশু ও নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে। দেখে অনুপমের বড় বেদনা লাগে।

বাইরে এসে রেলিং ধরে সে নিচে তাকাল। শহর সত্যিই যেন প্রেতভূমি। প্রথমটা নজরে আসে না, তারপর খানিকক্ষণ তাকিয়ে আবছা-আবছা ছায়ামূর্তি দেখতে পাচ্ছে, একটা-দুটো নয় অনেকগুলি। যেন প্রেতের মেলা বসেছে। বিনিয়ে বিনিয়ে ডাকছে, মা—মাগো, ফ্যান দাও, একটুখানি ফ্যান। ভাত চাইতে ভরসায় কুলোয় না, ভাত কে দেবে এমন দিনে? অবিরাম চেঁচাচ্ছে, ফ্যান—ফ্যান—ফ্যান—

পুরুষমানুষ অনুপম—তারও বুকের ভিতর গুর-গুর করে ওঠে। সে চিৎকার করে ওঠে, শুনতে পাস না এই দাসু? এই—এই—

দাসুর অপরাধ নেই। খানিক আগে তার ভাত এমনি একটা দলকে

দিয়ে আবার রান্না করতে হয়েছে খেয়ে দেয়ে এই সবে সে একটুখানি চোখ বুঁজেছে—

ফ্যান—ফ্যান দাও—

সুপ্রিয়া ঘরের ভিতর থেকে অধীর ব্যাকুল কণ্ঠে বলছে, ওরে দাসু, রক্ষে কর, বিদেয় করে দে ওদের—

দিচ্ছি—

ঘুমচোখে ছুম-ছুম করে দাসু রান্নাঘরে ছুটল।

বাবা রে, মেরে ফেলেছে রে!

তোলপাড় লেগেছে। উপর থেকে দাসু হাড়িসুদ্ধ গরম ফ্যান ঢেলে দিয়েছে মালসার ভিতব নয়, ওদেরই কারও মাথায়। কান্নায় চেঁচামেচিতে খণ্ডপ্রলয় বাধল। রাগের মাথায় কাণ্ডটা করে দাসু এখন বেকুব হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি সে নিচে নামল। টর্চ জেলে অনুপমও ছুটল। সুপ্রিয়া বেরিয়ে এসে রেলিং ঝুঁকে দেখছে।

একটি মেয়েলোক পোড়ার জ্বালায় ছটফট করছে গলা-কেটে-দেওয়া পাখির মতো। রাস্তার উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে।

আর যারা চেঁচাচ্ছিল, এদের নামতে দেখে চক্ষের পলকে সরে পড়ে। হয়তো গরম ফ্যান আরও নিয়ে আসছে, কিম্বা নূতনতর কোন অস্ত্র।

অস্থিসার অশক্ত এক বুড়ো কেবল নড়ে না, 'হায়' 'হায়' করছে আর মাথায় ঘা দিচ্ছে।

টর্চের আলো পড়ল বুড়োর মুখের উপর। চেনা-চেনা মুখ! দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে সুপ্রিয়া অনুপমের পাশে তার গায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। সুপ্রিয়ার দিকে কি রকম করে চাইছে বুড়ো। উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে তার দিকে এগুচ্ছে। চিনতে পেরেছে—আর সন্দেহ নেই—গড়ভাঙার কেদার মোড়ল আর রূপদাসী।

পথ হারিয়ে বিলে বিলে ঘুরছিল, নাছোড়বান্দা ওরা ঘরে ডেকে

তুলল। অজানা গ্রামের মধ্যে মিটমিটে টেমির আলোয় আতঙ্ক আর ঔৎসুক্য মিলিয়ে সে রাত্রে কি বিচিত্র অনুভূতি শহুরে মেয়ের! ভদ্রতার খাতিরে বলতে হয়, তাই বলেছিল শহরে আসতে। এদের বলেছিল, বলেছিল দ্বারিক সর্দারদের, আরও অনেককে অনেক ক্ষেত্রে বলে এসেছে। কলকাতা দেখবার ভারি লোভ ঐসব পাড়াগেঁয়ে চাষীর, পরম আগ্রহে সবাই স্বীকার করেছে—এক রূপদাসী ছাড়া। রূপদাসীর কাছে সকলের চেয়ে বড় তার সচ্ছল সংসার। সেই নিমন্ত্রিতেরা এতদিনে দলের পর দল বুঝি শুরু করল নিমন্ত্রণ রাখতে। রূপদাসী সকলের আগে,—যন্ত্রণায় সে ঐ ছটফট করছে হাঁড়িভরতি শহরের উষ্ণ আতিথ্যে। আরো সব আসছে এদের পিছনে পিছনে—দ্বারিক সর্দার, বগলা দাসী, যামিনী, কার্তিক—

রূপদাসীর যন্ত্রণা অবশ্য বেশিক্ষণ থাকল না। ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে দুখানা তরকারি সহযোগে সরু চালের গরম ভাত খেয়ে নিচের ঘরে দাসুর পেতে-দেওয়া তোষকের নরম বিছানায় আনন্দে তৃপ্তিতে তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক রাত্রি হয়েছে, সুপ্রিয়া ঘুমোয় নি। শুয়ে শুয়ে মনে পড়ছে রূপোর গোট কোমরে-পরা নিটোল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল গড়ভাঙার ভরা গৃহস্থালীর অধিকর্ত্রীটির কথা। চলনে বলনে দেমাক সেদিন ফেটে ফেটে পড়ছিল। একটা রাত্রি তো ছিল, তার মধ্যে যে কটা কথা হয়েছে রূপদাসীর সঙ্গে, সমস্ত তাদের ঐশ্বর্যের গল্প। উঠানে আউশধানের পালা সাজিয়ে দিয়ে যায়, কখনও আউড়ির আমন ফুরায় না তাদের। বুধি, মুংলি আর রাঙি—তিনটে গাইয়ের দুধ কড়াই-ভরতি। কর্তার শরীর ভাল নয়, রোদ সহ্য হয় না—তাই দেখ, ছাতি কেনা হয়েছে, তালপাতার নয়—আসল কাপুড়ে ছাতি ··

বিপাকে পড়ে তিনটি মাস সুপ্রিয়ারা গ্রামে গিয়েছিল। গ্রামকে ভাল-বেসেছিল। সেই ছবি সুপ্রিয়ার মনে ভাসছে—বাংলা দেশের সর্বকালের চেহারা। উঠানে পোয়ালগাদা, একটা বাছুর শুয়ে পড়ে আলস্যে পোয়াল চিবোচ্ছে নারিকেলগাছের ফাঁকে দূর-প্রসারিত সবুজ বিল · পুকুর একটা—

টোকাশেওলা আর কলমিলতায় ভরা, লাউয়ের মাচা চলে গেছে অনেকখানি জল অবধি · কলাগাছ বনকচুর উপর দিয়ে ঝিঙে-ডগা লতিয়ে চলেছে, হলদে হলদে ঝিঙেফুল ··ঘুঘু ডাকছে এদিকে-সেদিকে, ডাকছে মাছরাঙা ফিঙেপাখি ···পুকুরে মাছের আফালি, পাতিহাঁস ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ঘোমটা-দেওয়া বউরা ঘাটে এসে বাসন মাজছে। নিরুদ্বিগ্ন শান্ত ঘরবাড়ি···বাইরের বারোয়ারিতে পিতল-কলসি আর কলার কাঁদি ঝোলানো আসরের উপর কম্পমান সরার আলোয় দুই কবিতে ওদিকে তুমুল ছড়ার লড়াই লেগে গেল।

আবার গিয়ে দেখতে পাবে সেই বাঁকাবড়শি-মাদারভাঙা-গড়ভাঙা? সকালে খবরের কাগজে থাকে যুদ্ধের খবর—বোমার আগুনে হাস্যোজ্জ্বল কত জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে! খবরের কাগজে বাঁকাবড়শি মাদারডাঙা-গড়ভাঙার কথা কে লিখতে যাচ্ছে বল? তার চেয়ে পঞ্চম-বাহিনী আগস্ট থেকে কি কি নির্মমতা দেখিয়েছে—জবর করে সেই বিজ্ঞাপন ছাপলে টাকা মিলবে ভালো।

একাদশ পরিচ্ছেদ

(১)

ইণ্টারভিউর ব্যবস্থা হয়েছে। হাজতে চলেছে এরা দেখা করতে। লাল রঙের ইট-বের-করা এক-প্যাটার্নের সরকারি বাড়ি দু-ধারে অঞ্চলটার নামই হয়েছে আদালতপাড়া।

ভাঙা সাইকেলের লোহা-লক্কড় আছে একটা বারান্দা-ভরতি। আর উঠানে ভাঙা নৌকার তক্তা-কাঠকুটো।

সুপ্রিয়া বিস্ময়ে আঙুল দেখিয়ে বলে, ওরে বাবা—কত!

অনুপম বলল, কো-অপারেটিভ বিল্ডিং-এ ঐ যে পর্বতপ্রমাণ বস্তা সাজানো দেখে এলে—পচা আটা-ময়দা ও-সব। সস্তায় নিলামে বেচবার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু এমন নষ্ট হয়েছে যে খদ্দেরই এল না।

উমা জিজ্ঞাসা করে, আর মড়ার খুলি-কঙ্কাল কোথাও গাদা দিয়ে রেখেছে নাকি অনুপমবাবু?

বিস্মিত চোখে চেয়ে অনুপম বলে, কেন?

মহাযুদ্ধের পুরোপুরি মিউজিয়াম হয়ে যেত তা হলে। সমস্ত রয়েছে—একটার কেন খুঁত রাখলেন আপনারা?

পৌঁছে দিয়ে অনুপম বলে, কথাবার্তা বলতে লাগুন। আমি ঘুরে আসছি, এসে বাসায় নিয়ে যাব।

লোহার গরাদের ওদিকে পান্নালাল, এদিকে উমা আর সুপ্রিয়া।

পান্নালাল বলে, কি উমা, মাস্টারি এই শহরেই জোটালে নাকি? কাজে যাবার মুখে দৈবাৎ এসে পড়েছ?

উমা বলে, গালি দিতে এসেছি গাড়ি ভাড়া করে। বড্ড একচোখো তুমি পান্না-দা।

স্বচ্ছ হাসি হেসে পান্নালাল বলে, কার দিকে পক্ষপাত করলাম, বল তো—

জেলের পাকা-ঘর আর দেশের খোলা-মাটি—যেন দুই সতীনে টানাটানি করে তোমাকে নিয়ে। কিন্তু জেলের দিকে ঝোঁক তোমার বেশি। অন্তত মাঝামাঝি করে নিলেও বিচার হত—যত দিন জেলে, ততটা দিন বাইরে।

পান্নালাল বলে, জেলের বাইরে যে আরও বড় জেল, বেশি কষ্ট।

সুপ্রিয়া বলে, কি বলছেন পান্নালালবাবু?

সত্যি কথা, সুপ্রিয়া দেবী। বিরাট বন্দী শিবির ভারতবর্ষ; সমুদ্র আর হিমালয়ের পাঁচিলে বিংশ শতাব্দীকে আটকে রাখা হচ্ছে। কোটি কোটি মানুষ নিষ্কর্মা এই সঙ্কট-সময়ে। দেশকে ভালবাসা এখানে অপরাধ। অসওয়াল্ড মোসলের মতো ফ্যাসি-বন্ধু ও-দেশে মুক্তি পায়, আর নেহেরু এখানে পচে মরেন কারাগারে। বাইরের জেল বেশি ভয়ঙ্কর বলে ছোট্ট জেলে শামুকের মতো মাথা গুঁজে ঢুকতে আর লজ্জা পাই নে।

সুপ্রিয়া মিষ্টি জমা দিয়ে এসেছিল গেটে। বলে, কলকাতা থেকে বয়ে এনেছি। খাবেন কিন্তু। যদি কোন-কিছুর দরকার থাকে, বলুন।

পান্নালাল বলে, একখানা খাতা পাঠিয়ে দেন যদি অনুগ্রহ করে—

লিখবেন?

পান্নালাল ঘাড় নাড়ল।

সুপ্রিয়া বলে, কি লিখবেন—মহাশ্মশানের কাহিনী?

পান্নালাল বলে, পথের কথা থাকবে বই কি কিছু কিছু। কিন্তু পথটাই তো লক্ষ্য নয়! কোন মায়ের ছেলে রক্ত-স্রোতের মধ্যে জন্ম নেয় নি বলুন!

রক্তের দাগ মুছতে কতটুকু সময় লাগবে? স্বাধীনতার আলোয় সোনার মানুষ, হাসিতে যাদের মুক্তা-মানিক ঝরে—আমি লিখে যাব অদূর-কালের তাদেরই কথা।

অনুপম হাসতে হাসতে এল। নাটকীয় ভাবে পান্নালালকে বলে, আপনি মুক্ত—বুধবার বেলা দশটা অবধি। সেইদিন মামলা। জামিন মঞ্জুর করেছে, হুকুমনামা এসে গেছে—

সুপ্রিয়ার দিকে চেয়ে বলল, মঞ্জুর যে ভাবে হোক, করাতেই হল। তুমি যে বলেছিলে! ইণ্টারভিউ চলুক এঁদের এই দেড়টা দিন সারাক্ষণ ধরে।

(২)

ঘোড়ার-গাড়ির ছাতে একদল ড্রাম-বিউগল ইত্যাদি বাজিয়ে সমস্ত শহর আলোড়িত করে বেড়াচ্ছে। স্থানীয় সিনেমা-হলে 'দুর্ভিক্ষ' নামক নৃত্য-নাট্যের অভিনয় করছেন অভিজাত ছেলেমেয়েরা। কদিন ধরে চলছে। হৈ-হৈ ব্যাপার। টিকিট-বিক্রির সমস্ত টাকা খরচ হবে দুর্গতদের সাহায্যে।

উমা বলে, যাবে পানু-দা? চমৎকার হচ্ছে নাকি। যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের কাছে শুনলাম।

পান্নালাল বলে, চোখের উপর যা দেখে এলাম, চমৎকার তার চেয়েও?

উমা বলে, চলই না। কাল সন্ধ্যায় কাছে পাব না তো তোমাকে, কাল তো বলতে যাব না!

অভিমান-ভরা কণ্ঠ আর ঘাড়-দোলানোর ভঙ্গি কচি কিশোরী মেয়ের মতো। তিরিশের কাছাকাছি বয়স—উমার মোটে মানায় না এ রকম।

নাচ-গান শুরু হল। হলের আলো নিভেছে। পান্নালালের ভালো লাগে না, উসখুস করছে। বেমানান মোটা আর অত্যন্ত ফর্শা একটি মেয়ে ছিন্ন-সজ্জায় সাজগোজ করে নেচে নেচে প্রাণান্তক প্রয়াসে বুভুক্ষার রূপ দেবার চেষ্টা করছে স্টেজের উপর। খুব হাততালি পড়ছে। পাশাপাশি মনে পড়ে,

ঘরবাড়ি ছেড়ে রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে দলে দলে যারা গ্রাম ছাড়ল, বউডুবির বিলের ধারে এখানে-ওখানে ছড়ানো যে সব মানুষের কঙ্কাল।

হঠাৎ চেয়ে দেখল, উমার নিষ্পলক দৃষ্টি তারই দিকে। ধরা পড়ে উমা হেসে ফেলল। বলে, খাসা নাচছে, নয় পান্নু-দা ?

নাচ দেখছ কি আমার মুখে ?

উমা অপ্রতিভ হয় না। বলে, তা যদি বললে, বেরিয়ে যাই চল। মুখই দেখিগে ভাল করে।

পান্নালাল বলে, মনে পড়ে উমা, একবার লুকিয়ে সাঁকো পেরিয়ে আমরা যাত্রা শুনতে গিয়েছিলাম ? কত ছোট তখন! আসরের বাইরে পোড়ো আমগাছের ডালের উপর দাঁড়িয়ে দু-জনে দেখে এলাম।

উমা মুখ টিপে হেসে বলে, কিচ্ছু আমার মনে পড়ে না।

পান্নালাল বলে চলেছে, পাশের খবর বেরুলে তোমার মা আমাকে নেমন্তন্ন করলেন। সেদিনও মনের আশা, এক শান্ত সুখের সংসার হবে আমাদের।

গভীর স্বরে উমা বলে, সংসার যেদিন হবে—অশান্তি বা অসুখ হবে না, এ তুমি নিশ্চিত জেনো পান্নু-দা।

যুদ্ধের সৈনিক—সুখ-শান্তি তো আমাদের জন্য নয়।

যুদ্ধ যখন মিটে যাবে ?

তার আগে মৃত্যু-সম্ভাবনাই তো প্রতি পদে।

তা হলে পরজন্মে। বড্ড সেকেলে রোমান্টিসিজম—না পান্নু-দা ? বলে উমা উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে উঠল।

পান্নালাল প্রশ্ন করে, পরজন্ম মান তুমি ?

উমা বলে, না। কিন্তু আশা তো চাই। জীবনে কিছুই যদি না পেলাম, পরজন্মের কথা ভেবে উপায় কি বল ? একটু স্তব্ধ থেকে বলে, এদেশের মানুষ সব ব্যাপারে বঞ্চিত বলেই বোধ করি এমন বিশ্বাসী পরজন্মে।

সকালবেলা। বাঁকাবড়শির লঙ্গরখানার জন্য বেশি চাল-ডালের ব্যবস্থা করা যায় কি না, সেজন্য অনুপম আর সুপ্রিয়া গেছে সাপ্লাই-অফিসারের বাড়ি তাঁর সঙ্গে খাতির জমাতে। দাসু বাজারে। ভাল হয়েছে, নিরালা বাড়িতে পান্নালাল আর উমা। সুপ্রিয়ার এর ভিতর কারসাজি আছে কিনা, বলা যায় না। আদালতের বিচারে যা হবে, সে তো আগে থাকতে বলা যায়।

উমার যেন বিশখান হাত হয়েছে আজ। গল্প করছে পান্নালালের সঙ্গে। ছুটে গিয়ে চিরুনি নিয়ে এল।

চুলটা আঁচড়াও দিকি পানু-দা, একটু ভদ্র হও। ঝোড়ো-কাকের মতো দেখাচ্ছে যে।

এরই মধ্যে এক ফাঁকে নুন দিয়ে এল তরকারিতে। গুন-গুন করে গান গাইছে আবার।

পান্নালাল বলে, খুব যে ফুর্তি!

বীরাঙ্গনা আমি যে! এরকম দিন জীবনে তো এই প্রথম এল না!

খিলখিল করে হেসে ওঠে উমা।

টং করে ঘড়ির আওয়াজ এল কোন্‌দিক থেকে। সাড়ে নটা। আর মিনিট পনেরর মধ্যে অনুপমের ট্যাক্সি এসে পড়বে। সেই গাড়িতে কোর্টে নিয়ে যাবে।

হঠাৎ উমা বলে উঠল, না-ই বা গেলে কোর্টে! চল, পালিয়ে যাই।

তাতে রেহাই নেই। ওয়ারেণ্ট বেরুবে।

দূরে—অনেক দূরে যাব। যে কটা দিন বাইরে থাকা যায় ধরবার আগে

এই বুঝি?

উমা চোখের জলে আকুল হয়ে বলে, যা ইচ্ছে বলগে তুমি। যা খুশি লোকে ভাবুক। তুমি যেও না—যেও না—

পান্নালাল তাড়া দিয়ে ওঠে, ছিঃ

উমা উদ্ধত অবাধ্য ভঙ্গিতে বার বার মাথা নেড়ে বলতে লাগল, আমার মা তোমার হাত ধরে বলে গিয়েছিলেন, মরবার সময় নিশ্চিন্ত ভরসায় তিনি চোখ বুজেছিলেন—তোমার কোন কর্তব্য নেই আমার উপর ? নিষ্ঠুর পাষাণ তুমি, কেবল তোমার নাম বাজাবার শখ—

নিচে মোটরের হর্ন। অনুপম সুপ্রিয়াকে নামিয়ে দিল। সে আর উমা খাওয়া-দাওয়া সেরে পরে যাবে। পান্নালাল দ্রুত নেমে গাড়ির ভিতরে উঠে বসল।

জনশ্রুতি, হাকিমের বউ নাকি খদ্দর পরে, শালা জেল খেটেছিল কোন্‌-বারের এক আন্দোলনে। সরকারি উকিলের সুদীর্ঘ বক্তৃতার ফাঁকে হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন, আসামিদের গায়ে মাথায় এসব কিসের দাগ, রায় বাহাদুর ?

উকিল বললেন, যখন গারদে ছিল মশায় কামড়েছে।

হাকিম বললেন, বাঘের কামড়ের দাগ হয় যে এই রকম ! মানুষ শুকোচ্ছে, আর মশাগুলো যে বাঘ হয়ে উঠেছে খেয়ে-খেয়ে !

পান্নালালকে প্রশ্ন করলেন, কিসের দাগ, আপনি বলুন তো—

পান্নালাল হেসে বলে, কিছু নয়, একটু-আধটু জখমি ব্যাপার। মারামারিতে কত লেগে যায় এ রকম !

মারামারি যখন—মার খেয়েছেন, মেরেছেনও তা হলে ?

দুঃখিত স্বরে পান্নালাল বলে, মারতে আর পারলাম কই ! হাত-বাঁধা ছিল —দড়িটা যে ছেঁড়া গেল না কিছুতে।

হাকিমের বয়স বেশি নয়, মজা লাগে কথার ধরনে। বললেন, দোকান-লুঠের সর্দার নাকি আপনি ?

পান্নালাল বলল, সর্দার না হাতি। ভারি একটা ব্যাপার ! গাল-ভরা নাম দিয়ে লজ্জা দিচ্ছেন কেন ?

যেহেতু লুঠপাট করেছেন, বিচারে জেল হয়ে যাবে আপনাদের—

নিস্পৃহ কণ্ঠে পান্নালাল বলল, হুঁ—

কিছু বলবার নেই?

কি আর বলব, বলুন। কায়দায় পেলে কে কাকে ছাড়ে? আমরাও কায়দায় পেতাম যদি—

কৌতুক-ভরা মুখে হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন, বিচারটা কি রকম করতেন তা হলে?

মানুষ খেতে পায় না কেন, তার বিচার। কেন ভাত থাকে না ঘরে? কোথায় গেল, কারা নিয়ে গেল? জুত পেলে আমরাও জেল-দ্বীপান্তর দিতাম যারা আসল আসামি—তাদের ধরে ধরে।

কোর্ট ভাঙবার মুখে কয়েদির গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। পান্নালাল বলল, রাগ করে মুখ ফিরিয়ে থেকো না উমা। চললাম। সুপ্রিয়ার দিকে হাত জোড় করে বলে, নমস্কার!

পান্নালাল জেলে ঢুকল। সত্যাগ্রহে নয়—দাঙ্গাহাঙ্গামার অপরাধে। ফুলের মালা নয় এদের জন্য। শান্তিভঙ্গ করে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমে বাধা সৃষ্টি করেছে—পঞ্চম-বাহিনী নাকি এই পান্নালালেরা! মোটা মোটা গরাদে দেওয়া সুবৃহৎ ফটক বন্ধ হল তার পিছনে। পৃথিবীর নির্মমতম যুদ্ধের সময় বড় জেলে আটক ছিল সে। দেখেছে, দিনের পর দিন নৈষ্কর্ম থেকে মুক্তির জন্য প্রাণবান নরনারীর আকুতি; দেখেছে বেঁচে থাকবার জন্য নিষ্প্রাণ মানুষগুলোর অক্ষম মর্মান্তিক প্রয়াস। বড় জেল থেকে ছোট জেলে এসে সে যেন সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলল। এ-ও মুক্তি এক ধরনের।

(৩)

সুপ্রিয়া বলে, এদ্দুর যখন এসেছি, গ্রামে একবার না গিয়ে কেমন করে ফেরা যায়?

অনুপম অবাক।

এই বুঝি মতলব ছিল গোড়া থেকে? না, না—গ্রামে যাওয়া থাক এখন। জান তো, পার্টি-মীটিং—আমার কিছুতে যাবার উপায় নেই।

দৃঢ়কণ্ঠে সুপ্রিয়া বলে, আমাকে যেতেই হবে। লঙ্গরখানা নিয়ে গণ্ডগোল হচ্ছে—কিন্তু গাঁয়ের মানুষ খারাপ নয়, আমি নিজে সেখানে থেকে দেখে এসেছি। বাবার যাবার জো নেই, তুমি পারবে না—গণ্ডগোল মিটিয়ে বিচার-ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে।

বলে সে আয়ত চোখে তাকাল অনুপমের দিকে। ব্যঙ্গ উছলে পড়ছে দৃষ্টিতে। বলে, সত্যিই তো! তোমার গেলে চলবে কেন? মাইনে আর ভাতা বাড়াবার প্রস্তাব যে তোমাদের—

অনুপম গ্রাহ্য করে না। লজ্জার কি আছে এতে? দুর্মূল্যের বাজার—মেম্বারদের যৎসামান্য যা দেওয়া হয়, তাতে খাটনি পোষায়? তুমিই বল।

ভ্রূ কুঁচকে সুপ্রিয়া বলে, ওঃ—খাটনি কত! এয়ার কণ্ডিশণ্ড ঘরে গদির উপর বসে ঝিমানো, ভোটের বেলা চেঁচিয়ে ওঠা, নয় তো বড় জোর গুনতি হবার জন্য গতর দুলিয়ে নিজেদের খোয়াড়ের মধ্যে ঢুকে পড়া।

অনুপম হেসে বলে, আর কিছু নয় বুঝি!

আর বক্তৃতা লিখিয়ে নিয়ে রাত জেগে মুখস্থ করতে হয় যখন। সে আর কদিনই বা!

অনুপম বলে, হল তাই। কায়দায় পেয়েছি যখন ছাড়ব কেন? কে ছাড়ছে বল এ বাজারে? বিরোধীরা পাঁয়তারা ভেঁজে বেড়াচ্ছে, মনে মনে জানে—মাইনে-ভাতা বাড়লে তারাও বাদ যাবে না। গরম গরম বক্তৃতা বাজিয়ে ফাঁকতালে পশার বাড়িয়ে নিচ্ছে। ভাল আসলে কেউ নয়।

সুপ্রিয়া বলে, দু-দশ জন যাঁরা ছিলেন, ছুতোনাতায় জেলে পাঠিয়ে নিরঙ্কুশ হয়েছ।

অনুপম যাবে না, সাফ জবাব দিয়েছে—সেজন্য অভিমান নয়, দস্তুরমতো

রাগ হয়েছে সুপ্রিয়ার। বলতে লাগল, পান্নালালবাবুদের জেলে আটকে রেখে বড্ড ফূর্তি। সিকি পয়সার মুরোদ নেই, তবু এই যে তোমাদের লম্বা লম্বা মাইনে-ভাতা—মনে রেখ, সে কেবল ওঁদেরই লাঞ্ছনার মূল্যে। মজা করে আজকে প্রহসন জমিয়েছ, কিন্তু চিরদিন চলবে না—দেশের দুলালরা যেদিন বেরিয়ে আসবেন, খুনীদের বিচারের জন্য দাবি উঠবে।

খুনী কারা?

লাখ লাখ মানুষ মরল, আর শাসনের নামে দুর্নীতি-অব্যবস্থার চূড়ান্ত চলছে ওদিকে। খুনী নয় তো কি বলব তোমাদের? যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচারের আয়োজন হচ্ছে, এ অপরাধীদের বিচার করবে কে?—যাকগে। তোমাদের বড় বড় কাজ—তুমি চলে যাও, পার তো ভাল দেখে নৌকো ঠিক করে দিয়ে যাও একখানা। আমি আর উমা যাচ্ছি দাসুকে নিয়ে। যাবই।

এখন হুকুম হয়েছে, নৌকা চালাতে পার। কিন্তু কোথায় নৌকো—সবই তো গেছে। নূতন করে বানাবে কারা, আর চালাবেই বা কে?

তবু অদৃষ্ট ভালো, অনুপম জুটিয়ে দিয়ে গেছে একখানা—সেগুনকাঠের নয়, সুপারিকাঠের। এই গড়তেই কি মুশকিল! সুপারিগাছ মেরে ছুতার-মিস্ত্রির অভাবে নিজেরাই কুড়ুল দিয়ে ফেঁড়েছে। পেরেক মেলে না, শেষকালে ভাঙাচুরো দা-বঁটি খন্তা-শাবল যা যেখানে ছিল জড় করে এই শহরে এসে অনেক কষ্টে কামারকে দিয়ে পেরেক গড়িয়ে নেয়।

বাঁকাবড়শি বড়-গাঙের উপর, সুপারিকাঠের পলকা নৌকা নিয়ে সাহস হয় না সে-গাঙে ভাসতে। ছোট ছোট খাল দিয়ে ঘুর-পথে অনেক সময় নিয়ে অবশেষে নৌকা মাদারডাঙার ঘাটে পৌছল। বাঁকাবড়শি অবধি এই পথটুকু হেঁটে না গিয়ে উপায় নেই। নয় তো অপেক্ষা করতে হবে—পুরো জোয়ারে বিলের দাঁড়াগুলোয় যখন জল ঢুকবে, তখনই লগি ঠেলে নৌকো নিয়ে যাওয়া যাবে।

সুপ্রিয়া বলে, বয়ে গেছে—খোঁড়া মানুষ নই তো আমরা! তুমি বরং জোয়ার অবধি এখানে পড়ে পড়ে ঘুমোও, মাঝি।

জেলেপাড়ার ঘাটে নৌকো লেগেছে। সুপ্রিয়া উমাকে দেখাতে দেখাতে চলেছে—এই একবছর আগেও যেখানে যা ছিল। চালে চালে বসত ছিল; খুব সমৃদ্ধিবানও ছিল কেউ কেউ। তিনখানা পূজো হয়েছিল সেই আশ্বিনে—শ্রীমন্ত পাড়ুই আর বুদ্ধিমন্ত পাড়ুই—দু-ভায়ের দু-খানা। আর একখানা বারোয়ারি কালীতলায় অস্থায়ী-মণ্ডপ বেঁধে। এখন খাঁ-খাঁ করছে পাড়াটা। মানুষজন নেই, তক্তা-খোলা অতি জীর্ণ ডিঙি একখানা খালের ধারে। ডিঙি নয়, ডিঙির কঙ্কাল। হরিহরের কাছে সুপ্রিয়া গল্প শুনেছে, বিশ তিরিশখানা নৌকো নাকি বারোমাস উপুড় করা থাকত এই ঘাটে। রেঁদা, হাতকরাত আর বাটালি চলত সমস্ত দিন। জ্যোৎস্না হলে রাত্রেও কাজ চলত। ঠকঠাক দুড়ুম-দাড়াম আওয়াজ সব সময়; কান পাতা যেত না। নিজেও সে একদিন এসে দেখেছিল, খোঁটা পুঁতে কত জাল মেলে দেওয়া ছিল এই জায়গাটায়! খোঁটাগুলো সারবন্দি খাড়া আছে এখনো। সেই যে গাছের গুঁড়ি সাজিয়ে ঘাট বাঁধা হয়েছিল, জেলে-বউরা নেমে স্নান করত আর ক্ষারে-সেদ্ধ কাপড় আছড়ে আছড়ে ফর্শা করত, ভরা-কলসি বসিয়ে রেখে খানিক গল্প-গুজব করত—সেই ঘাট রয়েছে, কেউ এখন পা ফেলে না সেখানে। ঘাটের উপরে গাবগাছ। কাঁচা গাব পেড়ে গাবের কষ জালে মাখাতে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত, এখন ফল পেকে হলদে হয়ে তলায় পড়ে যাচ্ছে, গাঙ-শালিকে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে।

গভীর নিশ্বাস ফেলল উমা। দিনের পর দিন পান্নালাল এই মৃত্যুপুরী পাহারা দিয়ে ফিরেছে। কোমল আবেশ-স্নিগ্ধ তার মুখ কঠোর শিরাসঙ্কুল হয়েছে, কৈশোর থেকে যৌবন—যৌবনের উপান্তে এসে মৃত্যুতে উত্তীর্ণ হতে চলেছে। কি শক্ত বাঙালি ছেলের মন, কিছুতে নিরাশ হওয়া তাদের কোষ্ঠীতে লেখে না। তার পানু-দা এই শ্মশানে এখনো ফুল ফোটাবার স্বপ্ন দেখে।

সুপ্রিয়া দেখাল, পান্নালাল বাবুর ইস্কুল-ঘর ঐ যে—

সাদা দেয়ালের উপর কোন্ বিদ্যাবাগীশ পড়ুয়া কয়লা দিয়ে বড় বড় অক্ষরে বিদ্যে জাহির করে গেছে, ঝিকমিক করছে সে লেখা—'সুশীতল নদীজল'। খানিকটা ওপাশে ছবি আঁকা। শিল্পী বুদ্ধি করে নিচে চিত্র-পরিচয় লিখে রেখেছে—'ঝড়ু'। তাই বোঝা যাচ্ছে, ছবিটা মানুষের। নাক উঁচু একেবারে; নাকের শোধ কানে তুলেছে—অবিকল ঐরাবতের কান। এই অমর-চিত্র রচনা করে শিল্পী সম্ভবত ঝড়ু নামক কোন সহপাঠীকে জব্দ করেছে।

সেই আসন্ন সন্ধ্যায় একটা লোক পিছন ফিরে নিবিষ্ট মনে বিদ্যাভ্যাস করছে দেখা গেল। পান্নালালের জায়গায় নূতন মাস্টার কে এল আবার? সুপ্রিয়া ডাকে, কে?

উস্কো-খুস্কো চুল-দাড়ি দ্বারিক সর্দার মুখ ফেরাল। জনশূন্য গ্রামে এই রকম পোড়ো পাঠশালা-ঘরে সন্ধ্যার আধ-অন্ধকারে গা কেঁপে ওঠে এদের। আতঙ্কিত সুপ্রিয়া বলল, কি করছ সর্দার মশায়?

বাজে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে দ্বারিক মুখ ফিরিয়ে নিল। মনোযোগের ব্যাঘাত হওয়ায় এবার সে চিৎকার করে দুলে দুলে পাঠ অভ্যাস করতে লাগল, ক আর র—কর; খ আর ল—খল; ঘ আর ট—ঘট।

নিঃশব্দে চলেছে উমা আর সুপ্রিয়া। আপন মনে হঠাৎ সুপ্রিয়া বলে ওঠে, অথচ একটা বোমা পড়ে নি এদিকে কোথাও। কলকাতায় দু চারটে পটকার মতো যা ফুটেছিল, তার আওয়াজ আসে নি এতদূরে। কিসে পুড়ল গ্রাম?

ঝড়ে-পড়ে-যাওয়া অশ্বত্থগাছটা ছাড়িয়ে তারা ফাঁকায় এল। গাজনের মেলা বসত যেখানে, সে জায়গাটায় হাঁটুভরা উলুঘাস। দিগন্তবিসারী বউডুবির বিল সামনে, আর ডাইনে দ্বারিকের টিনের ঘরের প্রকাণ্ড ভিটা। শীতের বাতাসে ধান-ক্ষেত দুলছে ঝিলমিল করে। কি ফসল ফলেছে

মরি মরি! ধরিত্রী সোনা ঢেলে দিয়েছে, বিশ বছরের মধ্যে এমন ফসল কেউ দেখে নি। ঐ রান্নাঘরের দাওয়ায় সুপ্রিয়া রান্না করেছিল, সামনে বসে খাইয়েছিল পান্নালালকে। কে দাঁড়িয়ে ওখানে—যামিনী নয়? যামিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে। কিংবা তাদের হয়তো নয়—চেয়ে চেয়ে দেখছে দিগ্‌ব্যাপ্ত ধানবন। দাওয়ায় দাঁড়ালে সমস্ত বিলটা ওখান থেকে নজরে আসে।

ধান পেকেছে, ধান কাটার মানুষ নেই। খোরাকির শেষ দানা অবধি বীজতলায় ফেলে উপোস করে করে যারা রুয়েছিল, কোথায় তারা ছিটকে গেছে! কার্তিক মাস এসে কবে চলে গেছে, অগ্রহায়ণও যায় যায়। দ্বারিক সর্দার বিষম মনোযোগে বিদ্যাভ্যাস করছে। কিষাণহাটা বসে না জলমার হাটে, কিষাণ কেনার মানুষ কই? আর ধানের রাশি এদিকে পাখি-কুলিতে খেয়ে যাচ্ছে, ক্ষেতে ঝরে ঝরে পড়ছে—কে কুড়োবে, কেটে ঝেড়ে আনবে? কে খাবে? কোথায় গেল তারা—একখুচি ধানের জন্য দেশ-দেশান্তরে পাগল হয় ছুটত, একমুঠো ভাতের জন্য কুকুরের মত এসে পড়ত?

ঘরের মধ্যে বগলা দাসী পড়ে পড়ে হাঁপাচ্ছিল। হাঁপানির কষ্টে বিকৃত কণ্ঠে সে চেঁচিয়ে ওঠে, বউমা, ওরে ও আবাগির বেটি, কি করিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? সন্ধ্যে দিবি নে ঘরে?

* * * * * *

জেলের মধ্যে বিশ্রাম-আনন্দে পান্নালাল এখন হয়তো কাব্য লিখে চলেছে। রূপসীর উদ্দেশে প্রেমোচ্ছ্বাস নয়, আরও রোমাঞ্চক—আগামী দিনের নূতন সূর্য আর নূতন মানুষের গান। আর আজকের ও অতীত দিনের বিস্মৃত-নাম অপরাজিত সৈনিকদের অভিযান-কথা। এই মাদারডাঙা-বাঁকাবড়শিতে নূতন কালের নরনারী এসে ঘর বাঁধবে, নিভৃত গুঞ্জন উঠবে বর্ষামুখর রাত্রে ছ্যাচা-বেড়ার আড়ালে, ঝড়ে-পড়ে-যাওয়া অশ্বত্থগাছ সবুজ পাতায় ঝিকমিক করবে। মড়ার হাড়পাঁজরা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ধুলো

হয়ে বাতাস উড়ে যাবে, মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, উর্বরা ঐশ্বর্যবতী করবে ধরণীকে। দু-শ বছরের পরাধীনতা শুধু স্মৃতি হয়ে রইবে ইতিহাসের কয়েকটি পাতার এক প্রাণহীন অধ্যায়ে। সে দিনের তরুণ-তরুণী বিস্ময় আর অপরূপ উল্লাসে শুনবে বাঁকাবড়শি-মাদারডাঙা ও আরো লক্ষ লক্ষ গ্রাম-খচিত বিশাল ভারতবর্ষের মৃত্যুজয়ী বিচিত্র সংগ্রামের গল্প। ক্লেদ-পঙ্কিলতার তলে বেঁচে আছে যে অমর-জীবন, নবীন আলোয় সেদিন সে শতদল হয়ে ফুটবে।

রাত্রি-শেষের পাখির মতো, শুকতারার আলোর মতো কবি পান্নালাল লিখে যাচ্ছে, এই আসন্ন প্রভাতবার্তা—ঘরে ঘরে ম্লান মুমূর্ষুদের জন্য মুক্তির অভীঃ মন্ত্র। সুন্দর পৃথিবী—তোমরা আশা কর, সাহস কর। বাঁকা মেরুদণ্ড আবার খাড়া হয়ে উঠবে খাদ্য পেলে—সে খাদ্য স্বাধীনতা। তারই জন্য পাগল হয়ে দলে দলে ওয়া পথে বেরিয়েছে—মাথায় নির্যাতনের শিলাবৃষ্টি, পিছনে টলমল অশ্রুসমুদ্র।